শ্রেণিহীন সমাজ

mvg¨ev`

প্রকৃত ইসলাম

gj

Ggvghhvgvb, The Leader of the Time

জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী

ZInx` cKvkb

৩১/৩২ পি.কে.রায় রোড, পুস্K feb, evsjvevRvi, XvKv|

শ্রেণিহীন সমাজ
mvg¨ev`
প্রকৃত ইসলাম

মূল লেখক:
Ggvghhvgvb, The Leader of the Time
জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী

m¤úv`bv: wiqv`j nvmvb
প্রকাশকালঃ ১ মে, ২০১৫ ঈসায়ী
প্রচ্ছদ পরিকল্পনাঃ মনিরুল ইসলাম চৌধুরি
প্রকাশনা ও পরিবেশনায়ঃ
ZInx` cKvkb

৩১/৩২, পি.কে. রায় রোড, পুস্তক feb, evsjvevRvi, XvKv|
01670-174643, 01670-174651

ISBN-978-984-8912-35-5

gj¨: 200.00 UvKv gvÎ

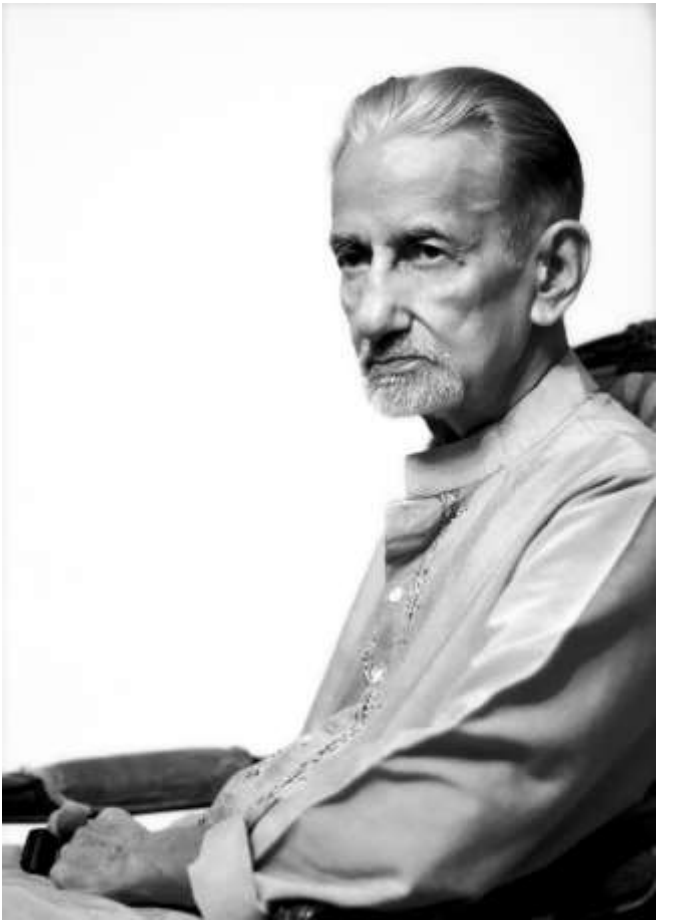

হেযবুত তওহীদের প্রতিষ্ঠাতা, এ যামানার এমাম,

The Leader of the Time

জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী

(11 gvP 1925 - 16 Rvbqvix 2012)

কার্ল মার্কস কমিউনিজম বলে একটি জীবনব্যবস্থা সৃষ্টি করেছেন। এটাও একটি দীন এবং অবশ্যই এই আশা নিয়ে যে তার অনুসারীরা একে সমস্ পৃথিবীময় প্রতিষ্ঠা করবে এবং তা করতে সর্বরকম সংগ্রাম করবে। তার অনুসারীরা তা করেছেও। অর্থনৈতিক অবিচার, অন্যায়কে শেষ কোরে সুবিচার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে তারা অসীম ত্যাগ, সাধনা, সংগ্রাম, সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে পৃথিবীর এক বিরাট অংশে তাদের আদর্শ প্রতিষ্ঠা করেছে। আজ বা ভবিষ্যতে যদি কমিউনিস্টরা তাদের উদ্দেশ্য ভুলে যেয়ে কার্ল মার্কসের ব্যক্তিগত অভ্যাসগুলোকে অনুকরণ করতে থাকে তবে মার্কস কি তাদের অনুসারী কমিউনিস্ট স্বীকার করবেন?

ধর্মcgvn

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ধর্মের বেশে মোহ যারে এসে ধরে
অন্ধ সে জন মারে আর শুধু মরে ।
bw¯ক সেও পায় বিধাতার বর ,
ধার্মিকতার করে না আড়ম্বর ।
শ্রদ্ধা করিয়া জ্বালে বুদ্ধির আলো ,
শাস্ত্রে মানে না, মানে মানুষের ভালো ।

বিধর্ম বলি মারে পরধর্মেরে ,
নিজ ধর্মের অপমান করি ফেরে ,
পিতার নামেতে হানে তাঁর সন্তানে ,
আচার লইয়া বিচার নাহিকো জানে ,
পূজাগৃহে তোলে রক্তমাখানো ধবজা,
দেবতার নামে এ যে শয়তান ভজা।

অনেক যুগের লজ্জা ও লাঞ্ছনা ,
eeiZvi weKvi weo¤bv
ধর্মের মাCS Avkq w`j hviv
আবর্জনায় রচে তারা নিজ কারা।
প্রলয়ের ওই শুনি শৃঙ্গধবনি,
মহাকাল আসে লয়ে সম্মার্জনী ।

যে দেবে মুক্তি তারে খুঁটিরূপে গাড়া ,
যে মিলাবে তারে করিল ভেদের খাঁড়া ,
যে আনিবে প্রেম অমৃত-উৎস হতে
তারি নামে ধরা ভাসায় বিষের স্রোতে,
তরী ফুটা করি পার হতে গিয়ে ডোবে ,
তবু এরা কারে অপবাদ দেয় ক্ষোভে।

হে ধর্মরাজ, ধর্মবিকার নাশি
ধর্মমূঢ়জনেরে বাঁচাও আসি।

আমাদের প্রকাশনাসমূহ

১. এসলামের প্রকৃত রূপরেখা - এমামুয্যামান জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী
2. এসলামের প্রকৃত সালাহ্ - এমামুয্যামান জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী
3. `v¾vj? Bûw`-wLóvb 'Ômf¨ZvÕ! - এমামুয্যামান জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী
4. Dajjal? The Judeo-Christian 'Civilization'! (Abev`)
৫. হেযবুত তওহীদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য - GgvghhvgvD Rbve মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী
৬. জেহাদ, কেতাল ও সন্ত্রাস - এমামুয্যামান জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী
৭. আল্লাহর মো'জেজা: হেযবুত তওহীদের বিজয় ঘোষণা - এমামুয্যামান জনাব মোহাম্মদ evqvRx` Lvb পন্নী
৮. বর্তমানের বিকৃত সুফিবাদ - এমামুয্যামান জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী
৯. যুগসন্ধিক্ষণে আমরা - এমামুয্যামান জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী
10. evN-eb-বন্দুক (শিকারের বাস্ে AwfÁZvi weeiY) - এমামুয্যামান জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী
১১. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রতি যামানার এমামের পত্রাবলি
১২. বিশ্বনবী মোহাম্মদ (দ.) এর ভাষণ
১৩. এসলাম শুধু নাম থাকবে (পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ সঙ্কলন)
১৪. যামানার এমামের পক্ষ থেকে মহাসত্যের আহ্বান (প্রচারপত্র সঙ্কলন)
১৫. এ জাতির পায়ে লুটিয়ে পড়বে বিশ্ব (পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ সঙ্কলন)
16. Avmb-সিস্টেমটাকেই পাল্টাই
17. mb¨vM
১৮. এ জাতির পায়ে লুটিয়ে পড়বে বিশ্ব (সংক্ষিপ্ত)
19. চলমান সঙ্কট নিরসনে হেযবুত তওহীদের প্রস্ebv
20. Divide and Rule - শোষণের হাতিয়ার
২১. জোরপূর্বক শ্রমব্যবস্থাই দাসত্ব
২২. দান: এসলামের অর্থনীতির চালিকাশক্তি- Gg.Awgbj Gmjvg
২৩. একজাতি একদেশ ঐক্যবদ্ধ বাংলাদেশ (প্রামাণ্য চিত্র)
২৪. ধর্মব্যবসা ও ধর্ম নিয়ে অপরাজনীতির ইতিবৃত্ত (cvgvY¨wPÎ)
25. bvixi ghv`v (cvgvY¨wPÎ)
26. `v¾vj? Bûw`-wLóvb 'Ômf¨ZvÕ! (cvgvY¨wPÎ)
২৭. দাজ্জাল প্রতিরোধকারীদের সম্মান ও পুরস্কার (প্রামাণ্য চিত্র)
২৮. আল্লাহর মো'জেজা: হেযবুত তওহীদের বিজয় ঘোষণা- মো'জেজার ভাষণের সিডি
২৯. অন্যান্য দল না করে হেযবুত তওহীদ কেন করব? (আলোচনার ভিসিডি)
30. The Leader of the Time (গানের অ্যালবাম-wmwW)
৩১. ঔপনিবেশিক ষড়যন্ত্রমূলক শিক্ষাব্যবস্থা
32. The Lost Eslam (cKwkZe¨)
৩৩. ধর্মব্যবসায়ী ও পশ্চিমাদের ষড়যন্ত্রের যোগফল জঙ্গিবাদ: উত্তরণের একমাত্র পথ
৩৪. ধর্মবিশ্বাস: এক বৃহৎ সমস্যার সহজ সমাধান
35. mvsewW`KZvi Av`kwjwc
৩৬. সকল ধর্মের মর্মকথা - সবার ঊর্ধ্বে মানবতা (প্রামাণ্যচিত্র ও মূল প্রবন্ধ গ্রন্থ)
37. mvg¨ev`-সমাজতন্ত্র-Bmjvg
৩৮. প্রশ্নোত্তরে হেযবুত তওহীদ (প্রকাশিতব্য)

fwgKv

প্রকৃত সাম্যবাদীরা আসুন, পথ পাওয়া গেছে

প্রচলিত রাজনীতিক আদর্শের মধ্যে দুটো প্রভাবশালী ধারা রয়েছে- Wvb I evg| মাঝামাঝি আরেকটি ধারাও আছে যারা সুবিধামত যে কোনো দিকে ঝুঁকে পড়ে। ডান বলতে বোঝানো হয় যাদের রাজনীতি ধর্ম দ্বারা প্রভাবিত, আর বাম বলতে বোঝায় যাদের রাজনীতি সম্পূর্ণরূপে ধর্মীয় প্রভাবমুক্ত। এদের কোনো ধর্মীয় কর্মকাণ্ড নেই। ডান ও বাম শব্দ দুটির মধ্যে ভালো ও মন্দের ধviYvI cKvk পায়। ডান মানে ভালো আর বাম মানে খারাপ। যেমন বাম হাতের উপার্জন মানে অবৈধ উপার্জন। যারা সমাজতান্ত্রিক ভাবধারায় রাজনীতি করেন তাদের কপালে এই 'বাম' খেতাবটি কীভাবে জুড়ে গেল সে ইতিহাস আমাদের জানা নেই। অবশ্য এ নিয়ে তাদের কোনো খেদ নেই, তারা ধর্মের প্রভাবমুক্ত হিসাবে নিজেদেরকে মানবতাবাদী, প্রগতিবাদী, মুক্তমনা বলে আত্মতৃপ্তি বোধ করেন।

সে যা-ই হোক, সমাজতান্ত্রিক আদর্শের যারা অনুসারী তাদের জন্য কি ধর্মহীন, bw¯K nIqv Aeavwi Z welq?

অনেকে বাম আদর্শে বিশ্বাসী বলতেই নাস্কি বলে মনে করেন। বাম ও নাস্কি এ শব্দ দুটি প্রায় সমার্থক হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু আমাদের অভিজ্ঞতা বলে অন্য কথা। আমরা দেখেছি, বাম আদর্শের অনুসারীরা মূলত ধর্মীয় গোঁড়ামী ও অন্ধত্ব থেকে নিজেদের মননকে মুক্ত করতে সচেষ্ট। বর্তমানে পৃথিবীতে বিরাজিত সবগুলো ধর্মই যখন বিকৃত হয়ে ধর্মব্যবসায়ীদের পণ্যে পরিণত হয়েছে, সেগুলো সাম্প্রদায়িক উগ্রপন্থীদের দ্বারা এবং তথাকথিত ডানপন্থীদের দ্বারা ভুলভাবে ব্যবহৃত হয়ে মানুষের সমাজকে পশুর সমাজে পরিণত করছে, সেই বিকৃত ধর্ম থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়াই প্রতিটি বোধসম্পন্ন মানুষের অবশ্য কর্তব্য। সে দিক থেকে ডানপন্থী রাজনীতির দাবিদারদের থেকে মানুষ হিসাবে বামপন্থীরা এগিয়ে আছেন। এই বিকৃত ধর্মবিশ্বাস আমাদের এই জাতিটিকে অন্য জাতির দাস বানিয়ে রেখেছে। এ চরম সত্যটি উপলব্ধি করেই মাননীয় এমামুয্যামান জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী ১৯৯৫ সনে হেযবুত তওহীদ আন্দোলন প্রতিষ্ঠা

করেছিলেন যাতে করে এই বিকৃত ধর্মবিশ্বাসের দ্বারা দূষিত পরিবেশকে নির্মল, অনাবিল ধর্মের শাশ্বত শিক্ষার দ্বারা প্রতিস্থাপিত করতে পারেন।

ধর্ম এবং ধর্মীয় কুসংস্কার- এ দুটি পৃথক বিষয়। ধর্মগুলো পাঠিয়েছেন মহান Avjvn|

তিনি যে রূপে সেগুলো পাঠিয়েছেন সেই রূপটি মানুষ যদি বিকৃত করে ফেলে সেটার জন্য আমরা কাকে দোষারোপ করবো, আল্লাহকে না মানুষকে। একটি স্রোতস্বতী নদী যে কোনো জনপদের জন্য আশীর্বাদ। কিন্তু সেই নদীর পানিতে নাগরিক বর্জ্য, কারখানার বিষাক্ত পানি ইত্যাদি অনবরত ফেলতে ফেলতে যি সেই নদীর পানি দূষিত করে ফেলা হয় তাহলে সেজন্য কে দায়ী? নিশ্চয়ই নদী দায়ী নয়, দায়ী মানুষ। নদীর সেই পানি আপনি ব্যবহার করতে পারছেন না, ব্যবহার করলে আপনি হয়তো বাঁচবেনই না, কিন্তু সেজন্য কি আপনি বলবেন যে নদী বলতে কোনো কিছু নেই? আজ বিকৃত ধর্মগুলো মানুষের অকল্যাণ করছে তার জন্য স্রষ্টাকে যারা দায়ী করেন তারা ভুল করেন। আর যারা মনে করেন স্রষ্টাই নেই, ধর্মগুলো মানুষের বানানো, তারা নিজেদেরকে অনেক জ্ঞানী ভাবতে পারেন কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অজ্ঞান ও দৃষ্টিশক্তিহীন। আমরা সেদিকে যাব না, কারণ bv¯ককে আস্কি বানানোর জন্য অনেক বই আজ পর্যন্ লেখা হয়েছে। আমাদের কাজ ওটা নয়। আমরা মনে করি, যারা নাস্কিK Zvivl gvbl, mZivs মানুষ হিসাবে যে অধিকার একজন আস্কি পেতে পারে, একজন নাস্কিKl ZvB পাবে। এবং সেইসঙ্গে আমরা এও মনে করি যে, একজন খাঁটি সমাজতান্ত্রিক হতে নাস্কি হওয়ার প্রয়োজন পড়ে না, ধর্মের শাশ্বত সত্যগুলোর বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়ার প্রয়োজন পড়ে না। তথাপি সমাজতান্ত্রিকরা ধর্মের বিকৃতিকে জাতীয় জীবনে প্রবেশ করার সুযোগ না দিতে গিয়ে কার্যত নাস্কিকে পর্যবসিত হয়েছেন, নাস্কিতাকে ফ্যাশন বা স্টাইলে পরিণত করেছেন। তবে সকল সমাজতান্ত্রিকই যে নাস্কিK GwU GKwU fj avivYv|

hv-ই হোক, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবীরা মানবতার কল্যাণে ব্যক্তিজীবনে যে অতুলনীয় ত্যাগ স্বীকার করেছেন এবং যে দুঃসাহসী সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করেছেন, এটা হওয়া খুবই স্বাভাবিক ছিল যে, তারা সর্বযুগে পূজনীয় থাকবেন।

কিন্তু বাস্বে সেটা হয় নি। সমাজতান্ত্রিক আদর্শ মানুষকে কার্যত শান্তি দিতে ব্যর্থ হওয়ায় সমাজতান্ত্রিক নেতারা বিশ্বজুড়ে যে 'যৌথখামার', 'ওয়ার্কার্স প্যারাডাইস' সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন সেটা গণমানুষের জন্য নরককুণ্ড হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ফলে সর্বস্ব ত্যাগকারী সেই বিপ্লবীদের ভাস্কর্যগুলোর উপর তাদের নিজ দেশের মানুষ চূর্ণবিচূর্ণ করে দিয়ে প্রতিশোধ গ্রহণ করেছে। সমাজতন্ত্রের চেতনা তাদের কাছে ফাঁকাবুলি বলে পমাণিত হয়েছে। তাই এককালের বহু সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র আজ ঘোর পুঁজিবাদী দেশে পরিণত হয়েছে। কিন্তু শান্তি মেলে নি। জ্বলন্ত কড়াই থেকে তারা লাফ দিয়ে চুলায় পড়েছে মাত্র।

মানবতার কল্যাণে যারা নিজেদের জীবনকে তুচ্ছ করে বিপ্লবের অগ্নিময় পথকে সঙ্গী করে জীবন কাটিয়ে গেছেন, আমরা হৃদয়ের অন্তঃস্তল থেকে তাদেরকে শ্রদ্ধা জানাই, যদিও তারা অনেকেই হয়তো নাস্তিক ছিলেন। সেটা কোনো মুখ্য বিষয় নয়। তাদের ব্যর্থতার কারণ তারা শ্রেণিহীন সমাজ গঠনের জন্য যে পথটি অবলম্বন করেছিলেন, সেই পথটি দুর্ভাগ্যক্রমে ভুল ছিল। আপনি যদি একদল মানুষকে ইংল্যান্ডে নিয়ে যাওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে পথ ভুল করে সাহারা মরুভূমিতে নিয়ে ফেলে দেন, তারা কি আপনাকে সম্মান করবে? পথ ভুলের তাই কোনো ক্ষমা নেই।

আমরা হেযবুত তওহীদও মানবতার কল্যাণে নিজেদের সকল সম্পদ, জীবন, cwievi, cÎ-পরিজন ত্যাগ করেছি। একটি আদর্শকে বুকে ধারণ করে পরার্থে Rxeb-সম্পদ উজাড় করে দেওয়ার যে সীমাহীন আনন্দ সেটা আমরা বুঝি। সমাজাান্ত্রিকদের মধ্যে যারা প্রকৃতই মানুষের চোখের জল মোছাতে আন্দোলন করেন, তাদের উদ্দেশে আমাদের এই লেখা। যারা মুখে শ্রেণিহীন সমাজের কথা বলেন আর নিজেরাই পুঁজিপতি পেটমোটা বুর্জোয়া হয়ে জীবন কাটাচ্ছেন, আমাদের দৃষ্টিতে তারা বিশ্বাসঘাতক, তারা উদ্বাস্ত তাদের আদর্শের ভূমি থেকে। মাও সেতুং-এর চীন এখন বিশ্বের অন্যতম প্রধান পুঁজিবাদী দেশ। আমরা ব্যক্তিগতভাবে অনেক বাম আদর্শবাদীকে জানি যারা গণসঙ্গীত করেন,

হেই সামালো, আসছে সুদিন/জোট বাঁধো ভাই, তৈরি সবাই/হবে বিপ্লব, হাতে ধরো সঙ্গীণ...।

গান গেয়ে, নাটক করে, পোস্টার মেরে, মিছিলে শ্লোগান দিয়ে, পার্টি অফিসে বসে তেভাগা-তেলেঙ্গানা-নকশাল আন্দোলনের গল্প করে আর বিপ্লবের দিন গুনে গুনে তারা বুড়ো হয়ে গেছেন। কোনো প্রলোভনের কাছে সততা বিকিয়ে দেন নি, ছেড়া চটি, তালিমারা পাঞ্জাবি পরে থেকেছেন, অনেকে সংসার পর্যন্ত করেন নি। তাদেরকে যে যা-B ejK, Aমরা তাদেরকে ধর্মহীন মনে করি না। কারণ মানুষের পরম ধর্ম 'মানবতা' তাদের মধ্যে পুরোমাত্রায়ই আছে। কিন্তু তাদের নেতাদের অনেকেই ধর্মব্যবসায়ীদের মত লালবই আর দ্যাস ক্যাপিটালের ব্যবসা করে টাকার কুমিরে পরিণত হয়েছেন। কমরেডদের করুণ পরিণতির একটাই KviY- mwVK c_ bv cvIqv|

আমাদের জীবন ধন্য যে, আমরা একটি সঠিক পথ পেয়েছি, যে পথে শান্তি সুনিশ্চিত, যেটা পরীক্ষিত, ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত। এমামুয্যামান একটি উচ্চ অভিজাত পরিবারের সন্তান হয়েও সারাটি জীবন কাটিয়েছেন সাধারণ মানুষের মাঝখানে, যিনি সকল সম্পদ বিলিয়ে দিয়ে গেছেন মানুষের মুক্তির সংগ্রামের তরে, আমরা সেই মহাপ্রাণ এমামুয্যামানের প্রেরণায় উজ্জীবিত। আমরা বলছি, পথ পাওয়া গেছে। ডান-evg hv-ই হোন না কেন, মানুষের অশ্রুতে যার হৃদয় সিক্ত হয়, ঘুঁনে ধরা সমাজটিকে যারা পুনর্নির্মাণ করতে চান, সর্বপ্রকার অবিচার, অত্যাচার ও শোষণের প্রতিবাদে যার হাত মুষ্টিবদ্ধ হয়ে ওঠে, সেই মানবধর্মের অনুসারীদের প্রতি আমাদের আহ্বান- আসুন, পথ পাওয়া গেছে।

নিবেদক

wiqv`j nvmvb

mwPcÎ

1. যেভাবে ধর্মনিরপেক্ষতার জন্ম হলো 13

2. ইসলামের অর্থনীতির সফলতা এবং পুঁজিবাদ ও gvKmxq A_bxwZi ব্যর্থতার নেপথ্যে 19

3. দাজ্জালের জান্নাত-জাহান্নাম এবং কমিউনিজমের স্বর্গ-biK 36

4. ধর্মব্যবসায়ীদের কূপমণ্ডূকতায় ব্যর্থ হল লেনিনের পরিকল্পনা 53

5. বিকৃত বিশ্বধর্ম এবং কার্ল মার্কস এর আফিম তত্ত্বের mZ¨-wg_¨v 62

6. মহানবী কেমন বিপ্লবী ছিলেন? 87

7. mdj AvZ¥`vb - e¨_ AvZ¥`vb 93

8. জোরপূর্বক শ্রমব্যবস্থাই দাসত 103

9. উম্মতে মোহাম্মদীর সংগ্রাম কিসের লক্ষ্যে? 138

10. উদ্দেশ্যচ্যুত সমাজতন্ত্রী ও উদ্দেশ্যচ্যুত উম্মতে মোহাম্মদী 180

11. AÜ বিশ্বাস নয়, যুক্তিই ঈমানের ভিত্তি 185

12. মানবজাতিকে 'ধর্মহীন মুক্তমনা' করার চেষ্টা কতটুকু সফল হলো? 195

13. শান্তি অথবা গণতন্ত্র-আমরা কোনটা চাই? 206

14. ag I bw¯K¨: `vb I cwRev` 217

15. agxb wk¶v-ব্যবস্থার উত্তরাধিকার 220

16. এক নজরে মাননীয় এমামুয্যামান ও হেযবুত তওহীদ 226

"We cannot be sure of having something to live for - unless we are willing to die for it."

Ernesto "Che" Guevara
Physician, Author, Intellectual, Diplomat, & Revolutionary

যেভাবে ধর্মনিরপেক্ষতার জন্ম হলো

আদম (আ.) থেকে হযরত মোহাম্মদ (সা.) পর্যন্ Avjvn AmsL¨ bex imj পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। তাঁরা তাদের জাতির কাছে যে জিনিসটা নিয়ে এসেছেন তা হলো তওহীদ অর্থাৎ জাতীয় এবং ব্যক্তিগত জীবনে যেখানে আল্লাহ এবং তাঁর রসুলের কোনো কথা আছে, আদেশ নিষেধ আছে সেখানে আর কারোটা না মানা। নবী রসুলদের মাধ্যমে আসা এই তওহীদের দাবি যখন যে জাতি মেনে নিয়েছে তখন তারা পুরস্কারস্বরূপ, ফলস্বরূপ শান্িcY ভারসাম্যযুক্ত সমাজ পেয়েছে। সে সমাজে কোনো অন্যায় অবিচার থাকত না, যুদ্ধ রক্তপাত থাকত না। সমাজে দেহ, আত্মার সুন্দর ভারসাম্য বিরাজ KiZ|

এই নবী রসুল পাঠানোর ধারাবাহিকতায় শেষ রসুল মোহাম্মদ (সা.) এর আগমনের প্রায় ৫০০ বছর আগে আল্লাহ পাঠালেন ঈসাকে (আ.)। তাঁকে পাঠানো হয়েছিল শুধুমাত্র মুসা (আ.) এর অনুসারী ইহুদি জাতির কাছে। তিনি এসেছিলেন মুসা (আ.) এর আনীত দীনকে সত্যায়ন করে শুধু মাত্র দীনের হারিয়ে যাওয়া আত্মিক ভাগটাকে যথাস্থানে ফিরিয়ে দিয়ে দীনের ভারসাম্য পুনঃস্থাপনের জন্য। তিনি কখনই খ্রিষ্ট ধর্ম নামে নতুন কোনো ধর্মকে cতিষ্ঠিত করতে চান নি। তাঁর জীবনী থেকে এ কথার প্রমাণ দেওয়া যায়। ঈসা (আ.) যদি ইহুদিদের বাইরে তার দেখানো পথ অনুসরণ বা গ্রহণ করতে বলতেন তাহলে তা হতো চরম সীমালংঘন ও অনধিকার চর্চা। কারণ স্রষ্টা তাঁর কাজের সীমারেখা নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন এবং তা অবশ্যই শুধুমাত্র ইহুদিদের ভেতরে। কোনো নবীর পক্ষেই এই সীমারেখা অতিক্রম করা সম্ভব নয়, এবং ইতিহাস সাক্ষী যে ঈসা (আ.) তা কখনই করেন নি। একজন অ-ইহুদির শুধুমাত্র রোগ সারিয়ে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হলেও তিনি ইতস্ত করেছিলেন। তিনি তাঁর সীমারেখার প্রতি ইঙ্গিত করে বলেছিলেন, I was sent only to the lost sheep of Israel. (Matthew 15:24)

অর্থাৎ আমি শুধু মাত্র বনি ইসরাইলের পথভ্রষ্ট মেষগুলোকে পথ দেখাতে এসেছি। তিনি যখন তাঁর প্রধান ১২ জন শিষ্যকে প্রচার কাজে বাইরে পাঠিয়ে দিলেন তখন তাদের উপদেশ দিলেন, Do not go among the Gentiles or enter any town of the Samaritans. Go rather to the lost sheep of Israel." (Matthew 10:5-6) A_vr "তোমরা অন্য জাতিগুলোর কাছে যেও না এবং সামারিয়ানদের নগরে প্রবেশ করো না। শুধুমাত্র ইসরাইলি পথভ্রষ্ট মেষগুলোর কাছে যেতে থাকবে।"

এভাবে ঈসা (আ.) যখন তাঁর প্রচার কাজ শুরু করলেন তখন সেই চিরাচরিত ব্যাপারের পুনরানুষ্ঠান আরম্ভ হয়ে গেল অর্থাৎ পূর্ববর্তী দীনের, মুসা (আ.) এর আনিত দীনের ভারসাম্যহীন বিকৃত রূপের যারা ধারক বাহক ছিলেন তারা তেলে বেগুনে জ্বলে উঠলেন। সেই পুরোনো কারণ, আত্মম্ভরিকতা! কী? আমরা সারাজীবন ধরে বাইবেল চর্চা করলাম, এর প্রতি শব্দ নিয়ে গবেষণা করে কত রকমের ফতোয়া আবিষ্কার করলাম, এসব করে আমরা রাব্বাই, সাদ্দুসাই হয়েছি। আর এই সামান্য কাঠমিস্ত্রির ছেলে কি না আমাদের ধর্ম শেখাতে এসেছে! ঈসা (আ.) তাদেরকে বড় বড় মোজে'জাগুলো দেখানোর পরও তারা কেউই তাঁকে স্বীকার করল না। শুধুমাত্র সমাজের নিম্নশ্রেণীর হাতে গোনা কিছু ইহুদি তাঁর প্রতি ঈমান আনল।

`xN 3 বছরের প্রচেষ্টায় মাত্র ৭২ জন মতান্তরে ১২০ জন ইহুদি তাঁর উপর ঈমান আনল ও তাঁর দেখানো পথে চলতে শুরু করল। কিন্তু বিকৃত দীনের ধারক বাহক রাব্বাই, সাদ্দুসাইরা তাদের তখনকার প্রভু রোমানদেরকে এই কথা বোঝাতে সক্ষম হলো যে, ভবিষ্যতে ঈসা (আ.) রোমানদের প্রভুত্বের ক্ষেত্রে বড় হুমকি হিসাবে আবির্ভূত হবে। ফলে এই পুরোহিতরা রোমানদের সাহায্য নিয়ে ঈসা (আ.) কে হত্যার চূড়ান্ত ব্যবস্থা করল। তখন আল্লাহ তাকে সশরীরে পৃথিবী থেকে উঠিয়ে নিলেন এবং তাঁর যে শিষ্য তাঁকে রোমানদের হাতে ধরিয়ে দিতে চেয়েছিল তার চেহারা অবিকল ঈসা (আ.) এর মত করে দিলেন। ফলে তারা তাকে ঈসা (আ.) মনে করে হত্যা করল। এই ঘটনার

পর ঈসার (আ.) যে ৭২ জন অনুসারী ছিল তারা প্রাণভয়ে বিভিন্ন জায়গায় পালিয়ে গেল। গোপনে ব্যক্তিগতভাবে ঈসা (আ.) এর পথে চলা ছাড়া তাদের আর কোনো উপায় রইল না।

কিছুদিন পর পল নামের একজন লোক ঈসা (আ.) এর উপর বিশ্বাস আনল। তবে তার পরবর্তী কাজগুলো বিবেচনা করলে বোঝা যায় যে, ঈসা (আ.) এর অনুসারীদের মাঝে ঢুকে তাদেরকে পথভ্রষ্ট করাই ছিল তার উদ্দেশ্য। ঈসা (আ.) তাঁর অনুসারীদেরকে বারবার যে কাজে সাবধান করে দিয়েছিলন অর্থাৎ A-ইহুদিদের মাঝে তাঁর শিক্ষা প্রচার করা যাবে না, কিন্তু পল তার অনুসারীদেরকে এই শিক্ষা ইহুদিদের বাইরে প্রচার করার জন্য প্রস্ln e w` j| c_gZ Cmv (Av.) Gi wkl¨iv Zvi GB c¯াবে ভয়ানক ভয় পেয়ে গেলেন। কারণ এটা সরাসরি তাদের শিক্ষকের শিক্ষার বিপরীত। কিন্তু পল তাদের মত বদলাতে সমর্থ হলেন সম্ভবত এই যুক্তিতে যে, বনি ইসরাইলিদের মধ্যে ঈসা (আ.) এর শিক্ষা প্রচার অসম্ভব, যেখানে ঈসা (আ.) নিজে ব্যর্থ হয়ে গিয়েছেন সেখানে শিষ্যরা যে হতাশ হবেন তাতে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। তাই ঈসা (আ.) এর এই শিক্ষাকে বাঁচিয়ে রাখার তাগিদে তারা তাঁদের শিক্ষকের সাবধানবাণীকে প্রত্যাখ্যান করে এই শিক্ষাকে বাইরে প্রচারের সিদ্ধান্ত নিলেন (Acts xiii, 46-47)। পল কিন্তু ঈসা (আ.) এর কাছে থেকে সরাসরি তাঁর শিক্ষা গ্রহণ করতে পারেনি, তাই তাঁর শিক্ষার আসল মর্মবাণী সে পায় নি। কিন্তু যখন ঈসা (আ.) এর শিক্ষাকে বাইরে প্রচার করা শুরু হলো তখন পল হয়ে গেলেন ঐ ধর্মের অন্যতম একজন প্রবক্তা। কাজেই তিনি যে শিক্ষা প্রচার করেছিলেন তা যে শুধু ঈসা (আ.) এর ধর্মের থেকে বহু দূরে ZvB bq, cavb প্রধান ব্যাপারে একেবারে বিপরীত।

এই প্রচারের ফলে অ-ইহুদিদের মধ্যে এক উল্লেখযোগ্য অংশ এই শিক্ষা গ্রহণ করে পলের উপদেশ মত তাদের জীবন পরিচালনা করতে লাগল। পল তার ইচ্ছামত এই শিক্ষাকে যোগ বিয়োগ করে নতুন এক ধর্মের সৃষ্টি করল। যা gmv (Av.) Gi agI bq, Cmv (Av.) Gi আনীত আত্মিক ভাগও নয়, পলের

হাতে পড়ে সম্পূর্ণ নতুন এক ধর্মই সৃষ্টি হয়ে গেল যাকে খ্রিষ্ট ধর্ম না বলে পলীয় ধর্ম বললেও ভুল হবে না। এই খ্রিষ্ট ধর্মরূপী, কার্যত পলীয় ধর্মটি ক্রমে ক্রমে সমস্ ইউরোপে গৃহীত হয়ে গেল। তবে আসল ব্যাপারটা ঘটল তখনই। যুগে যুগে মানুষ তদের সমষ্টিগত জীবন পরিচালনা করে এসেছে ধর্মের বিধান দিয়ে। তাই পুরোহিতদের হস্ক্ষেপের ফলে ঐ ধর্মের আসল রূপ বিকৃত হয়ে গেলেও ঐ বিকৃত রূপকেই ধর্মের বিধান বলে চালাতে হয়েছে।

রাষ্ট্র সর্বদাই চলেছে ধর্মীয় বিধি বিধান, আইন কানুন দ্বারা। স্বভাবতই খ্রিষ্টধর্মকে যখন সমস্ ইউরোপ একযোগে গ্রহণ করে নিল তখন তারাও cPóv করল খ্রিষ্টধর্মকে দিয়ে তাদের জাতীয় জীবন পরিচালনা করার জন্য। কিন্তু খ্রিষ্টধর্মে তো কোনো আইন কানুন, দণ্ডবিধি নেই এটা ইহুদি ধর্মের হারিয়ে যাওয়া আত্মাকে পুনঃস্থাপনের এক প্রক্রিয়ামাত্র। জাতীয় জীবন পরিচালনার জন্য যা কিছু দরকার তা ইহুদিদের কাছে অবিকৃত ছিল। কিন্তু ইহুদি ধর্ম থেকে ঈসা (আ.) এর আনিত আত্মিক ভাগকে পৃথক করে ফেলায় খ্রিষ্টধর্ম সমষ্টিগত জীবন পরিচালনা করতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হলো। তবুও ঐ চেষ্টা করা হলো এবং কিছুদিনের মধ্যেই বোঝা গেল যে, এ অচল, অসম্ভব। প্রতিপদে ইহলৌকিক এবং পারলৌকিক অঙ্গনে সংঘাত আরম্ভ হলো। এই সংঘাতের বিস্তৃত বিবরণে না গিয়ে শুধ্ এটুকু বললেই চলবে যে, এই সংঘাত এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে ইউরোপীয় নেতা, রাজাদের সামনে দুইটি মাত্র পথ খোলা রইল। হয় এই জীবনব্যবস্থা বা ধর্মকে সম্পূর্ণ ত্যাগ করতে হবে। আর নইলে তাকে নির্বাসন দিতে হবে মানুষের ব্যক্তিগত জীবনের ক্ষুদ্র গণ্ডির ভেতরে। তৃতীয় আর কোনো রাস্v iBj bv। যেহেতু সমস্ ইউরোপের মানুষকে নাস্কি বানানো সম্ভব নয়, কাজেই তারা দ্বিতীয় পথটাকেই বেছে নিল। অষ্টম হেনরীর সময় ইংল্যাণ্ডে প্রথম আনুষ্ঠানিকভাবে ধর্মকে সার্বিক জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করে ব্যক্তিগত জীবনে নির্বাসিত করা হয়। ইংল্যাণ্ডের পরে ক্রমে ক্রমে সমস্ খ্রিষ্টান জগত এই নীতি গ্রহণ ও প্রয়োগ করতে বাধ্য হলো। এরপর থেকে খ্রিষ্টান জগতের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, শিক্ষা ব্যবস্থা,

আইন দণ্ডবিধি ইত্যাদি এক কথায় জাতীয় জীবনে স্রষ্টার আর কোনো কর্তৃত্ব রইল না। জন্ম হলো ধর্মনিরপেক্ষতার।

আপাতদৃষ্টিতে এই ঘটনাটিকে তেমন গুরুত্বপূর্ণ মনে না হলেও মানবজাতির ইতিহাসে এই ঘটনাটি সবচেয়ে বড় ঘটনা। এই প্রথম মানুষ তাদের জাতীয় জীবন থেকে ধর্মকে প্রত্যাখ্যান করে। ধর্মকে জাতীয় জীবন থেকে বাদ দিয়ে ব্যক্তিগত জীবনে নির্বাসন দেওয়ার ফলে হয়তো এ আশা করা যেত যে জাতীয় জীবনে ন্যায়-অন্যায়ের মানদণ্ড না থাকায় সেখানে যত অন্যায়ই হোক ধর্মের প্রভাবে ব্যক্তি জীবনে মানুষ ন্যায়পরায়ণ ও মানবিক মূল্যবোধ পূর্ণ থাকবে। কিন্তু তাও হয় নি। কারণ মানুষের শিক্ষা ব্যবস্থার ভার রইল ঐ ধর্মনিরপেক্ষ অর্থাৎ ধর্মহীন, ন্যায়-অন্যায় বোধহীন জাতীয় ভাগটার হাতে। সুতরাং অনিবার্য ফলস্বরূপ ব্যক্তিগত জীবন থেকেও ধর্মের প্রভাব আস্তে আস্তে লুপ্ত হয়ে যেতে শুরু করল। স্রষ্টার দেয়া জীবন-বিধানে যে দেহ I AvZ¥i ভারসাম্য ছিল তার অভাবে ঐ শিক্ষা ব্যবস্থায় যে মানুষ সৃষ্টি হতে লাগল তাদের শুধু একটি দিকেরই পরিচয় লাভ হলো-দেহের দিক, জড়, স্থূল দিক, স্বার্থের দিক, ভোগের দিক। জীবনের অন্য দিকটার সাথে তাদের পরিচয় বিলুপ্ত হয়ে গেছে। অর্থাৎ 'ধর্মনিরপেক্ষতা' সৃষ্টি করে তা জাতীয় জীবনে প্রয়োগ করার ফলে শুধু জাতীয় জীবনই অন্যায়-অত্যাচার, অশান্তি I রক্তপাতে পূর্ণ হয়ে যায় নি, যেখানে ধর্মকে টিকে থাকার অধিকার দেয়া হয়েছিল অর্থাৎ ব্যক্তি জীবনে, সেখানেও অধিকাংশ মানুষের জীবন থেকে ধর্ম বিদায় নিয়েছে, নিতে বাধ্য হয়েছে। দেহ থেকে আত্মা পৃথক করার পরিণাম এই হয়েছে যে, মানুষের মনুষ্যত্ব লোপ পেয়ে তাদের ব্যক্তিত্ব পশুর পর্যায়ে নেমে গেছে।

আমরা সমাজে প্রচলিত অন্যায় অপরাধের জন্য ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে দায়ী করে থাকি কিন্তু একটু গভীরে গেলেই আমরা দেখব যে, এই সকল অশান্তি Rb¨ এই ধর্মনিরপেক্ষ সিস্টেমই দায়ী। মানুষ প্রকৃতপক্ষে কাদামাটির ন্যায়। এই কাদামাটিকে যে ছাঁচ বা ডাইসের মধ্যেই ফেলা হবে, কাদামাটি সেই ডাইসের

আকার ধারণ করবে। কখনও কোনো মানুষ মায়ের গর্ভ থেকে চোর হয়ে, ডাকাত হয়ে, অন্যায়কারী, দূর্নীতিবাজ হয়ে জন্ম নেয় না। কিন্তু অন্যায় সমাজব্যবস্থার প্রভাবে তারা ধীরে ধীরে এমন অপরাধী চরিত্রের হয়ে যায়। Ab¨vb¨ RwZi gZ Avgiv I GgbB এক স্রষ্টা বিবর্জিত আত্মাহীন সিস্টেম গ্রহণ করেছি, যার আবশ্যম্ভাবী ফল আমরা এড়াতে পারছি না। মানুষ হয়ে যাচ্ছে আত্মাহীন জানোয়ার। এই সিস্টেমে খুব সহজেই মানুষের সদগুণাবলিকে অসদগুণাবলী দ্বারা প্রতিস্থাপিত হচ্ছে। শত চেষ্টা করেও মানুষ ভালো হয়ে থাকতে পারছে না। সুতরাং মানুষকে মনুষ্যত্ব ফিরে পেতে হলে ধর্মনিরপেক্ষ জীবনব্যবস্থা প্রত্যাখ্যান করে আল্লাহর দেওয়া ভারসাম্যপূর্ণ জীবনব্যবস্থা গ্রহণ KivB GLb GKgvÎ mgvavb|

COMMUNISM (mvg¨ev`)

› As planned = all people equal (পরিকল্পনা মোতাবেক = সকল gvbl mgvb)|

› Government owns everything (me wKQi gvwjK miKvi)|

› People own the Government (সরকারের মালিক জনগণ)।

› So...in theory, everyone owns everything (mZivs তাত্ত্বিকভাবে, প্রত্যেক ব্যক্তি প্রত্যেক বস্তুর মালিক)।

› All needs met & all people contribute (সকলের সম্মিলিত অংশগ্রহণের মাধ্যমে সব প্রয়োজন পূর্ণ হবে)।

› UTOPIA - relies on the goodness within (ইউটোপিয়া - (কল্পরাজ্য) নির্ভর করে মানুষের সৎ চরিত্রের উপর)।

› Perfect in theory - Has never worked in practice (তাত্ত্বিকভাবে নিপুণ - কিন্তু কখনো বাস্বে কাজ করে নি।)

› Why? The greed and corruption of a few paired with the ignorance and willingness to follow of many. (KviY? জোটবদ্ধ কিছু ব্যক্তির লোভ ও দুর্নীতি, সেই সঙ্গে অজ্ঞতা ও একসাথে অনেক ব্যক্তিকে অনুসরণ করার অভিপ্রায়।)

এমামুয্যামান জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নীর লেখা থেকে

ইসলামের অর্থনীতির সফলতা এবং পুঁজিবাদ ও মার্কসীয় অর্থনীতির ব্যর্থতার নেপথ্যে

মানুষ মূলত সামাজিক জীব এবং সমাজবদ্ধভাবে বসবাস করে। তার কারণ কোনো মানুষই স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়, জীবনধারণের জন্য তাকে কোনো না কোনো কারণে অন্যের উপর নির্ভরশীল হতেই হয়, নির্ভরশীলতার কারণেই তাকে সমাজবদ্ধভাবে বসবাস করতে হয়। সমাজবদ্ধভাবে জীবনযাপন করতে গেলে মানুষকে স্বভাবতই GKwU wbqg-কানুনের অর্থাৎ সিস্টেমের মধ্যেই বাস করতে হয়। যে সিস্টেমের মধ্যে জীবনের বিভিন্ন বিষয়ের নিয়ামক থাকতে হয়। এই সিস্টেম বা নিয়ামককে জীবনব্যবস্থা বলা যায়। স্বভাবতই সেই জীবনব্যবস্থায় একদিকে যেমন থাকবে আত্মিক উন্নয়নের ব্যবস্থা অন্যদিকে AvBb Kvbb, `Êwewa, A_bxwZ, ivRbxwZ, mgvRbxwZ, wk¶vbxwZ BZ¨vw` সর্বপ্রকার ও সর্ববিষয়ে বিধানও থাকতে হবে। একটি জীবনব্যবস্থা ছাড়া সমাজবদ্ধ জীবের বাস করা বা জীবন যাপন করা একেবারেই অসম্ভব। মানুষের কাছে কাম্য হচ্ছে এমন একটি জীবনব্যবস্থার মধ্যে সে বাস করবে, যে জীবনব্যবস্থাটি হবে সঠিক ও নির্ভুল; সেই ব্যবস্থা কার্যকরী করার ফলে মানুষ এমন একটি সমাজে বাস করবে যেখানে কোনো অন্যায় থাকবে না, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক কোনো প্রকার অন্যায় থাকবে না, অবিচার থাকবে না, যেখানে জীবন এবং সম্পদের নিরাপত্তা হবে পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত; যেখানে চিন্v, evK-স্বাধীনতা ও ব্যক্তি স্বাধীনতা হবে সংরক্ষিত এবং মানুষে মানুষে সংঘাত, দ্বন্দ্ব, রক্তপাত থাকবে না। অবশ্য যেহেতু মানবজাতির মধ্যে ভালো-মন্দ সব রকম লোকই থাকে, সেহেতু এটা শতকরা ১০০ ভাগ অর্জন করা সম্ভব নয়, কিন্তু জীবনব্যবস্থার নির্ভুলতা বা সঠিকতার ফলে যদি অপরাধ, অন্যায়, অবিচার এবং মানুষে মানুষে সংঘর্ষ ও রক্তপাত নিম্নতম পর্যায়ে, kZKiv ১% বা ২% এ নেমে আসে, তবে তা-ই যথেষ্ট। এমন একটি নিখুঁত

জীবনব্যবস্থাই আল্লাহ নাজেল করেছেন তাঁর শেষ রসুলের মাধ্যমে। স্রষ্টার দেওয়া এই নিখুঁত ত্রুটিহীন জীবনব্যবস্থা কায়েম করলেই মানবজীবনে, আমাদের জীবনে কার্যকরী করলে অন্যায়, অবিচার, অশান্তি, wbivcËvnxbZv, Aciva, msNl, i³cvত প্রায় বিলুপ্ত হয়ে নিরাপদ ও শান্তিgq Rxeb Avgiv পাবো। এই শান্তিময় অবস্থাটির নামই স্রষ্টা দিয়েছেন ইসলাম, অর্থাৎ শান্তি।

প্রশ্ন হতে পারে যে স্রষ্টার দেওয়া জীবনবিধান মানুষের সমাজ জীবনে প্রয়োগ ও কার্যকরী করা হলে জীবনে যে ন্যায়, সুবিচার, নিরাপত্তা ইত্যাদি প্রতিষ্ঠিত হবে তার যুক্তি ও পgvY wK?

এর বহু প্রমাণ আছে। তবে সবচেয়ে বড় প্রমাণ হলো ইতিহাস। শেষ নবী মোহাম্মদের (দ.) মাধ্যমে যে শেষ জীবন বিধান স্রষ্টা প্রেরণ করেছিলেন তা মানবজাতির একাংশ গ্রহণ ও সমষ্টিগত জীবনে কার্যকরী করার ফলে জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দু'টি অংশ অর্থাৎ নিরাপত্তা ও অর্থনীতিতে কী ফল হয়েছিল তা ইতিহাস। নিরাপত্তার ক্ষেত্রে পূর্ণ নিরাপত্তা যাকে বলে তা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। মানুষ রাতে শোওয়ার সময় ঘরের দরজা বন্ধ করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করত না, রাস্তায় ধনসম্পদ ফেলে রাখলেও তা পরে যেয়ে যথাস্থানে পাওয়া যেত, চুরি, ডাকাতি, হত্যা, রাহাজানী প্রায় নির্মূল হয়ে গিয়েছিল, আদালতে মাসের পর মাস কোনো অপরাধ সংক্রান্ত gvgjv AvmZ না। আর অর্থনৈতিক দিক থেকে প্রতিটি মানুষ স্বচ্ছল হয়ে গিয়েছিল। এই স্বচ্ছলতা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে, মানুষ যাকাত ও সদকা দেওয়ার জন্য টাকা পয়সা নিয়ে রাস্তা iv¯ায় ঘুরে বেড়াত কিন্তু সেই টাকা গ্রহণ করার মতো লোক পাওয়া যেত না। শহরে নগরে লোক না পেয়ে মানুষ মরুভূমির অভ্যন্তরে যাকাত দেওয়ার জন্য ঘুরে বেড়াতো। এটি ইতিহাস। মানবরচিত কোনো জীবনব্যবস্থাই এর একটি ভগ্নাংশও মানবজাতিকে উপহার দিতে পারে bvB।

পুঁজিবাদী অর্থনীতির ব্যর্থতার ফল যুক্তরাষ্ট্রের ওয়ালস্ট্রিট বিক্ষোভ যার cwZcv`¨ wQj- পৃথিবীর তাবত সম্পদ ১% মানুষের কুক্ষিগত, বঞ্চিত বাকি 99%|

শান্তিময় ব্যক্তি ও সমাজ জীবনের জন্য সর্ব প্রথম যে জিনিসটি প্রয়োজন তা হচ্ছে জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তা। তারপর ক্রমান্বয়ে আসে অর্থনৈতিক সুবিচার, তারপর ক্রমান্বয়ে আসে রাজনৈতিক, সামাজিক ইত্যাদি সুবিচার। এ অধ্যায়ে আমরা আলোচনা করব ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা নিয়ে।

জড়বাদী পাশ্চাত্যের চিন্vi cfvevaxb mg¨ পৃথিবীতে এখন বোধহয় অর্থনৈতিক ব্যবস্থাই মানুষের কাছে সবচেয়ে প্রয়োজনীয়, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। দু'চার শতাব্দী আগে পর্যন্ও প্রাচ্যের বৌদ্ধ, জৈন, সনাতন ধর্মী ভারতীয়দের কাছে অর্থনীতির অত গুরুত্ব ছিল না, পার্থিব জীবনের চেয়ে আত্মার ও চরিত্রের উৎকর্ষের সম্মান ছিল বেশি। একজন কোটিপতির চেয়ে

একজন জ্ঞানী, চরিত্রবান কিন্তু গরীব লোককে সমাজ অনেক বেশি সম্মান করত। আর শেষ 'দীন ইসলাম' হলো ভারসাম্যযুক্ত (Balanced)| mg¯ দীনটাই ভারসাম্যপূর্ণ। যে জন্য এই জাতিটাকে আল্লাহ বর্ণনা করেছেন fvimvg¨hক্ত জাতি বলে (সুরা বাকারা ১৪৩)। অর্থাৎ এর উভয় জীবনই সমান গুরুত্বপূর্ণ। খ্রিষ্টধর্মের বিফলতার জন্য যখন ইউরোপ জাতীয় জীবন থেকে এটাকে বাদ দিয়ে ধর্ম নিরপেক্ষতা বলে এক নীতি উদ্ভাবন করে নিল, তখন ওটার অর্থনীতি ধার করল ইহুদিদের কাছে থেকে। করতে বাধ্য হলো; কারণ খ্রিষ্টধর্মে ইহলৌকিক কোনো আইন কানুন নেই সুতরাং অর্থনীতিও নেই। ঈসা (আ.) এসেছিলেন শুধুমাত্র ইহুদিদের আধ্যাত্মিক সংশোধনের জন্য; ইহুদিদের জাতীয় অর্থাৎ রাজনৈতিক আর্থ-mvgwRK AvBb `Êwewa ইত্যাদি মোটামুটি অবিকৃতই ছিল। ইউরোপ ইহুদিদের কাছে থেকে অর্থনীতি ধার নিলেও অবিকৃত অবস্থায় নিল না। তারা ওটার মধ্যে সুদ প্রবর্তন করে ধনতন্ত্রে পরিবর্তন করে নিল। এ কাজটা অবশ্য ইহুদিরা আগেই করে নিয়েছিল মুসার (আ.) ব্যবস্থাকে পরিবর্তন করে। মানুষের তৈরি ব্যবস্থা সুষ্ঠু সমাধান দিতে পারে না, কাজেই এই অর্থনীতিও পারল না। ফল হলো Ab¨vq-শোষণ, জাতীয় সম্পদের অসম বণ্টন। এই অন্যায় যখন মানুষের mহ্যের সীমা অতিক্রম করল তখন তার বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াল আরেক অন্যায়; কার্ল মার্কসের রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ, কমিউনিজম। এটাও সেই মানুষের তৈরি ব্যবস্থা সুতরাং অবশ্যম্ভাবী পরিণতি সেই অন্যায়, শুধু অন্য রকমের অন্যায়। এই ব্যবস্থাও মানুষের অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান দিতে ব্যর্থ হয়েছে। কারণ আল্লাহর দেয়া ব্যবস্থা ছাড়া কারো তৈরি ব্যবস্থা প্রকৃত সমাধান দিতে পারে না, পারবে না।

এই দীনের অর্থনীতির মূল ভিত্তি আল্লাহ মেহেরবানি করে বুঝতে দিয়েছেন; শুধু সেইটুকুই আমি লিখছি তার বেশি নয়। ভিত্তি বলতে আমি বোঝাচ্ছি- নীতি, যে নীতির উপর একটা ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। পুঁজিবাদ, ধনতন্ত্রের নীতি হলো জনসাধারণের সম্পদ সাপটে এনে এক বা একাধিক স্থানে জড়ো করা।

সমাজতন্ত্রের নীতি হলো জনসাধারণের সম্পদ রাষ্ট্রের হাতে তুলে নেওয়া। মূলে একই কথা, দু'টোই জনসাধারণকে বঞ্চিত করা। পুঁজিবাদে দেশের, জাতির সম্পদ পুঞ্জিভূত করে সংখ্যালঘিষ্ঠ মানুষের হাতে ব্যাংক ইত্যাদির মাধ্যমে। যার ফলভোগ করে অতি অল্পসংখ্যক লোক এবং তারা সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষকে বঞ্চিত করে বিরাট ধনী হয়ে যায়। আর সমাজতন্ত্র দেশের জাতির সম্পদ পুঞ্জিভূত করে রাষ্ট্রের হাতে। জনসাধারণকে দেয় তাদের শুধু খাদ্য, পরিধেয়, শিক্ষা ও চিকিৎসা, বাসস্থানের মতো প্রাথমিক, মৌলিক প্রয়োজনগুলি, যদিও কার্যক্ষেত্রে তাও সুষ্ঠুভাবে করতে ব্যর্থ হয়েছে। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় সম্পদ পুঞ্জিভূত করে হাতে গোনা কতকগুলি কোটিপতি সৃষ্টি হয়, বাকি জনসাধারণ জীবনের প্রাথমিক মৌলিক প্রয়োজনগুলি থেকেও বঞ্চিত হয়। এই ব্যবস্থা যতটুকু পরিধিতে প্রয়োগ করা হবে ততটুকু পরিধিতেই ঐ ফল হবে। একটি ভৌগোলিক রাষ্ট্রে (Nation State) এ ব্যবস্থা প্রয়োগ করলে যেমন ঐ রাষ্ট্রের জনসাধারণের ভীষণ দারিদ্র্যের বিনিময়ে মুষ্টিমেয় কোটিপতি সৃষ্টি হবে ঠিক তেমনি পুঁজিবাদী ব্যবস্থা পৃথিবীময় প্রয়োগ করলে কয়েকটি ভৌগোলিক রাষ্ট্র বিপুল ধনী হয়ে যাবে আর অধিকাংশ রাষ্ট্র চরম দারিদ্র্যের মধ্যে পতিত হবে যেমন বর্তমানে হয়েছে। **এর কারণ হলো একটি ভৌগোলিক রাষ্ট্রের সম্পদ যেমন সীমিত- তেমনি পৃথিবীর সম্পদও সীমিত। সীমিত যে কোনো জিনিসকেই কোথাও একত্রিত করা, পুঞ্জিভূত করা মানেই অন্যস্থানে অভাব সৃষ্টি করা।** একটা রাষ্ট্রের ভেতরই হোক, আর সমস্ পৃথিবীতেই হোক, সেটার সম্পদ, যা সমস্ মানব জাতির মধ্যে ছড়িয়ে থwKvi কথা, সেটাকে যদি কোথাও পুঞ্জিভূত করা হয় তবে অন্যত্র অভাব সৃষ্ট হওয়া Aek¨¤vex| mgvRev`x, cwRev`x I KwgDwb÷ (Socialist, Capital & Communist) এই সকল অর্থনৈতিক ব্যবস্থাই মানুষের তৈরি, গায়রুল্লাহর ব্যবস্থা। সুতরাং এর পরিণাম অবশ্যই অন্যায়-অবিচার। অন্যদিকে শেষ Rxeb-ব্যবস্থায় অর্থনীতির প্রণেতা স্বয়ং স্রষ্টা, আল্লাহ। এই ব্যবস্থার ভিত্তি

নীতি হচ্ছে সম্পদকে মানুষের মধ্যে দ্রুত গতিতে চালিত করা, কোথাও সঞ্চিত হতে না দেওয়া। পুঁজিবাদ বলছে সম্পদ খরচ না করে সঞ্চয় করো; সবার সঞ্চয় একত্র করো, পুঞ্জিভূত করো (ব্যাংকে), আল্লাহ কোর'আনে বলছেন খরচ করো, ব্যয় করো, সম্পদ জমা করো না, পুঞ্জিভূত করো না। অর্থাৎ ইসলামের অর্থনীতি পুঁজিবাদী অর্থনীতির ঠিক বিপরীত। একটায় সঞ্চয় করো অন্যটায় ব্যয় করো। অন্যদিকে সমাজতন্ত্রী সাম্যবাদী অর্থনীতি ব্যক্তিগত মালিকানা নিষিদ্ধ করে জাতির সমস্ত সম্পদ রাষ্ট্রের হাতে পুঞ্জিভূত করে। এটাও ইসলামের বিপরীত। কারণ, ইসলাম ব¨w³MZ gvwjKvbv m¤úY স্বীকার করে এবং রাষ্ট্রের হাতে সম্পদ পুঞ্জিভূত করে না। পুঁজিবাদের ও সমাজতন্ত্রের যেমন আলাদা নিজস্ব অর্থনীতি আছে তেমনি ইসলামের নিজস্ব অর্থনীতি আছে। এককথায় বললে বলতে হয় সেটা হচ্ছে সম্পদকে যত দ্রুত সম্ভব চালিত করা, কোথাও যেন সেটা স্থবির-অনড় না হতে পারে| GB Rb¨B কোর'আনে এই অর্থনীতির বিধাতা, বিধানদাতা বহুবার তাগিদ দিয়েছেন খরচ করো, ব্যয় করো, কিন্তু বোধহয় একবারও বলেন নি যে, সঞ্চয় করো। যাকাত দেয়া, খারাজ, খুমস ও ওশর দেয়া এবং তার উপর সাদকা দান ইত্যাদি খরচের কথা এতবার তিনি বলেছেন যে, বোধহয় শুধুমাত্র তওহীদ A_vr Rxeনের সর্বক্ষেত্রে একমাত্র আল্লাহকে প্রভু, হুকুমদাতা, এলাহ বলে স্বীকার ও বিশ্বাস করা এবং জেহাদ ছাড়া অন্য কোনো বিষয়ে এতবার বলেন নি। কারণ, একটা জাতির এবং পরবর্তীতে সমগ্র পৃথিবীতে অর্থাৎ যে কোনো পরিধিতে সম্পদ যথাযথ এবং বণ্টনের জন্য প্রয়োজন হচ্ছে সঞ্চয় নয়, ব্যয়। একজনের হাত থেকে অন্য জনের হাতে হস্তান্তi, A_vr MwZkxjZv| cwZwU n¯Íাস্তর যত দ্রুত হতে থাকবে তত বেশি সংখ্যক লোক ঐ একই সম্পদ থেকে লাভবান হতে থাকবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, ধরুন একটা এক টাকার নোট। এই নোটটা যার হাতেই পড়ল, সে যথা সম্ভব শীঘ্র সেটা খরচ করে ফেলল। সে খরচ যেমন করেই হোক, কোনো কিছু কিনেই হোক বা দান করেই হোক বা কাউকে ধার দিয়েই হোক বা কোনো ব্যবসাতে বিনিয়োগ

করেই হোক। ঐ নোটটা যদি সকাল থেকে রাত পর্যন্ দশজন লোকের হাত বদলায় তবে ঐ এক দিনে নোটটা দশজন লোককে লাভবান করবে। আর যদি একশ' জনের হাত বদলায় তবে একশ' জনকে লাভবান করবে| KviY প্রতিবার হাত বদলাবার সময় দু'জনের মধ্যে একজনকে অবশ্যই লাভবান হতেই হবে। অর্থাৎ ঐ সীমিত সম্পদটা অর্থাৎ ঐ এক টাকার নোটটা যত দ্রুত গতিতে হাত বদলাবে যত দ্রুত গতিতে সমাজের মধ্যে চালিত হবে তত বেশি সংখ্যক লোককে লাভবান করবে; তত বেশি সংখ্যক লোক অর্থনৈতিক উন্নতি করবে এবং পরিণতিতে সমস্ সমাজকে অর্থনৈতিক ভাবে উন্নত করবে, সম্পদশালী করবে।

ঐ গতিশীলতার জন্য যে কোনো পরিধির সীমিত সম্পদ সমাজে নিজে থেকেই সুষ্ঠুভাবে বণ্টন হয়ে যাবে কোথাও পুঞ্জিভূত হতে পারবে না এবং হবার দরকারও নেই। সম্পদের এই গতিশীলতার জন্য নিজে থেকেই সুষম-সুষ্ঠু বণ্টন হয়ে যাবার কারণে একে রাষ্ট্রায়ত্ত করার কোনো প্রয়োজন নেই, ব্যক্তির মালিকানাকে নিষেধ করারও কোনো প্রয়োজন নেই। ব্যক্তি মালিকানা নিষিদ্ধ করার কুফল, যে কুফলের জন্য রাশিয়া আজও খাদ্যে-পণ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারে নি এবং আজও আমেরিকা থেকে লক্ষ লক্ষ টন খাদ্য আমদানি করতে হয়, সে কুফলও ভোগ করতে হয় না। যা হোক, উদাহরণ স্বরূপ যে এক টাকার নোটের কথা বললাম, সেই নোটটা যদি সমস্ দিনে কোনো হস্তান্তর না হয়ে কোনো লোকের পকেটে বা কোনো ব্যাংকে পড়ে থাকে তবে ওটার আসল মূল্য এক টুকরো বাজে ছেঁড়া কাগজের সমান। কারণ সারাদিনে সেটা সমাজের মানুষের কোনো উপকার করতে পাi j bv, কারো অথনৈতিক উন্নতি করতে পারল না। আবার বলছি আল্লাহর দেয়া জীবন বিধানের অর্থনীতির বুনিয়াদ-ভিত্তি হলো সম্পদের দ্রুত থেকে দ্রুততর MwZkxj Zv (Fast and still faster circulation of wealth)|

কেউ বলতে পারেন- কেন? টাকার নোটটা অর্থাৎ সম্পদ পকেটে থেকে গেলে, বাক্সে ভরে রাখলে না হয় বুঝলাম ওটা উৎপাদনহীন, নিষ্ফল হয়ে গেল কিন্তু

ব্যাংকে জমা পুঁজি তো বিনিয়োগ করা হয় এবং তা উৎপাদনে লাগে। ঠিক কথা কিন্তু ব্যাংকে জমা করা ঐ পুঁজি বিনিয়োগের গতি স্বাধীন মুক্ত হস্তান্তরের চেয়ে বহু কম, কোনো তুলনাই হয় না। ব্যাংকের সম্পদ বিনিয়োগ করতে বহু তদন্ত, AvBb-কানুন লাল ফিতার দৌরাত্ম এবং তারপরও ঐ বিনিয়োগের সুফল ভোগ করে সমাজের একটি বিশেষ শ্রেণির মানুষ। শুধু ঐ শ্রেণিটি- যে শ্রেণিটি ইতিমধ্যেই সম্পদশালী, জনসাধারণের অনেক ঊর্ধ্বে। ব্যাংক কি যে চায় তাকেই পুঁজি ধার দেয়? অবশ্যই নয়। যে লোক দেখাতে পারবে যে, তার আগে থেকেই যথেষ্ট সম্পদ আছে কিন্তু আরো চাই, শুধু তাকেই ব্যাংক পুঁজি ধার দেয়, এটা সবারই জানা। যার কিছু নেই, যে ব্যাংকের কাছে যথেষ্ট পরিমাণ সম্পদ বন্ধক দিতে পারবে না তাকে ব্যাংক কখনো পুঁজি ধার দেয় না, দেবে না। এক কথায় তৈলাক্ত মাথায় আরও তেল দেয়া, ধনীকে আরো ধনী করা, গরীবকে আরও গরীব করা। সুতরাং ঐ পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় সম্পদের সুষ্ঠু বণ্টন অসম্ভব। শেষ ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় জনসাধারণকে তাদের ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে হয় নি সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার মতো। জনসাধারণকে ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগতভাবে কোনো অর্থনৈতিক উদ্যোগ-প্রচেষ্টাকেও নিষিদ্ধ করতে হয় নি। কারণ m¤úদের ঐ দ্রুত গতিই কোথাও সম্পদকে অস্বাভাবিকভাবে পুঞ্জিভূত হতে দেবে না। পানির প্রবল স্রোত যেমন বালির বাঁধ ভেঙ্গে দেয়, সম্পদের স্রোত তেমনি কোথাও সম্পদকে স্তুপীকৃত হতে দেবে না। অথচ ব্যক্তিগত অর্থনৈতিক উদ্যোগ প্রচেষ্টার যে শক্তিশালী সুফল তারও ফল ভোগ করবে সমাজ। যে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টাকে নিষিদ্ধ করার ফলে আজ সমাজতন্ত্রের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়েছে, আজ তারা বাধ্য হচ্ছে মানুষকে ব্যক্তিগত সম্পত্তির ও অর্থনৈতিক প্রচেষ্টার মালিকানার অধিকার ফিরিয়ে দিতে। আমাদের দেশের উদাহরণ দেওয়া যায়। এদেশের মানুষ যখন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে জীবিকার সন্ধানে ছড়িয়ে পড়ে এবং সেখান থেকে বৈদেশিক মুদ্রা দেশে পাঠায় তখন সে অর্থ স্বভাবতই দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ

ভূমিকা রাখে। এ থেকে সুস্পষ্ট হয় যে, পৃথিবীতে মানুষের বিচরণ ও আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রে সকল প্রকার বাধা তুলে নিলে সমগ্র পৃথিবীর অর্থনীতিই সমৃদ্ধ হতো।

ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার মূলনীতি হচ্ছে সুদ ভিত্তিক পুঁজিবাদ, পরিণাম হচ্ছে নিষ্ঠুর, অমানবিক অর্থনৈতিক অবিচার, একদিকে মুষ্টিমেয় মানুষের হাতে বিপুল সম্পদ, তাদের পাশবিক ভোগ বিলাস; অন্যদিকে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসাধারণের KwVb `wi`¨, Aavnvi-Abvnvi-মানবেতর জীবনযাপন। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার মূলনীতি হচ্ছে সমস্ সম্পদ রাষ্ট্রায়ত্ত করে মানুষের ব্যক্তিগত m¤পত্তির অধিকার হরণ করে সম্পদ বণ্টন। এ বণ্টন শুধু মৌলিক প্রয়োজনের Ges Zv-ও ঐ মানুষের শ্রম ও উৎপাদনের উপর ভিত্তি করে। পরিণাম হচ্ছে খাদ্য, বস্ত্র, ও ক্ষুদ্র বাসস্থানের বিনিময়ে সংখ্যাগরিষ্ট জনসাধারণের আত্মাহীন যন্ত্রে পরিণত হওয়া ও মুষ্টিমেয় নেতৃবৃন্দের ভোগ-বিলাস ও প্রাচুর্যের মধ্যে বাস করে ঐ বঞ্চিত কৃষক শ্রমিক জনসাধারণের নেতৃত্ব করা। অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ। ঐ দুই ব্যবস্থাই মানুষের-গায়রুল্লাহর সৃষ্টি এবং দুটোরই পরিণাম বৃহত্তর জনসাধারণের উপর নিষ্ঠুর অবিচার, বঞ্চনা। শেষ দীনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মূলনীতি হচ্ছে সমস্ সম্পদকে যত দ্রুত সম্ভব গতিশীল করে দেওয়া এবং অর্থনীতিK ¯vaxb-মুক্ত করে দেওয়া। প্রত্যেক মানুষের সম্পদ সম্পত্তির মালিকানা স্বীকার করা, প্রত্যেকের অর্থনৈতিক উদ্যোগ-প্রচেষ্টাকে শুধু স্বীকৃতি দেওয়া নয় উৎসাহিত করা (সুরা বাকারা ২৭৫)। একদিকে অর্থনৈতিক উদ্যোগ প্রচেষ্টা অর্থাৎ ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্পকে আল্লাহ উৎসাহিত করছেন অন্যদিকে ক্রমাগত বলে চলেছেন খরচ কর, ব্যয় কর। উদ্দেশ্য সেই গতিশীল সম্পদের নীতি। পরিণাম সমাজের সর্বস্ রে সম্পদের সুষ্ঠু-mlg eÈb, দারিদ্র্যের ইতি। প্রশ্ন হতে পারে এই নীতি অর্থাৎ সম্পদকে দ্রুত গতিশীল করে দিলে যে সম্পদের অমন সুষ্ঠু বণ্টন হয়ে মানুষের দারিদ্র্য লুপ্ত হয়ে যাবে, তার প্রমাণ কি? এর জবাব হচ্ছে ক) স্রষ্টার দেয়া নীতি এবং ব্যবস্থাকে অবশ্যই নির্ভুল ও সঠিক বলে গ্রহণ করতে হবে, নইলে তা যুক্তি-সঙ্গত হবে

না। যিনি সৃষ্টি করেছেন, তিনিই ভুল করছেন এটা যুক্তিসঙ্গত নয় (Fallacious)। তিনি নিজেই বলেছেন “যিনি সৃষ্টি করেছেন তোমরা কি তার চেয়ে বেশি জান?” তারপর নিজেই তার জবাব দিচ্ছেন “তিনি সর্বজ্ঞÓ (সুরা মূলক ১৪)। এ যুক্তির কোনো জবাব নেই। খ) এই অর্থনীতি যখন প্রয়োগ হয়েছিল, তখন তার কী ফল হয়েছিল তা ইতিহাস। মানুষের অর্থনৈতিক উন্নতি এমন পর্যায়ে উন্নীত হয়েছিল যে- মানুষ যাকাত দেবার জন্য হন্যে হয়ে ঘুরতো, লোক পেত না।

আল্লাহর সর্বশক্তিমত্তায় বা তাঁর অসীম জ্ঞানের সম্বন্ধে যv i v wekvmx bb Zv i v যুক্তি উত্থাপন করতে পারেন যে, চৌদ্দশ’ বছর আগে মানবসমাজের যে অবস্থা ছিল সেখানে হয়তো এই জীবনব্যবস্থা কার্যকরী হয়েছিল এবং ঐ অকল্পনীয় ফল দেখা গিয়েছিল। কিন্তু বর্তমানে বিজ্ঞানের, প্রযুক্তির যে অগ্রগতি হয়েছে তাতে জীবনে যে জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে এখন ঐ পুরনো ব্যবস্থা আর সেরূপ ফল দেখাতে পারবে না; এখন মানুষকেই চিন্স্ v f v eb v করে তার জীবনব্যবস্থা তৈরি করে নিতে হবে এবং আমরা তা-ই নিচ্ছি।

এর জবাব হচ্ছে এই যে, এই দীনের সমস্ ব্যবস্থা সমস্ AvBb-Kvbb `Êwewa mg¯ই প্রাকৃতিক নিয়মের উপর প্রতিষ্ঠিত। তাই এর এক নাম দীনে ফিতরাত, প্রাকৃতিক জীবন-e¨বস্থা। প্রাকৃতিক নিয়ম অপরিবর্তনীয়। প্রাকৃতিক wbqg-আইন লক্ষ বছরে আগে যা ছিল আজও তাই আছে, লক্ষ বছরে পরেও তাই থাকবে। অবস্থার পারিপার্শ্বিকতায় বহু বিষয় বদলে যায়। অনেক বিষয় অগ্রহণযোগ্য ও অপ্রাসঙ্গিক হয়ে যায়। কিন্তু অনেক বিষয় আছে যা চিরন্‌b, অপরিবর্তনীয়, শাশ্বত, এর কোনো পরিবর্তন হয় না। যেমনঃ একটি মানুষের নাকে সজোরে ঘুসি মারলে তার নাক দিয়ে রক্ত বের হবে, লক্ষ বছর আগে এই ঘুষি মারলে তখনও রক্ত বের হতো, আজও বেরোয়, লক্ষ বছর পরেও মানুষের নাকে ঘুষি মারলে রক্ত বেরোবে। এর কোনো পরিবর্তন নেই। তেমনিভাবে জীবনের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সুদ ভিত্তিক পুঁজিবাদ মানুষ সমাজে যে ক্ষতি করে, ধনী-দরিদ্রের যে বৈষম্য বৃদ্ধি করে তা লক্ষ বছর আগেও

কোরত, এখনও করছে এবং আজ থেকে লক্ষ বছর পরেও এই সুদ ভিত্তিক অর্থনীতি মানবজীবনে প্রয়োগ করলে একই বিষময় ফল সৃষ্টি করবে। আগুনের পোড়াবার শক্তি লক্ষ বছর আগে যা ছিল, আজও তাই আছে এবং লক্ষ বছর পরেও অপরিবর্তনায়ভাবে তা-ই থাকবে। এমনি বহু জিনিস আছে যা শাশ্বত অপরিবর্তনীয় প্রাকৃতিক নিয়ম। সর্বজ্ঞানী আল্লাহ এই শেষ জীবনবিধান (দীন) তেমনি সেইসব অপরিবর্তনীয় শাশ্বত সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত করেছেন যা পৃথিবীর বাকি আয়ুষ্কালের মধ্যে পরিবর্তন হবে না। এই জন্য এই দীনের এক নাম দীনুল ফেতরাহ বা প্রাকতিক দীন (কোর'আন, সুরা রূম ৩০)। এই জীবনব্যবস্থার প্রতিটি আইন-কানুন, আদেশ-নিষেধ তিনি অতি সতর্কতার সঙ্গে ঐ সব অপরিবর্তনীয় প্রাকৃতিক নিয়মের উপর প্রতিষ্ঠিত করেছেন, যাতে মানবজাতির বাকি আয়ুষ্কালের মধ্যে কোনো পরিবর্তনের প্রয়োজন না থাকে। স্থান, কাল ও পাত্রভেদে পরিবর্তনীয় যা কিছু ইতিপূর্বে প্রেরিত জীবনব্যবস্থাগুলিতে ছিল তার কোনোটিই এতে স্থান পায় নাই, এতে শুধু অপরিবর্তনীয় শাশ্বত প্রাকৃতিক নিয়মের উপর প্রতিষ্ঠিত বিষয়গুলিই স্থান পেয়েছে। কাজেই চৌদ্দশ' বছর আগে এই জীবনব্যবস্থা মানুষের জীবনে প্রয়োগে যে ফল হয়েছিল, বর্তমানে প্রয়োগ করলেও সেই একই ফল হবে এবং লক্ষ বছর পরে প্রয়োগ করলেও সেই অকল্পনীয় ফলই হবে। তবে একটি বিষয় পাঠককে মনে রাখতে হবে, এখানে আমি যে জীবনব্যবস্থা (দীন) প্রতিষ্ঠার কথা বলছি আর বর্তমানে ইসলাম বলে যে ধর্মটি চালু আছে এই দু'টি এক জিনিস নয়। আমি সেই প্রকৃত ইসলামের কথা বলছি যা আল্লাহ তাঁর রসুলের মাধ্যমে পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলেন। এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে আমার লেখা বইগুলি পড়ার অনুরোধ করছি।

আরও একটি প্রশ্ন হতে পারে- সেটা হলো পুঁজিবাদী ব্যবস্থা যদি সঠিক না হয়ে থাকে তবে ঐ ব্যবস্থায় পাশ্চাত্য জাতিগুলি এত প্রাচুর্যের মধ্যে বাস করছে

শতাব্দীর পর শতাব্দী বিশ্বকে শোষণ করে যে ইংল্যান্ড সম্পদের পাহাড় গড়েছে, তারাও পুঁজিবাদী অর্থনীতির অবিচারের শিকার হয়ে অনিবার্য পরিণতির দিকে ধাবিত হচ্ছে। কিছুদিন আগেই সেখানে বঞ্চিত মানুষের পুঞ্জিভূত ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটে দাঙ্গারূপে, যার দাবানল সারাদেশে ছড়িয়ে পড়ে। দাঙ্গাকালে একটি দোকান লুটপাটের দৃশ্য।

কেমন করে? এর জবাব হচ্ছে ক) পাশ্চাত্যের অতি ধনী জাতিগুলির মধ্যেও সম্পদের সুষ্ঠু বণ্টন নেই, ওসব দেশে একটা ক্ষুদ্র শ্রেণি প্রচণ্ড ধনী, কোটি কোটি ডলার পাউণ্ডের মালিক, কিন্তু প্রতি দেশে গরীব, অতি গরীব, বস্িevmx আছে ভিখারী আছে। তবে এ কথা অনস্বীকার্য যে, ও সব দেশে গরীবের msL¨v Kg; wfLvixi msL¨ Kg Ges সার্বিকভাবে সমাজ প্রাচুর্যের মধ্যেই বাস করে। কিন্তু এর কারণ আছে, বিবিধ কারণের মধ্যে সর্ব প্রধান কারণ হলো পাশ্চাত্যের ঐ জাতিগুলি এক সময়ে প্রায় সমস্ পৃথিবীটাকে সামরিক শক্তি বলে অধিকার করে কয়েক শতাব্দী ধরে শাসন ও শোষণ করে নিজেরা ধনী হয়েছে। ঐ শোষিত দেশগুলির সম্পদ জড়ো হয়েছে ঐসব দেশে। কাজেই স্বভাবতই অত সম্পদ উপচে পড়ে সমাজের অনেকটাকেই সমৃদ্ধ করেছে।

কিন্তু এ অস্বাভাবিক অবস্থা অর্থনৈতিক সুবিচার নয়। মানব জাতির জন্য সুষম বণ্টন নয়। এখানে একটা বিষয়ে মনে রাখতে হবে। এই দীন এসেছে সমস্ত পৃথিবী, সমগ্র মানব জাতির জন্য, কাজেই এর দৃষ্টিক্ষেত্র পৃথিবীময় সমভাবে e¨vপ্ত; কোনো ভৌগোলিক সীমান্তে বা জাতিতে সীমাবদ্ধ নয়। অর্থনৈতিক mlg-বণ্টনের অর্থ ইসলামের দৃষ্টিতে সমস্ত মানব জাতির মধ্যে সুষম বণ্টনে। পুঁজিবাদ সম্বন্ধে পেছনে বলে এসেছি, সম্পদ কোনো স্থানে জড়ো করা মানেই অন্য স্থানে অভাব সৃষ্টি করা। প্রাচ্যের দেশগুলিকে নিঃস্ব করেই পাশ্চাত্য দেশগুলিতে সম্পদের পাহাড় গড়ে তোলা হয়েছে। এটা অর্থনৈতিক সুবিচার নয়, এটা ঘোরতর অন্যায়।

মানুষের অর্থনীতির সঙ্গে লোকসংখ্যার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রয়েছে, যেমন রয়েছে অর্থনীতির সঙ্গে রাজনীতির সম্বন্ধ। সবগুলিই অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত এবং একটা অপরটার উপর নির্ভরশীল। এর কোনোটারই একক কোনো সমাধান সম্ভব নয়। শেষ ইসলামেও তাই; এবং যেহেতু এটা সমস্ত পৃথিবী এবং সম্পূর্ণ মানবজাতির জন্য এসেছে, তাই এর সমস্ত weavb, mg¯ সমাধানেরই পটভূমি গোটা পৃথিবী। কোনো সীমিত পরিধির মধ্যে এর প্রয়োগ সম্পূর্ণভাবে ফলদায়ক হবে না। শুধু আংশিকভাবে হবে। উদাহরণস্বরূপ যদি কোনো ভৌগোলিক রাষ্ট্রে (Nation State) এর শুধু অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রয়োগ ও প্রতিষ্ঠা করা হয় তবে ঐ রাষ্ট্রে প্রভূত অর্থনৈতিক উন্নতি হবে সম্পদের যথেষ্ট সুষম বণ্টন হবে। কিন্তু পৃথিবীর সমস্ত ভৌগোলিক সীমানা নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে mg¯ মানব জাতিকে এক মহা জাতিতে পরিণত করে দিলে যতখানি উন্নতি হবে, যত সুষম সম্পদ বণ্টন হয়ে সমস্ত বৈষম্য মিটে যাবে তেমন হবে না। এইজন্য শেষ ইসলামে সম্পদ কোথাও পুঞ্জিভূত করা যেমন নিষিদ্ধ তেমনি নিষিদ্ধ পৃথিবীর বুকের উপর কাল্পনিক দাগ টেনে টেনে এক মানব জাতিকে বহু ভৌগোলিক রাষ্ট্রে বিভক্ত করে কোথাও অতিরিক্ত জনসংখ্যার জন্য শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থার সৃষ্টি করা, আর কোথাও জনবিরল করে রাখা। mó¬vi দেয়া বিধান অস্বীকার করে আজ পৃথিবীময় দু'টোই করা হচ্ছে এবং তার

পরিণামে কোনো ভৌগোলিক রাষ্ট্র অতিরিক্ত জনসংখ্যার চাপে চরম দারিদ্র্যে নিষ্পেষিত হচ্ছে আর কোনো ভৌগোলিক রাষ্ট্রের অতি অল্প জনসংখ্যা তাদের বিপুল প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ হয়ে মহানন্দে বাস করছে। অর্থাৎ পৃথিবীর সম্পদের সুষম-বণ্টন হচ্ছে না। এই মহা-অন্যায় রোধ করার জন্য আল্লাহ যে বিধান মানুষকে দিয়েছেন সেটার অর্থনৈতিক নীতি যেমন সম্পদকে কোথাও একত্রীভূত না করে সেটাকে অবিশ্রান্তভাবে সমস্ত পৃথিবীময় ঘূর্ণায়মান রাখা (Fast circulating) তেমনি রাজনৈতিক নীতি হচ্ছে জনসংখ্যা বেড়ে যেয়ে মানুষ যেন কোথাও পুঞ্জিভূত না হয় সেজন্য ভৌগোলিক সীমান্ত wbwl× Kiv| এক বালতি পানি মাটিতে (পৃথিবীতে) ঢেলে দিলে ঐ পানি চারদিকে ছড়িয়ে যাবে এবং স্বাভাবিক নিয়মেই (ফিতরাত) যেখানে গর্ত (দারিদ্র্য) থাকবে সেটা ভরে দেবে, যেখানে উঁচু (সমৃদ্ধি) থাকবে সেখানে যাবে না এবং ঐ পানি নিজে থেকেই তার সমতল খুঁজে নেবে। ঐ বালতির পানিকে জনসংখ্যা ও সম্পদ বলে ধরে নিলেই শেষ ইসলামের অর্থনৈতিক ও জনসংখ্যার ব্যাপারে নীতি পরিষ্কার বোঝা যাবে। যতদিন মানুষ আল্লাহর দেয়া অর্থনৈতিক নীতি গ্রহণ ও প্রয়োগ না করবে ততোদিন দ্রারিদ্র্য ও প্রাচুর্যের ব্যবধান ঘুঁচবে না, Avi hZw`b gvbl ÔGK RwZÕ- এই নীতি গ্রহণ করে সমস্ত ভৌগোলিক সীমান্ত মিটিয়ে না দেবে ততোদিন পৃথিবীতে জাতিতে জাতিতে সংঘর্ষ-h× I রক্তপাত বন্ধ হয়ে শান্তি (ইসলাম) আসবে না। এই হচ্ছে কঠিন সত্য। ইসলামের শেষ সংস্করণের অর্থনীতি সম্বন্ধে আর দু'একটা কথা বলে শেষ KiwQ| cwRi wVK wecixZ A_vr e¨q Kivi Dci GB A_bwZ wfwË Kiv হলেও ব্যক্তির সম্পদ সম্পূর্ণ ব্যয় করে নিজে রিক্ত হয়ে যাওয়াও এর নীতি নয়। এই নীতির প্রণেতা আল্লাহ বলছেন- মানুষের প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ ব্যয় করে ফেল (সুরা বাকারা ২১৯)। কিন্তু আবার সতর্ক করে দিয়েছেন-"তারা (মো'মেনরা) যখন ব্যয় করে তখন অপব্যয় করে না কিন্তু কার্পণ্যও করে না। তাদের ব্যয় করা মধ্যপন্থায় (সুরা ফোরকান ৬৭।)।" আবার বলছেন-তোমাদের হাতকে কাঁধের সাথে কুঁচকে রেখো না, [এটা

Avivwe fvlvi GKUv cKvkf½x (Idiom) যা কার্পণ্য বোঝায়], আবার একেবারে প্রসারিতও করে দিওনা (সুরা বনি-BmivBj 29)|Ó A_vr নিজেদের প্রয়োজনকে বাদ দিয়ে সব দান করে নিজেরা নিঃস্ব হয়ে যেও না। শেষ ইসলামের সমস্ কিছুর মধ্যে যে ভারসাম্যের আল্লাহ বলেছেন এখানেও সেই ভারসাম্য, 'মধ্যপথ' (সুরা বাকারা ১৪৩) সেরাতুল মোস্vKxg|

ধনতান্ত্রিক পুঁজিবাদী ব্যবস্থা যে অমানবিক, এটা যে ধনীকে আরও ধনী গরীবকে আরও গরীব করে, এক_v AvR hw³-তর্ক দিয়ে প্রমাণ করার দরকার নেই। এই ব্যবস্থার নিষ্ঠুর পরিণতি দেখেই মানুষ বিকল্প ব্যবস্থা খুঁজেছিল, যদি উম্মতে মোহাম্মদী তাদের উপর আল্লাহর রসুলের অর্পিত দায়িত্ব ত্যাগ করে পরিণামে একটি বিচ্ছিন্ন ঐক্যহীন, অশিক্ষিত, ঘৃণ্য জাতিতে পরিণত না হতো তবে পুঁজিবাদের বিকল্প ব্যবস্থা মানুষকে খুঁজতে হতো না। তাদের উপর আল্লাহর দেয়া অর্থনৈতিক ব্যবস্থা উম্মতে মোহাম্মদীই প্রতিষ্ঠা করে সর্ব রকম অর্থনৈতিক অবিচার নির্মূল করে দিতো। যাই হোক, উম্মতে মোহাম্মদী তার উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হওয়ায় মানুষকে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার একটা বিকল্প ব্যবস্থা উদ্ভাবন করতে হলো এবং সেটা করা হলো এবং স্বভাবতই সেটা ঐ পুঁজিবাদের মতোই হলো মানুষ দ্বারা সৃষ্ট এবং সেটার স্রষ্টা হলেন কার্ল মার্কস। জয়জয়কার পড়ে গেল- পাওয়া গেছে, মানুষের অর্থনৈতিক সমস্যার প্রকৃত সমাধান পাওয়া গেছে। আর অর্থনৈতিক অবিচার হবে না, প্রতিটি মানুষ অর্থনৈতিকভাবে সমান হবে, কেউ পাচুর্যে বিলাসে কেউ দারিদ্রে বাস করবে না। বলা হলো এই হচ্ছে স্বর্গরাজ্য। কিন্তু হয়েছে কি? সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির নেতারা এবং সাধারণ নাগরিক শ্রমিক-কৃষক একই মানের জীবন যাপন করেন কি? একই মানের খাবার খান কি? একই রকম পোষাক পরিচ্ছদ পরেন কি? অবশ্যই নয়। এই কথায় গত মহাযুদ্ধের একটা ঘটনার কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। পুঁজিবাদী ইংল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিল মস্কো গিয়েছিলেন, কমিউনিস্ট রাশিয়ার রাষ্ট্রনেতা জোসেফ স্ট্যালিনের সাথে যুদ্ধের ব্যাপারে বুদ্ধি পরামর্শ করার জন্য।

ক্রেমলিনের বিরাট প্রাসাদে বসে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করতে করতে গভীর রাত্রে চার্চিলের ক্ষিধে পেয়ে গেল, যদিও রাত্রের প্রথম দিকে তারা যে ভোজ খেয়েছিলেন তা রাশিয়ার সাধারণ মানুষ, শ্রমিক, কৃষক জীবনেও দেখেনি। যাই হোক, ক্ষিধে চাপতে না পেরে চার্চিল বলেই ফেললেন যে কিছু না খেলে আর চলছে না। খাওয়া-দাওয়ার পাট আগেই চুকে গিয়েছিল বলে স্ট্যালিন আর কাউকে ডাকাডাকি না করে উঠে গিয়ে ফ্রিজ খুলে ভেড়ার একটি আস্ রানের রোস্ট বের করে এনে টেবিলে রাখলেন। চার্চিল তো চার্চিলই, এক হাত নেবার লোভ সামলাতে পারলেন না। রোস্ট চিবুতে চিবুতে বললেন "ইস্! কবে আমি এমন করতে পারব যে ইংল্যান্ডের প্রতিটি ঘরে ফ্রিজের মধ্যে এমনি ভেড়ার রানের রোস্ট থাকবে"। স্ট্যালিনের গালে এটা একটা মারাত্মক চড়। অর্থনৈতিক সাম্যবাদের দেশে রাশিয়ার ঘরে ঘরে ফ্রিজের মধ্যে রানের রোস্ট নেই, স্ট্যালিনের প্রাসাদের ফ্রিজে আছে। কিন্তু বলার কিছু ছিল না। স্ট্যালিনকে চুপ করে চড়টা হজম করতে হয়েছিল। স্ট্যালিন যখন চার্চিলকে রানের রোস্ট খাওয়াচ্ছিলেন ও খাচ্ছিলেন, তখন তুমুল যুদ্ধ চলছে। হিটলারের বাহিনী মস্কোর কাছাকাছি পৌঁছে গেছে। লক্ষ লক্ষ রাশিয়ান অর্ধাহারে অনাহারে থেকে প্রাণপণে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে। হাজার হাজার সৈনিক প্রচণ্ড শীতে জমে মারা পড়ছে। অনেকটা অনুরূপ অবস্থায় এই শেষ জীবন-ব্যবস্থার নেতারা কী করেছেন তার একটা তুলনা দেয়া দরকার। GB Bmjvg hLb Bmjvg Qj- অর্থাৎ বিশ্বনবীর কাছ থেকে যারা সরাসরি k¶v-গ্রহণ করেছিলেন, তাদের অন্যতম, দ্বিতীয় খলিফা ওমরের (রা.) সময় দুর্ভিক্ষ হয়েছিল। যতদিন দুর্ভিক্ষ ছিল ততোদিন দুর্ভিক্ষ পীড়িত মানুষ যেমন অর্ধাহারে অনাহারে থাকে তিনিও তেমনি থাকতেন। ওমর (রা.) প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, যতদিন না জনসাধারণ এমন অবস্থায় পৌঁছবে যে তারা ভালো করে খাবার পরও উদ্বৃত্ত থাকবে ততোদিন তিনি গোশত-gvLb GgbwK `a পর্যন্ খাবেন না এবং খানও নি। তিনি বলতেন "আমি যদি ঠিকমত খাই তবে আমি কী করে বুঝব আমার জাতি কী কষ্ট সহ্য করছে?" এই অর্ধাহারে

অনাহারে থেকে খলিফা ওমরের (রা.) মুখ রক্তশূন্য ও চুপসে গিয়েছিল। এই ঘটনা ও ওমরের (রা.) ঐ কথাগুলো ঐতিহাসিক সত্য। (ইসলামের কঠোর বিরুদ্ধবাদী, মহানবীকে (দ.) প্রতারক, ভণ্ড বলে প্রমাণ করা চেষ্টায় প্রথম সারির লেখক স্যার উইলিয়াম মুইর এর Annals of Early Caliphate Gi 232-২৩৩ পৃ. দেখুন।)

দু'টো জীবনব্যবস্থা (দীন); দু'টোরই দাবি হচ্ছে মানুষের মধ্যকার অন্যায় অবিচার, বিলুপ্ত করা। দু'টোর নেতাদের মধ্যে অতবড় তফাৎ কেন? সভ্যতার ধ্বজাধারী বর্তমানের কোনো ব্যবস্থার রাষ্ট্রের কোনো প্রধান ওমরের (রা.) ঐ উদাহরণ দেখাতে পারবেন, পেরেছেন? অবশ্যই নয়। কারণ ও দীনগুলি মানুষের সৃষ্ট, ভারসাম্যহীন-একচোখ বিশিষ্ট। ওগুলো মানুষের দেহের ও আত্মার ভারসাম্য করতে পারে নি। রাষ্ট্রের শক্তিতে একটা ব্যবস্থা মানুষের উপর চাপিয়েছে কিন্তু মানুষের আত্মা, হৃদয়কে দোলাতে পারে নি, পারবেও না, তাই ব্যর্থ। এর অকাট্য প্রমাণ হচ্ছে যেসব দেশে সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদ (Communism) প্রতিষ্ঠিত সেইসব দেশের সাধারণ নাগরিকদের আচরণ। Hসব দেশগুলির নেতৃত্বে যারা আছেন তারা ছাড়া বাকি বিরাট অংশ যার যার 'স্বর্গরাজ্য' থেকে পালাবার চেষ্টায় ব্যস্ত ছিল। দেয়াল দিয়ে, কাঁটা তারের প্রাচীর দিয়ে সীমান্ত বন্ধ করে, পুলিশ ও সামরিক বাহিনীর কড়া প্রহরা বসিয়ে, এমন কি সীমান্তে মাইন পেতে রেখেও তাদের ফেরানো যায় নি। গত ekhদ্ধের পর থেকে পর্যন্ত সাম্যবাদের পতন পর্যন্ত 'স্বর্গরাজ্য' থেকে পালাবার চেষ্টায় ঐসব দেশের হাজার হাজার লোক প্রাণ দিয়েছে, আহত হয়েছে। কেমন সে স্বর্গ-যেখান থেকে মানুষ পালাবার জন্য জীবন বাজি রাখে, মৃত্যুর ঝুঁকি নেয়!

এমামুয্যামান জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নীর লেখা থেকে

দাজ্জালের জান্নাত-জাহান্নাম এবং কমিউনিজমের স্বর্গ-biK

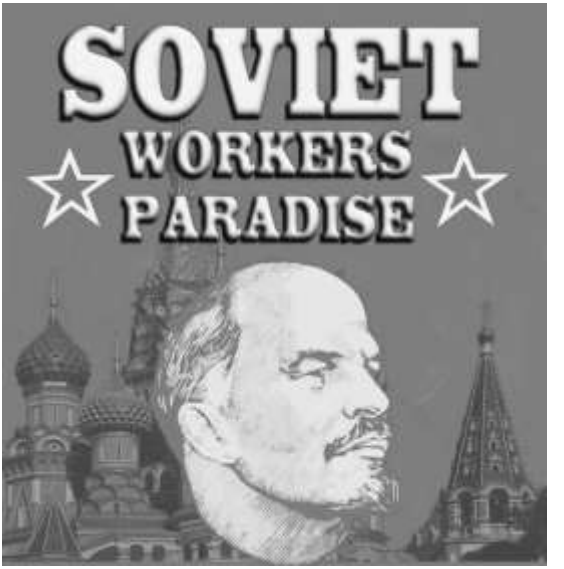

সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চীনে সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠার পর থেকে তাদের প্রচারমাধ্যমে এ কথা লক্ষ লক্ষ বার প্রচার করা হোয়েছে যে সাম্যবাদী সমাজে বসবাস করা স্বর্গ সুখে থাকার mgvb|

১৪০০ বছর ধরে মুসলিম নামধারী জাতিটির ঘরে ঘরে দাজ্জাল সম্পর্কে আলোচনা চলে আসছে। এ সময়ের মধ্যে দাজ্জাল নিয়ে বহু গবেষণা, বই-c¯ক আর ফতোয়ার ছড়াছড়ি হয়েছে। কথিত ধর্মনেতারা তাদের ক্ষুরধার মেধাকে কাজে লাগিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ওয়াজ করেছেন, মানুষকে দাজ্জালের ফেতনা সম্পর্কে অবহিত করেছেন। আজও করে চলেছেন। অথচ আশ্চর্যের বিষয় হলো-সবার অজান্তেই সেই দানব দাজ্জাল ইতোমধ্যেই পৃথিবীতে এসে

গেছে। এমনকি শৈশব, কৈশর অতিক্রম করে দাজ্জালের এখন যৌবনকাল চলছে। দোর্দণ্ড প্রতাপে সারা পৃথিবীকে সে তার পদানত করে রেখেছে; সারা পৃথিবীর মানুষকে সে বাধ্য করেছে তাকে রব (প্রভু) মানতে। কিন্তু তওহীদের ঝাণ্ডাবাহী মো'মেন ছাড়া কেউ তাকে চিনতে পারছে না, আর তাই প্রতিরোধও করছে না। কারণ আল্লাহর রসুল বলেছেন-লেখাপড়া না জানলেও কেবল মো'মেনরাই তাকে চিনতে পারবে, অন্যদিকে কাফের-মোশরেক ব্যক্তি যতই আলেম (জ্ঞানী) হোক না কেন দাজ্জালকে চিনতে পারবে না।

মানবতার মহাশত্রু, ইবলিসের চূড়ান্ত প্রকাশ এই দাজ্জালকে চিহ্নিত করেQb এ যামানার এমাম, এমামুয্যামান জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী। তিনি কোর'আন, হাদীস, বাইবেলসহ বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ, বিজ্ঞান ও ইতিহাস দ্বারা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করে দিয়েছেন যে, পাশ্চাত্যের 'বস্তুবাদী ইহুদি-wLóvb যান্ত্রিক সভ্যতা'ই রসুল বর্ণিত দানব দাজ্জাল, যেটাকে তৎকালীন মানুষেi বোঝার সুবিধার জন্য রসুলাল্লাহ রূপকভাবে বর্ণনা করেছিলেন। দাজ্জালের জন্ম হয়েছে আজ থেকে ৪৭৭ বছর আগে ইংল্যান্ডের রাজা অষ্টম হেনরির রাজত্বকালে। রাষ্ট্র পরিচালনায় খ্রিষ্টধর্মের ব্যর্থতার কারণে ১৫৩৭ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে রাষ্ট্রকে ধর্ম থেকে পৃথক করে জন্ম দেয়া হয় ধর্মনিরপেক্ষতার, যার পরিণত রূপ আজকের ইহুদি-খ্রিষ্টান বস্তুবাদী 'সভ্যতা' ev `v¾vj|

সার্বভৌমত্ব আল্লাহর হাত থেকে মানুষের হাতে তুলে নেবার পর সংবিধান, AvBb-কানুন, দণ্ডবিধি, অর্থনীতি ইত্যাদি তৈরি করে মানব জীবন পরিচালনা আরম্ভ হলো, যার নাম দেয়া হলো ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্র (Secular Democracy)। এই গণতন্ত্রের সার্বভৌমত্ব রইল মানুষের সংখ্যাগরিষ্ঠের হাতে। অর্থাৎ মানুষ তার সমষ্টিগত, জাতীয় জীবন পরিচালনার জন্য সংবিধান ও সেই সংবিধান নিঃসৃত আইন-কানুন প্রণয়ন করবে শতকরা ৫১ জন বা তার বেশি। যেহেতু মানুষকে আল্লাহ সামান্য জ্ঞানই দিয়েছেন সেহেতু সে Ggb msweavb, AvBb-Kvbb `Êwewa, A_bxwZ তৈরি করতে পারে না যা

নিখুঁত, নির্ভুল ও ত্রুটিহীন, যা মানুষের মধ্যকার সমস্ Ab¨vq, AwePvi `i করে মানুষকে প্রকৃত শান্তি (ইসলাম) দিতে পারে। কাজেই ইউরোপের মানুষের তৈরি ত্রুটিপূর্ণ ও ভুল আইন-কানুনের ফলে জীবনের প্রতিক্ষেত্রে অন্যায় ও অবিচার প্রকট হয়ে উঠলো। বিশেষ করে অর্থনৈতিক জীবনে সুদভিত্তিক ধনতান্ত্রিক অর্থনীতি চালু করায় সেখানে চরম অবিচার ও অন্যায় আরম্ভ হয়ে গেল। মুষ্টিমেয় মানুষ ধনকুবের হয়ে সীমাহীন প্রাচুর্য্য ও ভোগবিলাসের মধ্যে ডুবে গেল আর অধিকাংশ মানুষ শোষিত হয়ে দারিদ্র্যের চরম সীমায় নেমে গেল। স্বাভাবিক নিয়মেই ঐ অর্থনৈতিক অন্যায়, অবিচারের বিরুদ্ধে ইউরোপের মানুষের এক অংশ বিদ্রোহ করল ও গণতান্ত্রিক ধনতন্ত্রকে বাদ দিয়ে সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠা করল। ইউরোপের মানুষের অন্য একটা অংশ গণতান্ত্রিক পদ্ধতির অন্যান্য দিকের ব্যর্থতা দেখে সেটা বাদ দিয়ে একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করল। অর্থাৎ গণতন্ত্র থেকে একনায়কতন্ত্র, ধনতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্র, সাম্যবাদ এগুলো সবই অন্ধকারে হাতড়ানো, এক ব্যবস্থার ব্যর্থতায় অন্য নতুন আরেকটি ব্যবস্থা তৈরি করা। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে আল্লাহর সার্বভৌমত্বকে বাদ দিয়ে ধর্মনিরপেক্ষতা, প্রকৃতপক্ষে সমষ্টিগত জীবনের ধর্মহীনতা অবলম্বন করার পর থেকে যত তন্ত্র (-cracy), hZ ev`B (-ism) চালু করার চেষ্টা ইউরোপের মানুষ করেছে সবগুলোর সার্বভৌমত্ব মানুষের হাতেই ছিল। অর্থাৎ রাজতন্ত্র, গণতন্ত্র, ধনতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, সাম্যবাদ, একনায়কতন্ত্র, এসবগুলোই মানুষের সার্বভৌমত্বের বিভিন্ন ধাপ, বিভিন্ন পর্যায় (Phase, step) gvÎ| GB সবগুলো তন্ত্র বা বাদের সমষ্টিই হচ্ছে এই ইহুদী-wLóvb mf¨Zv, `v¾vj| `v¾vj সম্পর্কে জাতিকে সতর্ক করার উদ্দেশ্যে রসুলাল্লাহ ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে, দাজ্জালের সঙ্গে জান্নাত ও জাহান্নামের মত দুইটি জিনিস থাকবে। সে যেটাকে জান্নাত বলবে সেটা আসলে হবে জাহান্নাম, আর সে যেটাকে জাহান্নাম বলবে সেটা আসলে হবে জান্নাত। তোমরা যদি তার (দাজ্জালের) সময় পাও তবে দাজ্জাল যেটাকে জাহান্নাম বলবে তাতে পতিত হয়ো, সেটা

তোমাদের জন্য জান্নাত হবে। [আবু হোরায়রা (রা.) এবং আবু হোযায়ফা (রা.) থেকে বোখারী ও মুসলিম] আসুন, বর্তমান ইহুদি-খ্রিষ্টান সভ্যতার সাথে হাদিসটিকে মিলিয়ে দেখি।

eZgvb Bû`-খ্রিষ্টান সভ্যতা পৃথিবীর মানবজাতিকে বলছে-'মানুষের mমষ্টিগত জীবন যাপনের জন্য আমাদের এই ধর্মনিরপেক্ষ প্রণালীই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ। মানুষের তৈরি করা সংবিধান, সেই সংবিধানের ওপর ভিত্তি করা মানুষের তৈরি করা আইন-Kvbb, `Êwea, A_bxwZ, mgvRbxwZ, wk¶v-ব্যবস্থা ইত্যাদিই সর্বশ্রেষ্ঠ, আধুনিক। তোমরা এই ব্যবস্থা মেনে নাও, গ্রহণ করো তাহলে তোমরা স্বর্গসুখে বাস করবে, তোমাদের অর্থনৈতিক অবস্থা, শিক্ষাদীক্ষা, চিকিৎসা, জীবনযাত্রার মান এমন উন্নীত হবে, এমন ভোগ-বিলাসে বাস করতে পারবে যে তা জান্নাতের সুখের সমান। আর যদি আমাদের এই নীতি তোমরা গ্রহণ না করো, তবে তোমরা দারিদ্র্য, ক্ষুধা আর অশিক্ষার মধ্যে জাহান্নামের কষ্ট ভোগ করতে থাকবে।'

পাশ্চাত্য সভ্যতা যে মানবজাতিকে উপরোক্ত কথা বলছে তা নির্দিষ্ট ঘটনাবলী দিয়ে প্রমাণ করার দরকার করে না। পাশ্চাত্যের সমস্ প্রচার যন্ত্রগুলো এই কথা প্রকাশ্যে, অপ্রকাশ্যে, স্থুল ও সুক্ষ্মভাবে বলে যাচ্ছে যে তাদের ধর্মনিরপেক্ষ রাজনৈতিক ব্যবস্থা (যার মধ্যে গণতন্ত্র, রাজতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, একনায়কতন্ত্র ও সাম্যবাদ অন্র্ভুক্ত), তাদের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা (যার মধ্যে ধনতন্ত্র ও সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা অন্র্ভুক্ত), তাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা (যেটা সম্পূর্ণভাবে জড়বাদী, বস্তুবাদী, যেখানে আত্মার শিক্ষার কোনো স্থান নেই), তাদের সামাজিক ব্যবস্থা (যেখানে অবৈধ যৌন কর্মকাণ্ড সম্পূর্ণ স্বাভাবিক বলে গৃহীত, যেখানে সমকামিতা আইনসঙ্গত), তাদের তৈরি করা দণ্ডবিধি সবই সর্বোত্তম, প্রগতিশীল, আধুনিক। ওর চেয়ে উৎকৃষ্ট আর কিছু হতে পারে না। ওর বাইরে যত রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, শিক্ষা-ব্যবস্থা আছে সব গোঁড়া, পশ্চাৎমুখী, প্রতিক্রিয়াশীল, সেকেলে ও হাস্যকর ব্যবস্থা। আল্লাহর রসুল বলেছেন-যারা দাজ্জালের জীবন-ব্যবস্থা স্বীকার করে নেবার ফলে

দাজ্জালের জান্নাতে স্থান পাবে তারা দেখবে প্রকৃতপক্ষে তা জাহান্নাম। আর যারা দাজ্জালকে অস্বীকার করার দরুন তার জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে দেখবে তারা জান্নাতে আছে। আল্লাহর রসুলের কথা সত্য কিনা যাচাই করে দেখা hvK| **এই যাচাইয়ের সময় এ কথা মনে রাখতে হবে যে গণতন্ত্র থেকে ধাপে ধাপে ও পর্যায়ক্রমে সাম্যবাদ (Communism) পর্যন্ পৌঁছলেও প্রকৃতপক্ষে সমগ্রটা মিলিয়ে একটাই বিষয় ইহুদী-wLóvb mf¨Zv, `v¾vj এবং দাজ্জালের মৃদু থেকে উগ্রতম রূপ। অন্যভাবে বলা যায় জন্ম থেকে দাজ্জালের ক্রমে ক্রমে বড় হওয়া।**

দাজ্জালের অর্থাৎ ইহুদী-wLóান যান্ত্রিক সভ্যতাই মানুষের একমাত্র গ্রহণযোগ্য mf¨Zv, Rxeb-ব্যবস্থা এই প্রচারণায় বিশ্বাস করে যে জনসমষ্টি, জাতি বা দেশ তা গ্রহণ করেছে অর্থাৎ দাজ্জালের জান্নাতে, স্বর্গে প্রবেশ করেছে তাদের অবস্থা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় প্রতারিত হয়ে প্রবেশ করার পর অতি শীঘ্রই তারা বুঝতে পেরেছে যে তারা আসলে জাহান্নামে, নরকে প্রবেশ করেছে। কথাটা ভালো করে বোঝার জন্য দাজ্জালের উগ্রতম রূপ সাম্যবাদ (কমিউনিজমকে) বিবেচনায় নেয়া যাক।

সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চীনে সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠার পর থেকে তাদের প্রচারযন্ত্রের মাধ্যমে অর্থাৎ রেডিও, টেলিভিশনে-এ কথা লক্ষ কোটি বার বলা হয়েছে যে mvg¨evদী সমাজে, দেশে থাকা স্বর্গের সুখে থাকার সমান। যারা ঐ দেশগুলোর রেডিও মোটামুটি নিয়মিতভাবে শুনে এসেছেন তাদের এ কথা বলে দেবার দরকার নেই। এখানে লক্ষণীয় যে, তারা তাদের সমাজটাকে me`vB ¯M (Paradise) বলে বাকি পৃথিবীকে সাম্যবাদ গ্রহণ করে স্বর্গে প্রবেশের আমন্ত্রণ জানিয়েছে এবং বিশ্বনবী ঠিক ঐ জান্নাত অর্থাৎ চধৎধফরংব শব্দটাই ব্যবহার করেছেন। দাজ্জালের স্বর্গ Paradise যদি সত্যই স্বর্গ হয়ে থাকে তবে যারা সেখানে প্রবেশ করবে তারা নিশ্চয়ই আর কখনই সেখান থেকে বের হয়ে আসার চিন্াও করবে না, এ কথা তো আর মিথ্যা হতে পারে

না। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কী হয়েছে? কমিউনিস্ট ব্যবস্থা গ্রহণ ও কার্যকর করার কিছু পরই সোভিয়েত ইউনিয়ন নিজেকে বাকি পৃথিবী থেকে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন করে ফেললো।

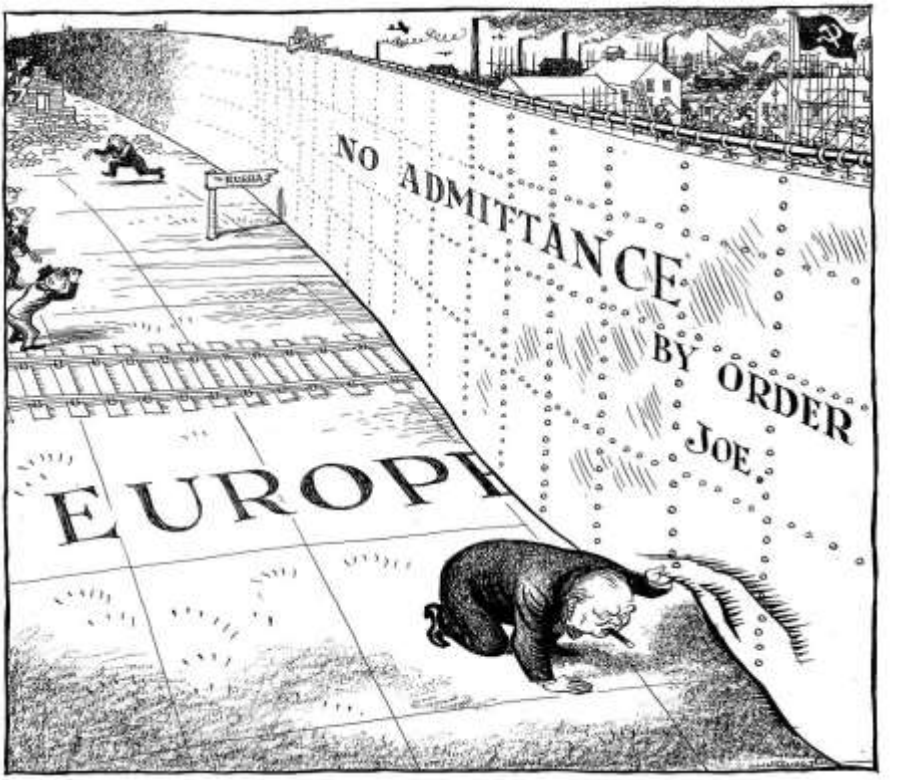

সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়নের কঠোর বিচ্ছিন্নতানীতির কারণে বাকি দুনিয়ায় এর নাম দেওয়া হয়েছিল আয়রন কার্টেইন বা লৌহ যবনিকা।

সমগ্র সোভিয়েত ইউনিয়নের ভেতরে কী হচ্ছে না হচ্ছে সে সম্বন্ধে শাসকরা যেটুকু খবর বাইরে যেতে দিত তার বেশি আর কোনো খবর বাকি পৃথিবীর কেউ পেত না। এই বিচ্ছিন্নতা অতি শিগ্‌গিরই এমন পর্যায়ে যেয়ে পৌঁছল যে বাকি দুনিয়ায় এর নাম হয়ে গেল Iron Curtain, লোহার পর্দা। এ পর্দা

Ggb `ভেদ্য হয়ে দাঁড়াল যে, বিরাট দেশটার সাধারণ সড়ক বা বিমান দুর্ঘটনার খবর পর্যন্ বাকি দুনিয়ার মানুষ জানতে পারত না। পরবর্তীতে যখন Pxb H Rxeb-ব্যবস্থা গ্রহণ করল, দাজ্জালকে রব স্বীকার করে দাজ্জালের DMZg chvq mvg¨ev`x Rxeb-ব্যবস্থা গ্রহণ করল তখন সেখানেও সেই একই ব্যাপার দাঁড়ালো, চীন বাকি দুনিয়া থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলল এবং এর নাম হয়ে গেল Bamboo Curtain, বাঁশের পর্দা।

এই দুই বিরাট দেশের শাসকরা এই বিচ্ছিন্নতার নীতি কেন গ্রহণ করলেন? একটা বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ ও প্রয়োগের ফলে কোনো দেশ জাতি বা সমাজ যদি স্বর্গে পরিণত হয় তবে তো সেই জাতির শাসকদের ঠিক উলটো করা উচিত। পর্দা দেবার বদলে তাদের জন্য অবশ্য কর্তব্য ছিল সমস্ দ্বার খুলে দেয়া; বাকি পৃথিবীকে বলা যে- দেখো! আমরা বলছি আমরা স্বর্গসুখে আছি এ কথা সত্য কিনা। তাদের কর্তব্য ছিল সোভিয়েত ইউনিয়নের জনগণকে বলা যে, আমরা পাসপোর্ট প্রথা উঠিয়ে দিচ্ছি, তোমরা এ স্র্গ ছেড়ে যদি কোথাও যেতে চাও যাও, কোনো বাধা দেব না। তাদের কর্তব্য ছিল বাকি পৃথিবীর মানুষকে ডেকে বলা-আমরা ভিসা প্রথা উঠিয়ে দিচ্ছি, তোমরা এসে দেখে যাও আমরা জান্নাতে (Paradise) আছি কিনা। পরবর্তীতে ঠিক ঐ ব্যাপার চীনেও হলো। সাম্যবাদ, কমিউনিজমের জন্মের পর থেকে এই সেদিন পর্যন্ অর্থাৎ স্নায়ুযুদ্ধের অবসান পর্যন্ কমিউনিস্ট দেশগুলো যে নিজেদের বাকি পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিল, তাদের জনগণের সাথে বাইরের পৃথিবীর জনগণের সামান্যতম সংযোগ ছিল না এ কথা কোনো তথ্যাভিজ্ঞ (Informed) মানুষই অস্বীকার করতে পারবেন না, এটা ঐতিহাসিক সত্য। ঐ দেশগুলোর বাইরের দুনিয়ার সাথে সংযোগ ছিল শুধুমাত্র ওপরের তলার শাসকদের সঙ্গে, আর কারো সঙ্গে নয়।

শুধু সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চীনের ব্যাপারেই নয়, যখনই যে দেশ দাজ্জালের উগ্রতম রূপ কমিউনিজমের আহ্বানে সাড়া দিয়ে তার স্বর্গে প্রবেশ করেছে,

তখনই সে দেশকে সোভিয়েত ও চীনের মত বাকি পৃথিবী থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলতে হয়েছে। 'স্বর্গে' প্রবেশ করেও ঐ উল্টো নীতি গ্রহণ করা ছাড়া ঐ সব দেশের শাসকদের আর কোনো নীতি গ্রহণ করা সম্ভব ছিল না। তার কারণ হলো এই যে, স্বর্গের প্রতিশ্রুতি পেয়ে সেই স্বর্গে প্রবেশ করার পর সেসব দেশের জনসাধারণ অতি শীঘ্রই বুঝতে পারল যে এ তো ¯M bq, G তো নরক। কিন্তু তখন বেশি দেরী হয়ে গেছে। তবুও তারা প্রাণপণ চেষ্টা চালাতে লাগল ঐ স্বর্গ থেকে বের হয়ে আসার জন্য। সহজ কথা নয়, কারণ ও স্বর্গ থেকে বের হবার অর্থ নিজেদের দেশ, লক্ষ স্মৃতি জড়ানো প্রিয় জন্মভূমি চিরদিনের জন্য ত্যাগ করে সম্পূর্ণ অপরিচিত দেশে, অচেনা সমাজে evm করা, যাদের ভাষা পর্যন্ত তাদের অজানা। কিন্তু অনস্বীকার্য ইতিহাস এই যে, ঐসব দেশের জনসাধারণ তাদের জন্মভূমি থেকে পালিয়ে অজানা দেশে চলে যাবার জন্য নিরবচ্ছিন্ন চেষ্টা চালিয়ে গেছে। এই চেষ্টায় তারা পরিবারের অন্যদের প্রাণও বিপন্ন করেছে, সহায়-সম্পদ বিসর্জন তো ছোট কথা। KwgDwb÷ ce বার্লিন থেকে পশ্চিম বার্লিনে লোক পালিয়ে যাওয়া বন্ধ করতে রাশিয়ানরা বিখ্যাত বা কুখ্যাত বার্লিন দেয়াল তৈরি করল। তবুও মানুষ পালানো বন্ধ করা যায় না দেখে দেয়ালের ওপর প্রতি পঞ্চাশ গজ অন্তর ¯¤ (Watch tower) তৈরি করে সেখানে মেশিনগান বসানো হলো। হুকুম দেয়া হলো কাউকে দেয়াল টপকে পালাতে দেখলেই গুলী করে হত্যা করতে। তবু লোক পালানো বন্ধ হয় না দেখে পরিখা খোড়া হলো, কাঁটাতারের বেড়া দেয়া হলো ও নানা রকম বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি বসানো হলো পলায়নকারীদের খুঁজে বের করে হত্যা বা বন্দী করার জন্য। কিন্তু কিছুতেই-'স্বর্গ' থেকে পালানো বন্ধ করা গেল না। ঐ সময়ের খবরের কাগজ যারা নিয়মিত পড়েছেন, রেডিও শুনেছেন তাদের কাছে 'স্বর্গ' থেকে পালানোর চেষ্টায় গ্রেফতার, গুলী করে হত্যা ইত্যাদি দৈনন্দিন খবর ছিল। ১৯৪৯ সন থেকে ১৯৬১ সন পর্যন্ত 27 jvL bi-নারী, শিশু কমিউনিস্ট স্বর্গ থেকে পালিয়ে

প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে পূর্ব বার্লিনের নিষ্পেষিত মানুষ দেখতে চেয়েছে পশ্চিম বার্লিনে গণতন্ত্রের দেশে কেমন শান্তি। কাছেই ওয়াচ টাওয়ার।

যেতে সমর্থ হয় এবং ঐ সংখ্যার চেয়ে বহুগুণ ঐ পালাবার চেষ্টায় নিহত হয়, বন্দী হয়। 'স্বর্গ' থেকে পালানোর চেষ্টায় বহু লোক সফল হয়েছে, বহু লোক বিফল হয়েছে, বন্দী হয়েছে, প্রাণ হারিয়েছে। শাসকরা পালানোটা প্রায় Am¤e করে তোলার পর মানুষ মরিয়া হয়ে বিকল্প পথ ধরলো। একদল বেলুনে চড়ে রাশিয়ার সীমান্ত পার হলো, অনেকে নদী ও পরিখা সাঁতরে পার হলো, অবশ্য পরিখাগুলো সাঁতরে পার হতে যেয়ে অনেকে গুলী খেয়ে মারা

পড়ল। দু'টি পরিবার এক অভিনব পন্থায় পূর্ব জার্মানি থেকে পশ্চিম জার্মানিতে পালিয়ে এসে সারা পৃথিবীতে সাড়া জাগিয়েছিল।

পূর্ব ও পশ্চিম ভাগ হয়ে পূর্ব জার্মানি সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রভাবাধীন একটি কমিউনিস্ট দেশে পরিণত হওয়ার পর রেল লাইনগুলোকে নতুন সীমান্তে দেয়াল দিয়ে বন্ধ করে দেয়া হয়েছিলে। ঐ দু'টি পরিবার অতি কৌশল ও চেষ্টায় একটি রেলওয়ে ইঞ্জিন যোগাড় করে। তারপর ঐ দুই পরিবারের নারী ও শিশুদের তাতে উঠিয়ে পুরুষরা তীব্রগতিতে ঐ ইঞ্জিনটি দিয়ে ধাক্কা দিয়ে দেয়াল ভেঙ্গে পশ্চিম জার্মানীতে চলে আসে। আরও বিভিন্ন উপায়ে বহু নারী-পুরুষ শিশু তাদের প্রিয় জন্মভূমি, দেশ, আত্মীয়-¯Rb, eÜ-বান্ধব সমস্তi মায়া ত্যাগ করে প্রাণ হাতে নিয়ে একদিন যেটাকে স্বর্গ ভেবেছিল তা থেকে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করেছে।

এটা শুধু সোভিয়েত ইউনিয়নের ব্যাপারেই নয়, যে জনসমষ্টিই ইহুদী-wLóvb যান্ত্রিক সভ্যতার উগ্রতম রূপ কমিউনিজমের স্বর্গে প্রবেশ করার আহ্বানে সাড়া দিয়ে সেটাকে গ্রহণ করেছে, তারা অচিরেই বুঝতে পেরেছে যে, তারা নরককে স্বর্গ মনে করে তাতে প্রবেশ করেছে।

চীনেও ঐ একই ব্যাপার হয়েছে। মোহভঙ্গের পর হাজার হাজার চীনা তাদের দেশ থেকে বাইরের জগতে পালিয়ে যাবার চেষ্টায় প্রাণ হারিয়েছে, বন্দী হয়েছে। মূল চীন ভূখণ্ড থেকে সমুদ্র প্রণালী সাঁতরে পার হয়ে ব্রিটিশ শাসিত nsKs-এ পালিয়ে যাবার চেষ্টায় বহু চীনা ডুবে মারা গেছে। ভিয়েতনাম যুদ্ধে আমেরিকানরা হেরে যাবার পর সম্পূর্ণ ভিয়েতনাম কমিউনিস্টদের হাতে চলে যাবার পর সে দেশ থেকে মানুষ পালানোর যে বিরাট হিড়িক পড়ে গিয়েছিল ও তা বহু বছর পর্যন্ত চলেছে সে খবর জানা নেই এমন লোক পৃথিবীতে বিরল। ছোট বড় নৌকা বোঝাই করে নারী, শিশু, বৃদ্ধসহ মানুষ সমুদ্রে ভেসেছে। তারা কোথায় পৌঁছবে, কোন্ দেশে আশ্রয় পাবে কিছুই না জেনেও তারা শুধু দাজ্জালের 'স্বর্গ' থেকে পালাবার জন্য মরিয়া হয়ে যে নৌকায় একশ' জনের স্থান হবে সে নৌকায় পাঁচ সাতশ' মানুষ ভর্তি হয়ে সমুদ্রে

ভেসেছে। হাজার হাজার নৌকা জোর বাতাসে, ঝড়ে ডুবে গেছে, হাজার হাজার নৌকা জলদস্যুরা (Pirates) আক্রমণ করে লুটে নিয়েছে, মানুষদের হত্যা করে সমুদ্রে ফেলে দিয়েছে, মেয়েদের ধর্ষণ করেছে, তাদের বিদেশে বিক্রি করে দিয়েছে। তবু 'স্বর্গ' থেকে পালিয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টা থামে নি। G mg¯ Lei nvRvi nvRvi evi mg¯ পৃথিবীর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে, বহু ছবি ওগুলোতে ছাপা হয়েছে। সেই সব লোমহর্ষক খবর পড়ে, ছবি দেখে পৃথিবীর মানুষের হৃদয় কেঁপে উঠেছে। এত সংখ্যায় এত বার এই পালানোর চেষ্টা হয়েছে যে এদের জন্য একটা আলাদা শব্দই সৃষ্টি হয়েছে- The Boat people-নৌকার মানুষ। পৃথিবীর সমস্ সংবাদপত্র, রেডিও, টেলিভিশন এখন এদের এই নামেই উল্লেখ করে। ভিয়েতনামেও এসব Lei পৌঁছেছে, কিন্তু তাতেও ঐ স্বর্গের অধিবাসীদের ফেরাতে পারে নি। তারপরও Zviv ¯x-পুরুষ, নারী ও শিশুদের দিয়ে নৌকা অতিরিক্ত বোঝাই করে প্রাণ হাতে নিয়ে অজানা সমুদ্রে নৌকা ভাসিয়েছে।

হো চি মিন, চে গুয়েভারা, ফিদেল ক্যাস্ট্রো প্রমুখ জগদ্বিখ্যাত বিপ্লবীদের সফলতার cwiYim। মার্কসীয় অর্থনীতির নিষ্পেষণের শিকার হোয়ে ভিয়েতনাম ও কিউবার নাগরিকরা এভাবেই প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে পালায়, সাগরে ডুবে মারা যায় লাখে লাখে।

দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরীয় এমন একটাও দেশ নেই যেখানে ‘স্বর্গ’ থেকে পলায়নকারী আশ্রয় প্রার্থীদের জন্য বড় বড় শিবির (Camp) খুলতে না হয়েছে। এই সেদিন হংকং-এর আশ্রয় শিবির থেকে লোকজনকে ভিয়েতনামের ‘স্বর্গে’ ফেরত পাঠাবার চেষ্টায় আশ্রয়প্রার্থীদের সাথে হংকং পুলিশের যে তুমুল সংঘর্ষ হয়ে গেল, যাতে পুলিশসহ ‘স্বর্গের’ ভূতপূর্ব বাসিন্দাদের কয়েকজন মারা গেল সে সংবাদ ও ছবি আমাদের দেশের প্রায় সব সংবাদপত্রেই ছাপা হয়েছিল (এটি নব্বই দশকের মাঝামাঝি সময়ের ঘটনা।)। ঐ একই অবস্থা প্রতিটি সমাজতন্ত্রী ও সাম্যবাদী দেশের।

কমিউনিস্ট কিউবার একটি উল্লেখযোগ্য জনসংখ্যা এখন যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডায় অস্থায়ীভাবে বাস করছে আশ্রয়প্রার্থী হিসেবে।

দাজ্জালের ঘোষিত জান্নাত যে সেটার অধিবাসীদের জন্য প্রকৃতপক্ষে জাহান্নাম Zvi সবচেয়ে বড় প্রমাণ আমার মনে হয় কোরিয়ার যুদ্ধের একটি ঘটনা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর কোরিয়া দেশটি দু'টি ভাগে ভাগ হয়ে যায়। উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়া এবং এ ভাগ আজও আছে। দু'টোই দাজ্জালের পূজারী। শুধু তফাৎ হচ্ছে এই যে দক্ষিণ কোরিয়া দাজ্জালের পূর্বতন পর্যায়ের গণতান্ত্রিক-ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার অধীনে আছে আর উত্তর কোরিয়া দাজ্জালের উগ্রতর পর্যায়ের সাম্যবাদী একনায়কতান্ত্রিক অর্থাৎ কমিউনিস্ট ব্যবস্থার অধীনে আছে।

১৯৫২ সালে এই দুই কোরিয়ার মধ্যে যুদ্ধ বেধে গেল। উত্তর কোরিয়ার সাহায্যে এগিয়ে এল কমিউনিস্ট সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চীন আর দক্ষিণ কোরিয়ার সাহায্যে এগিয়ে এল জাতিসংঘের (United Nations) অধীনে যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন, ফ্রান্স ইত্যাদি অনেকগুলো অ-কমিউনিস্ট দেশ। যুদ্ধ চলল তিন বছর। তারপর সন্ধি হলো। সন্ধির অনেকগুলো শর্তের মধ্যে একটি শর্ত হলো যুদ্ধবন্দী বিনিময়। এ বিনিময়ের শর্তের মধ্যে একটি শর্ত হলো এই যে, কোনো পক্ষই যুদ্ধবন্দীদের তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর করে ফেরত পাঠাতে পারবে না, যারা নিজেদের ইচ্ছায় তাদের দেশে ফিরে যেতে চাইবে শুধু তাদেরই ফেরত পাঠানো যাবে। যুদ্ধবন্দী বিনিময় হয়ে যাবার পর দেখা গেল যে, সোভিয়েত ইউনিয়ন, চীন ও উত্তর কোরিয়ার অর্থাৎ কমিউনিস্টদের হাতে A-কমিউনিস্টদের অর্থাৎ আমেরিকান ও অন্যান্য দেশের ১২,৭৬০ (বার n‡জার সাতশ' ষাট) জন যুদ্ধবন্দীর মধ্যে ৩৪৭ (তিনশ' সাতচল্লিশ) জন ফিরে আসতে অস্বীকার করল, অর্থাৎ তারা কমিউনিস্ট দেশেই থেকে গেল। এদের মধ্যে ২১ (একুশ) জন আমেরিকানও ছিল।

কোরিয়ার যুদ্ধে অ-কমিউনিস্টদের হাতে বন্দী অতি সামান্য সংখ্যকই কমিউনিজম অধ্যুষিত মাতৃভূমিতে ফিরে যেত সম্মত হয়|

অপরদিকে জাতিসংঘের অধীনে দেশগুলোর অর্থাৎ অ-কমিউনিস্টদের হাতে কমিউনিস্টদের ৭৫,৭৯৭ (পঁচাত্তর হাজার সাতশ' সাতানব্বই) জন যুদ্ধবন্দীদের মধ্যে থেকে নিজেদের দেশে ফিরে যেতে অস্বীকার করল ৪৮,৮১৪ (আটচল্লিশ হাজার আটশ' চৌদ্দ) জন। এত বিপুল সংখ্যক যুদ্ধবন্দী তাদের নিজ দেশে ফেরত না যাওয়ায় জাতিসংঘ এক সমস্যার সম্মুখীন হয়ে পড়েছিল। পরে এদের ফিলিপাইনে, ফরমোসা ও অন্যান্য স্থানে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করে দেয়া হয়। যাদের মনে এই সংখ্যা সম্বন্ধে সন্দেহ বা অবিশ্বাস আসবে তারা কোরিয়ান যুদ্ধের ইতিহাস, ব্রিটিশ বিশ্বজ্ঞান কোষ (Encyclopedia Britannica) দেখে নিতে পারেন বা mivmwi জাতিসংঘে চিঠি লিখে জেনে নিতে পারেন।

এই ঘটনার পর আর কোনো সন্দেহ কি থাকতে পারে যে কমিউনিস্টদের বহু ঘোষিত 'স্বর্গ' (Paradise) প্রকৃতপক্ষে সেটার অধিবাসীদের জন্য নরক? ওটা যদি নরক নাও হয়ে শুধু বাইরের দুনিয়ার অর্থাৎ অ-কমিউনিস্ট দেশ ও জাতিগুলোর অবস্থার মত হতো তবে ঐ হাজার হাজার যুদ্ধবন্দীরা সকলেই অবশ্যই তাদের নিজেদের দেশে ফিরে যেত। কারণ উভয় স্থানের অবস্থা সমান বা মোটামুটি সমান হলেও একদিকের পাল্লায় রয়েছে তাদের প্রিয় দেশ,

জন্মভূমি, বাবা-gv, fvB-বোন, স্ত্রী-ছেলেমেয়ে, বন্ধু-বান্ধব, শৈশবের স্মৃতি জড়ানো বাসস্থান। ঐ সমস্ত বিসর্জন দিয়ে যদি হাজvi nvRvi gvbl ARvbv দেশের অনিশ্চিত ভবিষ্যতের ঝুঁকির সিদ্ধান্ত নেয়, তাহলে নিশ্চিতই বলা যায় যে, ঐ লোকগুলো তাদের দেশকে জাহান্নাম বা নরক বলে বিশ্বাস করে। ফেরত না যাওয়া ঐ সংখ্যা থেকেই নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, যে ২৬,৯৮৩ (প্রায় সাতাশ হাজার) যুদ্ধবন্দী নিজেদের কমিউনিস্ট দেশে ফিরে cMj Zviv ফিরে গেছে দাজ্জালের স্বর্গের জন্য নয়, গেছে তাদের স্ত্রী, পুত্র-Kb¨v, evc-gv‡i, eÜ-বান্ধবের, আত্মার সাথে জড়ানো, মায়া মমতায় ঘেরা জন্মভূমিকে চিরদিনের জন্য ত্যাগ করতে না পেরে। ঐগুলোর মায়া ত্যাগ করতে না পেরে তারা জেনে-শুনেই নরকই বেছে নিয়েছে। সন্ধির শর্তের মধ্যে যদি এই শর্তl যোগ করা হতো যে, যেসব যুদ্ধবন্দী স্বেচ্ছায় নিজেদের দেশে ফিরে যাবে না তাদের পরিবারকেও এনে তাদের কাছে দেয়া হবে তবে এ সাতাশ হাজারের মধ্যে সাতশ' জনও ফিরে যেত কিনা সন্দেহ আছে।

এখন প্রশ্ন হলো-এ কী রকম 'স্বর্গ' যে স্বর্গের অধিবাসীরা সেখান থেকে পালানোর জন্য প্রাণ হাতে নেয়, সমুদ্র সাঁতরে পার হবার চেষ্টায় ডুবে মরে, ছোট ছোট নৌকায় সমুদ্র পাড়ি দেবার চেষ্টা করে, ইলেকট্রিক কাঁটা তারের শক্ খেয়ে মরে, 'স্বর্গরক্ষীদের' গুলী খেয়ে মরে এবং শত্রুর হাতে বন্দী হলে জন্মভূমি, স্ত্রী-পুত্রের মায়া ত্যাগ করে আবার 'স্বর্গে' ফিরে যেতে অস্বীকার করে! এখানে আরেকটি প্রশ্ন আসে। সেটা হলো-তবে কি যেসব দেশ কমিউনিজম গ্রহণ করেছে শুধু সেইসব দেশ জাহান্নামের মত, আর যে সব দেশ করে নি সেগুলো জান্নাতের মত? না, তা নয়। আমি পেছনে বলে এসেছি যে-RvZxq, ivóxq, mvgwiK, Av_-সামাজিক ইত্যাদি কোনো বিষয়েই খ্রিষ্টান ধর্মের কোনো নির্দেশনা, এমনকি বক্তব্য পর্যন্ত না থাকা সত্ত্বেও ওটাকে সামগ্রিক জীবনে প্রয়োগের চেষ্টায় অবধারিত ব্যর্থতা যখন ধর্মনিরপেক্ষতার জন্ম দিলো, স্রষ্টার সার্বভৌমত্ব মানুষের হাতে এল তখনই দাজ্জালের জন্ম হলো।

তারপর জন্মের পর যেমন কোনো প্রাণী ক্রমে বড় হয়, তার জীবনে একটার পর একটা ধাপ বা পর্ব আসে, তেমনি দাজ্জালের জীবcbl avc, ce (Phase) এসেছে। প্রথমে গণতন্ত্র ও তার অপূর্ণতা ও ত্রুটির কারণে উদয় হয়েছে একনায়কতন্ত্র (Dictatorship)। ধনতন্ত্রের কুফল ও অবিচারের ফলে এসেছে সমাজতন্ত্র ও তার উগ্রতর রূপ সাম্যবাদ, কমিউনিজম। সময়ে সময়ে ঐ বিভিন্ন পর্যায়ের, ধাপের অনুসারীদের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়েছে, যেমন wØZxq wekযুদ্ধে গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র জোট বেঁধে একনায়কতন্ত্রকে ধ্বংস করল। কিন্তু তার পরপরই গণতান্ত্রিক ধনতন্ত্রের সাথে সমাজতান্ত্রিক কমিউনিজমের স্নায়ুযুদ্ধ বা ঠাণ্ডা লড়াই (Cold war) শুরু হয়ে গেল। এই ঠাণ্ডা লড়াই কোরিয়ায়, ভিয়েতনাম ও আরও ছোট খাটো দু'চার জায়াগায় প্রকৃত যুদ্ধের (Shooting war) রূপ নিলেও ব্যাপক আকারে হয় নি শুধু একটি মাত্র কারণে। সেটা হলো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকেই গণতান্ত্রিক ধনতন্ত্রের ও সমাজতান্ত্রিক কমিউনিজমের উভয়ের হাতে পারমাণবিক অস্ত্র ছিল। উভয়েই জানত যে এ অস্ত্র ব্যবহার করলে উভয়কেই ধ্বংস হতে হবে। এই পরিস্থিতিই Deterent হিসেবে কাজ করে তখন তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাধতে দেয় নি। নিজেদের পরিণামের এই ভয়ই শুধু পৃথিবী ধ্বংসকারী অস্ত্রগুলোকে ব্যবহার করা থেকে উভয়পক্ষকে বিরত রেখেছে। যান্ত্রিক 'সভ্য' ভাষায় এরই bvg Deterent, দা'তাত। কিন্তু মনে রাখতে হবে দাজ্জালের জীবনে শৈশব, কৈশোর, যৌবনের মত পর্যায় আসলেও এবং কখনো কখনো ঐ পর্যায়গুলেvi মধ্যে সংঘর্ষ হলেও দাজ্জাল একটিই, মহাশক্তিধর আত্মাহীন দানব ইহুদী-খ্রিষ্টান বস্তুবাদী সভ্যতা, Judeo-Christian Meterialistic Civilization|

কাজেই কমিউনিস্ট উত্তর কোরিয়ার যেসব যুদ্ধবন্দী দেশে ফিরে গেল না তারা শুধু দাজ্জালের স্বর্গের উগ্রতম অবস্থা থেকে কিছু নম্রতর অবস্থায় ফিরে এল মাত্র। কোরিয়ার যুদ্ধোত্তর বন্দী বিনিময় অংকের হিসাব প্রমাণ করে দিয়েছে

মহানবীর সেই ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতা যেটায় তিনি বলছেন-দাজ্জালের সঙ্গে একটি জান্নাতের মত আরেকটি জাহান্নামের মত জিনিস থাকবে। সে মানবজাতিকে আহ্বান করে বলবে-আমাকে তোমরা রব (প্রভু) বলে মেনে নাও (আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ত্যাগ করে আমার সার্বভৌমত্ব মেনে নাও)। যারা তাকে রব বলে মেনে নেবে (ধনতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ইত্যাদি গ্রহণ করবে) সে তাদের তার জান্নাতে স্থান দেবে এবং সেটা তাদের জন্য জাহান্নাম হবে, আর যারা তাকে রব বলে স্বীকার করবে না সে তাদের তার জাহান্নামে দেবে এবং সেটাই তাদের জন্য জান্নাত হবে।

একসময় তারা চেয়েছিল কমিউনিজমের স্বর্গসুখ তারা একাই ভোগ কোরবে। তাই গড়ে তুলেছিল বার্লিন প্রাচীর। কিন্তু হায়! সেই স্বপ্ন কিছুদিনের মধ্যেই দুঃস্বপ্নে পরিণত হোল। নিজেদের গড়া সেই স্বর্গীয় প্রাচীরকে ভেঙ্গে চুরমার কোরল নিজেরাই, গ্রহণ কোরল গণতন্ত্র। কিন্তু এ ছিলো ফুটন্ Koাই থেকে জ্বলন্ Pjvq ঝাঁপ দেওয়া।

ধর্মব্যবসায়ীদের কূপমণ্ডূকতায় ব্যর্থ হল লেনিনের পরিকল্পনা

wiqv`j nvmvb

সারা দুনিয়ায় কিছুদিন আগে বাম আদর্শের জয়জয়কার ছিল, এখনও বাম আন্দোলন টিকে আছে তাত্ত্বিকভাবে, বহু মানুষের মুখে বামপন্থীদের নাম সম্মান ও শ্রদ্ধার সঙ্গে এখনো উচ্চারিত হয়। পরো রাশিয়া, পূর্ব ইউরোপ, দক্ষিণ আমেরিকা, উত্তর আমেরিকা, ভারত উপমহাদেশের বুদ্ধিজীবী মহল, wkíx, mvwnwZ¨K, ivRbxwZK, wk¶K-ছাত্রদের মধ্যে একটি বৃহৎ অংশ বাম ঘরানার। আমরা বাম আদর্শের উৎপত্তির কারণ সম্পর্কে যতটুকু জানতে পারি তা হচ্ছে, ইংল্যান্ডে যখন প্রথম রাষ্ট্রীয়জীবনে ধর্মনিরপেক্ষZvi PPv Avi¤ হলো তখন থেকেই মানুষ জাতীয় চরিত্রে চরম বৈষয়িক ও বস্তুবাদী হয়ে পড়তে আরম্ভ করল। তখন অর্থনীতি ছিল সুদভিত্তিক পুঁজিবাদ এবং শাসনতন্ত্র ছিল সামন্তবাদ। সুদী অর্থনীতির ফলে সমাজের কেউ হয়ে গেল অকল্পনীয় A_-বিত্তের মালিক আর কেউ হয়ে গেল দারিদ্র্যের নির্মম শিকার। শিল্পবিপ্লবের ছোঁয়ায় খনিজ সম্পদসহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক কাঁচামাল থেকে ব্যবহার্য সামগ্রী উৎপাদনকারী যে বিপুল সংখ্যক কারখানা সৃষ্টি হলো, প্রায় কোটি কোটি মানুষকে একরকম বাধ্য করা হলো সামান্য মজুরিতে সেই কারখানাগুলোতে শ্রমিক হিসাবে কাজ করার জন্য। সামন্তবাদী রাষ্ট্রগুলোতে GB kwgKeMmn wbæ শ্রেণির মানুষগুলোর শিক্ষা, চিকিৎসা, বাসস্থান ইত্যাদির কোনো ব্যবস্থা রইল না, তারা মানবেতর জীবনযাপন করতে বাধ্য হলো। আজকের সংশোধিত পুঁজিবাদী গণতন্ত্রে ট্রেড ইউনিয়ন, শ্রমিক সংগঠনগুলোর দাবি দাওয়া ও আন্দোলনের কারণে, শ্রমজীবী মানুষের বিক্ষোভের ভয়ে কিছু কিছু অধিকার দেওয়া হয়। কিন্তু আজ থেকে ১০০ বছর আগেও এই

গণতন্ত্রের সমাজব্যবস্থায় শ্রেণিহীন মানুষের দুর্গতির কথা পড়লে চোখের পানি ধরে রাখতে কষ্ট হয়। এই অবস্থার কারণে ইউরোপের জ্ঞানী-, Yx, বুদ্ধিজীবীরা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন যে, কী করে এই মানুষগুলোকে মুক্তি দেয়া যায়? সেই জ্ঞানী-গুণী, মুক্তচিন্তার মানুষগুলোর মধ্যে অন্যতম ছিলেন কার্ল মার্কস, লেনিন এরা। তারা চেষ্টা করলেন মানুষকে অর্থনৈতিক সঙ্কট থেকে মুক্তি দেবার জন্য। যতটুকু বোঝা যায় তাদের অভিপ্রায় ভালোই ছিল। তখন তারা চিন্তা করে দেখলেন যে, ধর্মের মধ্যে সমাধান খুঁজে লাভ নেই, সেগুলো মানুষকে বুঁদ করে ফেলে, সেগুলো মানুষের ব্যবহারিক জীবনের যাবতীয় সমস্যার সমাধান দিতে অক্ষম।

ধনতান্ত্রিক গণতন্ত্রের পাশবিক পীড়নের পর বিংশ শতকের গোড়ার দিকে মানবজাতির সামনে আশার বাতি নিয়ে হাজির হয়েছিল সমাজতন্ত্র নামক মতবাদ। পতঙ্গ যেমন অন্ধ মোহে আগুনের শিখায় ঝাঁপিয়ে পড়ে তেমনি সারা পৃথিবীর তরুণ যুবক সমাজতন্ত্রের আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়তে উদগ্রীব হয়ে উঠেছিল। মানুষের ভিতরে বিপ্লবের যে চিরন্তন আকাঙ্ক্ষা সুপ্ত থাকে সেটা জাগিয়ে তুলেছিল সমাজতান্ত্রিক পুরোধারা। কিন্তু আগুনে ঝাঁপ দিয়ে পতঙ্গের যা পরিণতি হয়, অর্থাৎ মৃত্যু; সমাজতন্ত্রের বেলাতেও সেটাই ঘোটেছে। চাকচিক্যময় মাকাল ফল সদৃশ এই মার্কসীয় মতবাদের অভ্যন্তরে যে বিষময় কদর্যতা লুকিয়ে আছে তার প্রকাশ ঘটতে ৭৫ বছরের অধিক সময় পার হয়ে গিয়েছিল। পৃথিবীর যে কয়টি স্থানেই সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল সেখানেই সৃষ্টি হয়েছিল চূড়ান্ত ভারসাম্যহীনতা, শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতি, পদদলিত হয়েছিল মানবতা। মানুষের আত্মা ত্রাহিস্বরে চিৎকার করে উঠেছিল কেবল মানুষ হিসাবে বেঁচে থাকার ইচ্ছা নিয়ে। অথচ এই সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে মার্কস লেনিন প্রমুখ তাত্ত্বিকরা আখ্যা দিয়েছিলেন 'স্বর্গরাজ্য'। সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চীনে সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠার পর থেকে তাদের প্রচারযন্ত্রের মাধ্যমে অর্থাৎ রেডিও, টেলিভিশনে-এ কথা লক্ষ কোটি বার বলা হয়েছে যে সাম্যবাদী সমাজে, দেশে থাকা স্বর্গের সুখে থাকার সমান। এখানে লক্ষণীয়

যে, তারা তাদের সমাজটাকে সর্বদাই স্বর্গ (Paradise) বলে বাকি পৃথিবীকে সাম্যবাদ গ্রহণ করে স্বর্গে প্রবেশের আমন্ত্রণ জানিয়েছে। কিন্তু পরবর্তী সময়ে উদ্ভূত কঠিন বাস্বতাই প্রমাণ করে দিয়েছে যে সমাজতন্ত্র যে স্বপ্ন দেখিয়েছে সেটা বাস্eZvi ঠিক উল্টো।

কমিউনিস্টদের এই নিদারুণ ব্যর্থতার কারণ আগেই বলেছি যে মানুষ কেবল দেহ নয়, তার আত্মাও আছে। এ বিষয়টি উপলব্ধি করেছিলেন কার্ল মার্কসের তত্ত্বের বাস্ব রূপকার ভ.ই.লেনিন কিন্তু এর কোনো সমাধান করে যেতে পারেন নি দু'টি কারণে। প্রথমত ব্রিটিশদের ষড়যন্ত্র, এবং দ্বিতীয়ত বিকৃত ইসলামের ধারক-বাহক কূপমণ্ডূক মোল্লাদের ইসলাম-পরিপন্থী ফতোয়াবাজি। সমাজতন্ত্রীরা নিজেদেরকে প্রগতিশীল, যুক্তিবাদী, মুক্তচিন্ার ধ্বজাধারী মনে করেন এবং পক্ষান্তরে ইসলামসহ সকল ধর্মমতকে একচেটিয়াভাবে অবজ্ঞা ও ঘৃণা করেন, সকল ধর্মকে স্থবির, কল্পকাহিনী, জড়তা, কূপমণ্ডূকতা বলে গালিগালাজ করেন, বিশেষ করে মুসলিমদেরকে পশ্চাৎপদ, গোঁড়া, মধ্যযুগীয়, অন্ধ বলেন। এটা বলেন কেন? এটা বলার কারণ, আপনারা মসজিদে, মাদ্রাসা, খানকার চার দেয়ালের ভেতরে দাড়িওয়ালা-Uwclqvjv, j¤v পাগড়ীওয়ালা লেবাসধারী মওলানা ও পীর সাহেবদেরকে দেখে মনে করেন এটাই বুঝি ইসলাম। কিন্তু না, এটা প্রকৃত ইসলাম নয়। টাঙ্গাইলের ঐতিহ্যবাহী পন্নী পরিবারের সন্তান, হেযবুত তওহীদের প্রতিষ্ঠাতা এ যামানার এমাম জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী এই প্রচলিত ইসলামে অসারতা প্রমাণ করেছেন এবং সঠিক ইসলামের রূপও মানবজাতির সামনে তুলে ধরেছেন। তিনি প্রমাণ করেছেন যে, প্রকৃত ইসলামের অনুসারীরা KLbI স্থবির হতে পারেন না, প্রকৃত ইসলামের চেয়ে বিস্ফোরণমুখী, গতিশীল, বৈপ্লবিক আর কিছু হতে পারে না। তারা কখনও কূপমণ্ডূক নয়, তাদের সংস্কৃতি রুদ্ধ নয়। দুনিয়াজোড়া তাদের দৃষ্টি। তারা নির্দিষ্ট কোনো পোশাকী গণ্ডিতে আবদ্ধ থাকতে পারেন না, কারণ যে জীবনব্যবস্থা এসেছে সারা পৃথিবীর সব ভৌগোলিক পরিবেশের মানুষের জন্য, সেই জীবনব্যবস্থায়

কোনো নির্দিষ্ট পোশাক থাকতে পারে না; ঠিক যে কারণে গণতন্ত্রে বা সমাজতন্ত্রের কোনো নির্দিষ্ট পোশাক নেই। তিনি চলমান বিকৃত ইসলামের উৎপত্তি ও ক্রমবিবর্তনের ইতিহাস তুলে ধরে দেখিয়ে দিয়েছেন যে, গত ১৩০০ বছরে প্রকৃত ইসলাম কিভাবে এবং কতভাবে বিকৃত হয়ে গেছে। ঔপনিবেশিক যুগে ব্রিটিশরা ষড়যন্ত্র করে তাদের সকল উপনিবেশগুলোতে মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করে একেবারে চূড়ান্ত একটা বিকৃত ইসলাম শিক্ষা দিয়ে মুসলিম জাতিকে একেবারে বিপরীত দিকে পরিচালিত করছে। এই ইসলাম যে কতটা বিকৃত তার একটি প্রমাণ লেনিনের জীবন থেকে দেওয়া hvq| ঘটনাটি আমরা উদ্ধৃত করছি মাওলানা শামস নাবীদ উসমানী রচিত Now of Never গ্রন্থ থেকে যা অনুবাদ করেছেন স.স.আলম শাহ। অনুবাদ পুস্তক 'বেদ-কুর'আন ও স্বজাতির বিভেদ'। আরও দেখুন উর্দু পত্রিকা 'সোভিয়েত ইউনিয়ন' এর ২৮তম সংখ্যা, ১৯৮২, সূত্রঃ জগদগুরু মুহাম্মদ (সা.), রেনেসাঁ cwবলিকেশন্স। পৃষ্ঠা-209-২১০। ঘটনাটি হলোঃ

রাশিয়ার কমিউনিস্ট বিপ্লবের মহানায়ক কমরেড লেনিন বিশ্বধর্মের পর্যালোচনা করার পর ইসলামে গভীরভাবে প্রভাবিত হন। তিনি রুশীয় জনগণের ইসলাম গ্রহণের আশা পোষণ করতেন। কথিত আছে যে, জনৈক বাকরা খাঁন নামক বুযুর্গের সংস্পর্শে আসার পর তিনি ইসলামের প্রতি অনুরক্ত হন। তার দ্বারা লেনিন যথেষ্ট প্রভাবিত হন। যাই হোক, লেনিন সচেষ্ট হয়েছিলেন, কিন্তু মিশরীয় উলামাদের অজ্ঞতা ও অদূরদর্শিতা এবং ব্রিটিশ প্রশাসনের ষড়যন্ত্রের ফলে এই সুযোগ হাতছাড়া হয়।

iwkqvi Rvi-তন্ত্রের পতনের পর লেনিন হন সর্বময়কর্তা। তিনি কমিউনিস্ট প্রশাসন স্থাপন করেন। একদিন তিনি নিকটতম বন্ধুবর্গের বৈঠক ডাকেন। তাতে তিনি বলেন, 'আমরা সরকার গঠনে সফল হয়েছি কিন্তু একে সুদৃঢ়, mwebv¯, শাশ্বত ও সার্বজনীন করে তোলার জন্য আমাদেরকে এমন এক জীবনব্যবস্থা দিতে হবে যা হবে মানব প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। মানুষের শুধুমাত্র অন্নবস্ত্রই যথেষ্ট নয়। আত্মার খোরাকও প্রয়োজন। ক্ষুধার্ত মানুষকে

রুটি দিয়ে শান্ত রাখা যায় একটা পর্যায় পর্যন্ত। এ পর্যায় অতিক্রান্ত হলে মানবাত্মা তৃষ্ণার্ত হয়ে উঠে। এ তৃষ্ণা নিবারণের কোনো উপকরণ-B আমাদের কাছে নেই। আছে ধর্মাচারের মাধ্যে। আমি পৃথিবীর সব ধর্ম-B গভীরভাবে অধ্যয়ন করেছি, সবখানে পেয়েছি আফিমের আবেশ। শুধুমাত্র একটি ধর্মকেই পেয়েছি প্রাণবন্ত জীবনব্যবস্থা হিসেবে। এক অনিরুদ্ধ গতিময়তা এর মধ্যে বিদ্যমান। এটাই আমাদের প্রগতিশীল জীবন ধারার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ও সহায়ক বলে আমার কাছে প্রতীয়মান হয়েছে। এখন সে ধর্মের নাম আমি শুধু বলব। এ ব্যাপারে মত প্রতিষ্ঠায় আপনারা তাড়াহুড়ো করবেন না। কেননা প্রশ্নটি কমিউনিজমের জীবন মৃত্যুর সঙ্গে জড়িত (Don't hasten to form your own conclusions because this question pertains to the life and death of Communism.) আপনারা সময় নিয়ে ভাবনা চিন্তা কোরুন। হতে পারে আমার ধারণা ভুল, কিন্তু আমাদের আত্মপ্রশান্তi Rb¨ Vগুা মাথায় চিন্তা করতে হবে। আমি মনে করি যে, ইসলামই একমাত্র ধর্ম যার অর্থনৈতিক পরিকল্পনা সমাজতন্ত্রের wbKUZg (Islam is the only religion closer to the economic programmes of Communism.)

এ কথা শুনে সমবেত লোকদের মধ্যে হইচই শুরু হয়ে যায়। তখন লেনিন তাদেরকে ঠাণ্ডা মাথায় চিন্ত করতে নির্দেশ দিয়ে বলেন- আজ থেকে পুরো এক বছর পরে পুনরায় আমরা একত্রিত হব। আর তখনই আমরা ঠিক করব কমিউনিস্টদের ধর্মাশ্রয়ী হওয়া উচিত হবে কি না, যদি গ্রহণ করতেই হয় তাহলে সে ধর্ম কোনটি?"

ব্রিটিশ সরকারের পররাষ্ট্র দপ্তর এ সংবাদ অবহিত হয়ে এটাকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পতনের অশনি সংকেত মনে করল। তারা ভাবলো, যদি উদীয়মান শক্তি কমিউনিস্ট রাশিয়া এবং বিপন্ন বিপর্যস্ত Avagiv jovK gmwjg জনগোষ্ঠী সংঘবদ্ধ হয়ে যায়, তাহলে ওপনিবেশিক ব্রিটিশদের বিদায় ঘণ্টা

বেজে উঠবে। সুতরাং ব্রিটিশ কূটনৈতিকরা তৎপর হয়ে উঠল বিশ্বব্যাপী। মুসলিম বিশ্বে ছড়িয়ে দেয়া হল এমন এক সংবেদনশীল প্রশ্ন যে কমিউনিজম হলো আল্লাহবিরোধী মতবাদ। ইসলামের জন্য আল্লাহদ্রোহী এই মার্কসীয় মতবাদ কি গ্রহণীয় হতে পারে? ব্রিটিশ সরকারের উদ্যোগে মুসলিম বিশ্বের আলেম ওলামার নিকট থেকে ফতোয়া নেয়া হল। একইভাবে এ প্রশ্নে তৎকালীন মুসলিম বিশ্বের শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞ আলেমদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হল। আলেমগণ এ সংক্রান্ম প্রশ্নের পটভূমি ও এর অর্ন্তনিহিত উদ্দেশ্য অবগত ছিলেন না। ফলে আল-আযহারের ওলামাগণ এরূপ নেতিবাচক বিধান প্রকাশ করলেন যা ব্রিটিশ প্রশাসন একান্মভাবে চাইছিল। অতঃপর যা হবার তাই হলো। ব্রিটিশ সরকার এ ফতোয়া ছাপিয়ে সারা বিশ্বে বিলি করল। এখন পর্যন্ম রাশিয়ার মুসলিম অধ্যুষিত অনেক এলাকায় মুসলিমদের অনেকের কাছে এ ফতোয়ার কপি রয়েছে। এ সংবাদ লেনিনও অবগত হলেন। এতে বিস্ময় প্রকাশ করে তিনি বলেন- ÔAvgvi aviYv wQj মুসলিমরা কৌশল ও বুদ্ধিমত্তার অধিকারী। কিন্তু বাস্তবে তারা প্রমাণ করল, অন্য আর সব ধর্মাবলম্বীদের মতো মুসলিমরাও গোঁড়া, তত্ত্বসর্বস্ব ও সংকীর্ণ।' ফলশ্রুতিতে পরিকল্পনা অপূর্ণ থেকে গেল আর লেনিন বিরোধীরা ¯^w¯ র নিঃশ্বাস ফেলল।

সেদিন লেলিনের এই প্রস্তাব আলেমরা নিতে পারেন নি। কারণ, ZLb g`xbv, কায়রো, লাহোর, দিল্লী, কলকাতা ইত্যাদি জায়গায় যে ব্রিটিশদের প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসায় ব্রিটিশ পণ্ডিতদের তৈরি করা সিলেবাস মোতাবেক যে ইসলাম শিক্ষা দেওয়া হোচ্ছিল (এবং এখনও হচ্ছে) সেটি আদৌ আল্লাহ-রসুলের ইসলাম নয়। সেই ফতোয়া দানকারী ধর্মব্যবসায়ীরা ছিল কূপমণ্ডূক মোল্লা যারা প্রকৃত ইসলামের সাথে সম্পর্কহীন। স্রষ্টার সার্বভৌমত্ব প্রত্যাখ্যান করে তারা ব্রিটিশ বেনিয়াদের তৈরি মতবাদ ও সার্বভৌমত্ব তারা মেনে নিয়েছে। আজও পৃথিবীময় ধর্মব্যবসায়ীদের পণ্যরূপী সেই অন্তঃসারশূন্য, স্থবির ইসলামকেই

আপনারা দেখছেন এবং অনর্থক আল্লাহ-রসুলের প্রতি বিদ্বেষ লালন ও fe¯vi করে যাচ্ছেন।

সেদিন মুক্তমনা মানুষ লেনিনের পুরো রাশিয়ার জনগোষ্ঠীর জাতীয় জীবনে ইসলামকে সহায়ক ব্যবস্থা হিসাবে গ্রহণকে যে ধর্মব্যবসায়ীরা নির্দ্বিধায় প্রত্যাখ্যান করেছিলেন তাদের মনোভাব ছিল অনেকটা এমন- ঐ ব্যাটা তো bvw¯ক, কাফের। ওকে ইসলাম ধর্মের বিধান ব্যবহার করতে দিলে cZv ইসলামের জাত যাবে। আজও একই ধারণা ধর্মজীবীরা পোষণ করেন। তাদের জানা দরকার আল্লাহর রসুলের সময় রসুল যখন প্রকৃত ইসলামের দিকে মানুষকে আহ্বান করেছিলেন তখন তাঁর আহ্বানে ইহুদি, খ্রিষ্টান, নাস্তিক, মূর্তিপূজক, অগ্নিপূজক সব জাতির মানুষ ইসলামের ছায়াতলে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল। এমন কি রসুলাল্লাহ খ্রিষ্টান শাসক নাজ্জাশির মৃত্যুর পর সাহাবিদেরকে বলেছিলেন যে, তোমাদের একজন ভাই মৃত্যুবরণ করেছেন। রসুলাল্লাহ নিজে তার জানাজার সালাহ কায়েম করিয়েছিলেন। কারণ নাজ্জাশি রসুলাল্লাহর আসহাবদেরকে অকপটে সহযোগিতা করেছিলেন। যদি মাননীয় এমামুয্যামানের সঙ্গে কমরেড লেনিনের সাক্ষাৎ হতো, আমাদের বিশ্বাস রাশিয়াতে কমিউনিজমের যাঁতাকলে পড়ে সাধারণ মানুষের জীবন ওষ্ঠাগত হওয়ার যে দুর্বিসহ অবস্থা সৃষ্টি হয়েছিল, সেটা হওয়া সম্ভব হতো তা। রাশিয়ার ইতিহাস হতো অন্য।

1990-তে সমাজতন্ত্রের ব্যর্থতা সুস্পষ্ট হয়ে যাওয়ায় মার্কসবাদীদের তীর্থভূমি সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙ্গে যায়, তারপরই সারা দুনিয়ায় সমাজতন্ত্র নিক্ষিপ্ত nq Av¯কুঁড়ে। সে সময়ের গোঁড়া সমাজতান্ত্রিকরা আজও দুর্বল কণ্ঠে সমাজতন্ত্রের জয়গান করেন কিন্তু বাস্বে তারা সমাজতন্ত্রের প্রবক্তা মার্কস লেলিনের আদর্শকে বিসর্জন দিয়েছেন এবং বর্তমানে তারা চরম পূঁজিবাদী গণতন্ত্রের অনুসারী। আপনারা পুঁজিপতিদের অধীনে মন্ত্রিত্ব করছেন, রাজনীতি করছেন, শ্রেণিহীন মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনের চেষ্টা বাদ দিয়ে নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তনের চেষ্টা করছেন আর সকল ধর্মের পুরোহিতরা

যেমন ধর্মকে বিক্রী করে জীবিকা নির্বাহ করেন আপনারাও মার্কস, লেনিন, এঙ্গেলসকে বিক্রী করছেন। আপনারা খামোখা মানুষদেরকে সাম্যবাদের কথা বলে প্রতারণা করে যাচ্ছেন। আপনারা জানেন যে, আপনাদের সিস্টেম ব্যর্থ ও অচল। এখন গণতন্ত্রের দিন এসেছে, তাই সেদিকেই এখন ছাতা ধরে আছেন। এই কথিত পুঁজিবাদী গণতন্ত্রের অধীনে থাকায় আপনাদের অনেকেরই ব্যক্তিগত জীবন ঋষ্টপুষ্ট হচ্ছে।

আপনারা যারা সমাজতন্ত্রে বিশ্বাস করেন আপনাদের প্রতি আমাদের শেষ কথা হলো, যদি আপনারা সত্যিই মানুষের কল্যাণ চান, তবে আপনাদের উচিত প্রকৃত ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত করা যেটা প্রচণ্ড, দুর্দান্ত MwZkxj GK জীবনব্যবস্থা। সেটা মোল্লাদের কাছে নেই, সেটা আল্লাহ দয়া করে হেযবুত তওহীদকে দান করেছেন। সেটা প্রতিষ্ঠিত হলে পৃথিবীতে থাকবে না কোনো ভৌগোলিক জাতীয়তাবাদ, থাকবে না ধর্ম-বর্ণের কোনো ভেদাভেদ, শ্রেণিবৈষম্য, পুরো মানবজাতি হবে এক জাতি। মানব সমাজে এমন অর্থনৈতিক সুবিচার প্রতিষ্ঠিত হবে যে, প্রত্যেকের নিজের মেধা ও পরিশ্রমে উপার্জিত অর্থের উপর যেমন পূর্ণ অধিকার থাকবে, অপরপক্ষে সমাজের প্রতিটি মানুষ স্বচ্ছল হয়ে যাবে, মানুষ তো দূরের কথা একটি কুকুরও বুভুক্ষ থাকবে না। ধনীর সম্পদে দরিদ্রের ন্যায্য অংশীদারত্ব থাকবে। শ্রমিকের ঘাম শুকানোর আগে তার হাতে মজুরি অর্পিত হবে। মালিক ও শ্রমিক এক টেবিলে বসে খাওয়ার অবস্থা সৃষ্টি হবে। গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠার জন্য লাইসেন্স লাগবে না, মিথ্যা না বলে যত খুশি গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠা করা যাবে। পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তের আঞ্চলিক সংস্কৃতি অপরিবর্তিত থাকবে, সঙ্গীত, নাট্য, চিত্রকলায় কোনোরূপ বাধা আরোপ করা হবে না, কেবল মাত্র যা কিছু মানুষের ক্ষতির কারণ হয় সেগুলি বর্জনীয় বলে বিবেচিত হবে। আমরা বলি না যে, আপনারা আল্লাহ বিশ্বাসী হয়ে যান, মো'মেন হয়ে যান, পরকালে বিশ্বাসী হয়ে যান। আল্লাহর প্রতি কে ঈমান আনবে কে আনবে না সেটা তারা আল্লাহর সঙ্গে বুঝবে। সুতরাং আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করানো আমাদের কাজ নয়,

আমাদের কাজ আল্লাহর শেষ রসুলের আনীত আকাশের মতো উদার, সমুদ্রের মতো বিশাল, দুর্দান্ত Mwতশীল ইসলামকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা করে মানবজাতিকে শান্তিময়, নিরাপদ, ন্যায় ও সুবিচারে পূর্ণ একটি জীবন উপহার দেওয়া। দল, মত, পথ, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, আস্তK, bw¯ক নির্বিশেষে সকল মনুষ্য সন্তানের প্রতি আমাদের একটিই প্রশ্ন, আপনি মানবজাতির সার্বিক জীবনে সুখ, শান্তি, উন্নতি, প্রগতি ও ন্যায় চান কি না। যদি চান, তাহলে GKwUB c_- সেই অপার শান্তিময় জীবনব্যবস্থার রূপরেখা আল্লাহ যামানার এমামকে দান করেছেন। আমরা তাঁর পক্ষ থেকে সেটা আপনাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করছি। তাই অন্য কারও কথায় প্রভাবিত না হয়ে জানুন Avgiv Kx ewj |

Ggvghhvgvb Rনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নীর লেখা থেকে

বিকৃত বিশ্বধর্ম এবং কার্ল মার্কস এর আফিম তত্ত্বের সত্য-wg_¨v

বর্তমানের তথাকথিত মুসলিম জাতিটি (জাতি না বলে বরং একে একটা জনসংখ্যা বলা ঠিক হয়) বহুভাবে বহুভাগে বিভক্ত। ছোট বড় সব মাযহাব, Dc-মাযহাব, ফেরকা, উপ-ফেরকা, উপ-Dc-ফেরকা একত্র করলে মোট কত ভাগ দাঁড়াবে জানি না। তবে আল্লাহর রসুল বলে গেছেন আমার উম্মাহর তেহাত্তর ফেরকায় বিভক্ত হয়ে যাবে [হাদীস আবদুল্লাহ বিন আমর (রা.) থেকে তিরমিযি, মেশকাত]। কতখানি দুঃখ নিয়ে তিনি তার আজীবনের সাধনায় গড়া জাতি ভেঙ্গে তেহাত্তর ভাগে টুকরো টুকরো হয়ে যাবার ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন তা ভাবলে বুক ভেঙ্গে যায়। সব মাযহাব ফেরকার বিবরণে না যেয়ে আমি এখানে শুধু ভারসাম্যহীন বিকত সুফিবাদ অনুশীলনকারী ভাগটি নিয়ে আলোচনা করছি।

আল্লাহর দেয়া দীন, জীবনব্যবস্থা ভারসাম্যযুক্ত। এই দুনিয়া, ঐ দুনিয়ার, দেহ আত্মার ভারসাম্য। এর যে কোনো একটাকে কম বা বেশি প্রাধান্য দিলেই ঐ মহা গুরুত্বপূর্ণ ভারসাম্য নষ্ট হয়ে সমস্ দীনটা নষ্ট হয়ে যাবে, এর প্রাণশক্তি নষ্ট হয়ে যাবে। ঐ ভারসাম্য ছাড়া পুলসেরাত কেউ পার হতে পারবে না। এই জন্যই এই দীনের নবী বলেছেন, 'এই দীনে (ইসলামে) বৈরাগ্য নেই।' বলেই সঙ্গে সঙ্গে বলেছেন, 'ইসলামের সন্ন্যাস শুধু জেহাদে আর হজ্বে (হাদিস)।' এ কথার অর্থ হলো এই দীনের মানুষ এই দুনিয়ার কাজ ত্যাগ করবে না, বরং পুরোভাবে করবে। কিন্তু এই দীনকে, এই জীবনব্যবস্থাকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করতে যে সংগ্রাম এবং সশস্ত্র সংগ্রাম, তাতে পৃথিবীর যা কিছু আছে সব কোরবান করে দেবে। এটাই তার সন্ন্যাস। এই দীনে সংগ্রামের গুরুত্ব এত বেশি, এত জরুরি যে, এর জন্য দীনের এক প্রধান নীতি অর্থাৎ বৈরাগ্যহীনতা

বিসর্জন দেয়া হয়েছে। পূর্বকালে হজ্ব করতে যাওয়া এক দীর্ঘকালব্যাপী wec`msKj KvR ছিল। বহুদূর হতে হজ্ব করতে যাওয়ায় ফিরে আসার নিশ্চয়তা ছিল না, কাজেই এও দুনিয়া ত্যাগ, সন্ন্যাস ছিল। যদিও আজকাল হজ্বে আর অনিশ্চয়তা প্রায় নেই।

রসুলাল্লাহর আগমনের আসল উদ্দেশ্য যে সারা পৃথিবীতে সর্বাত্মক সংগ্রামের মাধ্যমে আল্লাহর তওহীদভিত্তিক সত্যদীন প্রতিষ্ঠা করা - তা উম্মতে মোহাম্মদী হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করেছিলেন বলেই ঐ উম্মাহ বিশ্বনবীর ওফাতের সঙ্গে সঙ্গে তাদের পার্থিব সব কিছু কোরবান করে তাদের নেতার উপর আল্লাহর দেয়া দায়িত্ব পূর্ণ করতে তাদের দেশ থেকে বের হয়ে পড়েছিলেন। রসুলাল্লাহর ওফাতের ৬০/৭০ বছর পর্যন্ত তারা একদেহ একপ্রাণ হয়ে সংগ্রাম চালিয়ে গেল। তারা বিশ্বের সকল জাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের আসন লাভ করল। এরপর ঘটল এক মহা দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা। ঐ জাতি হঠাৎ তার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ভুলে গেল। জাতি ভুলে গেল যে কাজের জন্য তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে, গঠন করা হয়েছে, প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে সেই কাজ ছেড়ে দেওয়া আল্লাহ ও তাঁর রসুলের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকZv Kiv| কিন্তু জাতির লোকদের আকিদা অর্থাৎ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্বন্ধে ধারণা বিকৃত হয়ে যাওয়ায় জাতি ঠিক তাই করল, আল্লাহর দীন সমস্ পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠার জেহাদ অর্থাৎ সর্বাত্মক প্রচেষ্টা, সংগ্রাম ত্যাগ করল এবং ত্যাগ করে অন্যান্য রাজা বাদশাহরা যেমন রাজত্ব করে তেমনি শান শওকতের সঙ্গে তাদের মতই রাজত্ব করতে শুরু করল। লক্ষ্য ভুলে যাওয়ার ফলেই ঐ সংগ্রামের কর্মশক্তি মোড় ঘুরে অন্য কাজে ব্যাপৃত হয়ে পড়ল এবং দীনে বিভিন্ন দিক থেকে বিকৃতি অনুপ্রবেশ করতে থাকল। একদিকে শুরু হলো আলেম ও ফকিহদের দীনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ, অপরদিকে পারস্য সাম্রাজ্যের পুরাতন ধর্মগুলোর বিকৃত অধ্যাত্মবাদ অনুপ্রবেশ করল পীর ও মাজারতন্ত্র। এই মতবাদ এই Rxeb-ব্যবস্থার সমষ্টিগত দিকটা, যার মধ্যে আল্লাহর দেয়া রাজনৈতিক, আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থাগুলো রয়েছে সেগুলোকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে এর শুধু

ব্যক্তিগত ও আত্মার উন্নতির প্রক্রিয়াকে আকড়ে ধরাকেই ধর্মকর্ম সাব্যস্ করল। একদিকে পণ্ডিতরা ফকিহ, মোফাসসেররা এই দীনের আইন-কানুনকে তন্ন তন্ন বিশ্লেষণ করতে শুরু করলেন, অন্যদিকে সুফিরাও সব কিছু সম্পূর্ণ ত্যাগ করে নিজেদের আত্মার ধোয়ামোছা পরিষ্কারের কাজে মগ্ন হয়ে গেলেন। দু'দল দু'দিকে ঝুঁকে পড়লেন। ভারসাম্য আর রইল না, হারিয়ে গেল। যে কাজের জন্য বিশ্বনবী প্রেরিত হয়েছিলেন, যে কাজের জন্য তার উম্মাহ সর্বস্ব ত্যাগ করে পৃথিবীতে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, সে কাজ উপেক্ষিত হয়ে পরিত্যক্ত হলো। জাতি দু'ভাগ হয়ে দু'দিকে ঝুঁকে পড়ল, উম্মতে মোহম্মদী ঐ খানেই শেষ হয়ে গেল জাতি হিসাবে। এই যে দু'টি ভাগ হলো, দু'টি ভাগই হলো অন্~gLx (Introvert)| dwKn gdvmwmi BZ¨w`রা বই, কেতাব, কলম, কাগজ নিয়ে ঘরে ঢুকলেন, আর সুফিরা তসবীহ নিয়ে হুজরায় আর খানকায় ঢুকলেন। একদলের কাজের ফলে জাতি খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে ফেরকা মাযহাব দল উপদলে বিভক্ত হয়ে ঐক্যহীন হয়ে গেল, আরেকদলের কাজের ফলে জাতি অন্~gLx, wbRxe, c¶vNvZM¯ হয়ে স্থবির হয়ে গেল। অর্থাৎ উভয় শ্রেYxi কাজের ফলে ঐ হলো যে, একদা লৌহকঠিন ঐক্যবদ্ধ, দুর্বার, দুর্বিনীত, প্রচণ্ড গতিশীল, দুর্ধর্ষ যোদ্ধা জাতিটি ছিন্নভিন্ন হয়ে অন্যজাতির গোলামে পরিণত হলো।

ভারসাম্যহীন সুফিরা যে নির্জনতা বেছে নিলেন, যে সন্ন্যাস অবলম্বন করলেন তা ইসলামের সন্ন্যাস ছিল না, সশস্ত্র সংগ্রামের সন্ন্যাস ছিল না, ছিল নিজেদের যার যার আত্মার ধোয়া মোছার সন্ন্যাস। যে বহির্মুখী সংগ্রামের জন্য দুনিয়া ত্যাগের অনুমতি, শুধু অনুমতি নয় আদেশ আল্লাহ ও বিশ্বনবী দিয়েছিলেন, সুফিদের সন্ন্যাস হলো তার ঠিক বিপরীত অর্থাৎ অন্~gLx| ÒAb¨vb¨ mg¯ দীন অর্থাৎ জীবনব্যবস্থা, সমস্ তন্ত্র, আইন-Kvbb ewwতল করে দিয়ে এই শেষ জীবনব্যবস্থাকে সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে সমস্ পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা করতেই আমি আমার রসুলকে পাঠিয়েছি, এবং এই কথার সাক্ষী আমি স্বয়ং" (সুরা আল ফাতাহ ২৮), আল্লাহর এই দ্ব্যর্থহীন ঘোষণার পর নির্জনতার, অন্

র্মুখিতার আর বিন্দুমাত্র স্থান এই দীনে থাকতে পারে না। আল্লাহi H ঘোষণাকে ভিত্তি করে তার নবী ঘোষণা করলেন আমাকে আদেশ দেওয়া হয়েছে সশস্ত্র সংগ্রাম কেতাল চালিয়ে যেতে যে পর্যন্ bv mg¯ পৃথিবীর মানুষ আল্লাহকে একমাত্র এলাহ অর্থাৎ জীবন বিধাতা বলে স্বীকার করে নেয়, আমাকে তার প্রেরিত রসুল বলে স্বীকার করে নেয়, সালাত কায়েম করে ও যাকাত দেq [nw`m- আবদুল্লাহ বিন ওমর (রা.) থেকে বুখারী, মেশকাত]। এই যে আল্লাহ তাঁর রসুলের জন্য জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্দিষ্ট করে দিলেন সে কাজটা হলো সম্পূর্ণভাবে বহির্মুখী, একথা বুঝতে সাধারণ জ্ঞানের বেশি দরকার করে না। আল্লাহর দেয়া ঐ দায়িত্ব এক কথায় নব্যুয়তের দায়িত্ব পালন করতে গেলে সমস্ পৃথিবীতে এই দীনকে প্রতিষ্ঠা করে শান্ স্থাপন করতে গেলে অতি অবশ্যই সংগ্রাম করতে হবে। সে সংগ্রাম হতে হবে প্রচারের সংগ্রাম, রাজনৈতিক, কুটনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সর্বোপরি সশস্ত্র সংগ্রাম। যার উপর আল্লাহ ঐ বিশাল দায়িত্ব অর্পণ করলেন তার জীবনের দিকে চাইলে আমরা কি দেখি? ঠিক ZvB, mg¯ Rxebfi (be¨qZ cvevi পর অবশ্য) ঐ সংগ্রাম। রাজনৈতিক, কূটনৈতিক, অর্থনৈতিক ও প্রচারের সংগ্রাম তো ছিলই, তার উপর মাত্র দশটি বছরে আটাত্তরটি যুদ্ধ, অভিযান ইত্যাদি সংগঠন করেছেন, যার মধ্যে আটাশটিতে নিজে সেনাপতিত্ব করেছেন, আর স্বয়ং যুদ্ধ করেছেন নয়টিতে। একটি মাত্র যুদ্ধের পেছনে কতখানি সংগঠন, প্রশিক্ষণ, ব্যবস্থাপনা ও পরিকল্পনা প্রয়োজন হয় তা সামরিক বাহিনীর কাউকে জিজ্ঞাসা করে দেখতে পারেন। অর্থাৎ নিঃসংশয়ে বলা যায় যে, বিশ্বনবীর জীবনের প্রধান ভাগ ব্যয় হয়েছে সশস্ত্র সংগ্রামে। ভাবলে স্ত¤Z হয়ে যেতে হয় যে, ঐ সশস্ত্র সংগ্রামের পরও একটা মানুষ কি করে অন্যান্য কাজ করেছেন, আর সেই অন্যান্য কাজও কী বিরাট বিপুল কাজ। পাশ্চাত্যের চিন্াবিদদের মধ্যে যাদের অন্রের কিছুটা প্রসারতা আছে, সত্যের প্রতি কিছুটা শ্রদ্ধা আছে তাদের মধ্যে অনেকেই তার জীবনী পড়ে মানব জীবনের উপর তার প্রভাব দেখে বিস্ময়ে অবাক হয়ে গেছেন। এমনি অবাক বিস্ময়ে

diwm BwZnvmবেত্তা লা মার্টিন লিখেছেন- Ò`vkwbK, evM¥x, bex, AvBb প্রণেতা, যোদ্ধা, ধারণাকে জয় ও প্রতিষ্ঠাকারী, বিচারবুদ্ধিসহ বিশ্বাসকে পুনর্জীবনদানকারী, মূর্তিহীন ধর্মের পুনঃপ্রবর্তক, বিশটি জাগতিক সাম্রাজ্যের ও একটি আধ্যাত্মিক সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা-এই হচ্ছেন মোহাম্মদ (দ.)। gvbexq gnË I weiটত্ব মাপার যতগুলো মাপকাঠি আছে সেসবগুলো দিয়ে মাপলে আমরা প্রশ্ন করতে পারি- তার চেয়ে বড়, মহীয়ান আর কোনো মানুষ আছে?" (History of Turks) আমেরিকান জ্যোতির্বেত্তা, ইতিহাসবেত্তা ও গণিতশাস্ত্রবিদ মাইকেল হার্ট তার 'The 100' বইয়ে আদম (আ.) থেকে বর্তমান পর্যন্ GKkô Rb gvbষের তালিকা করেছেন যারা মানব জাতির উপর সবচেয়ে বেশি প্রভাব বিস্তার করেছেন। তাতে সর্বপ্রথম নাম মোহাম্মদ (দ.)। ভূমিকায় তিনি লিখেছেন, মোহাম্মদকে (দ.) এক নম্বর করায় অনেকেই পছন্দ করবেন না, কিন্তু সত্যের খাতিরে আমাকে তা করতে হয়েছে।

বিশ্বনবীর জীবনের এই যে প্রচণ্ড বহির্মুখী গতি, এই গতি অনিবার্যভাবে সঞ্চারিত হলো তার অনুসারীদের মধ্যে, তার গড়া জাতিটির মধ্যে, কারণ তার উপর আল্লাহর দায়িত্ব, যা এক জীবনে পূর্ণ করা সম্ভব নয়, অর্পিত হলো তার উম্মাহর উপর স্বভাবতঃই। মহানবী তার সাহাবাদের যে আকিদা শিক্ষা দিয়ে গিয়েছিলেন, সে আকিদার প্রভাবে তারা পৃথিবীতে এক মহাশক্তিশালী বোমের মত বিস্ফোরিত হয়ে অর্ধেক পৃথিবীতে শেষনবীর দীন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তখন যারা এই জাতিকে বাধা দিতে এসে ভেঙ্গে খান খান হয়ে গিয়েছিল তারা যদি কোনোভাবে এই জাতির ঐ বহির্মুখী সংঘর্ষমুখী, বিস্ফোরণমুখী চরিত্রকে বদলিয়ে অন্তর্মুখী করে দিতে পারত তবে কি হতো? নিঃসন্দেহে বলা যায়, তা হলে এই উম্মাহ সংগ্রাম ছেড়ে দিয়ে আরবে তাদের যার যার ঘরে ফিরে যেত, হাতের তলোয়ার ছুড়ে ফেলে দিয়ে তসবিহ নিয়ে খানকায় ঢুকতো, শত্রুরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে তাদের পূর্বের অন্যায়, অত্যাচারী জীবনব্যবস্থায় স্থায়ী থাকত। শত্রুরা যা বাইরে থেকে করতে পারে নি, অর্ধেক পৃথিবীতে দীন প্রতিষ্ঠার পর ভেতর থেকে ভারসাম্যহীন সুফিরা তাই করলেন।

অবশ্য শুধু সুফিরা নয়, আলেম, ফকিহ, মুফাস্‌সির ইত্যাদি বহু নামের পণ্ডিতরাও তাদের সাহায্য করেছেন। সকলের সম্মিলিত কাজের ফল এই হলো যে, জাতিরই আকিদা নষ্ট হয়ে গেল, সম্মুখ থেকে বিশ্বনবীর দেখানো উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অদৃশ্য হয়ে গেল, জাতিটাকে, উম্মাহটাকে হত্যা করা হলো। যে বহির্মুখী কাজের জন্য এই জাতিটাকে আল্লাহ ও তার রসুল সৃষ্টি করেছিলেন, অন্তর্মুখী করে দেওয়ায় সে উল্টো দিকে চলতে শুরু করল। এই উল্টো দিকে চলতে শুরু করায় এই জাতির আর কোনো প্রয়োজন রইল না। কারণ ঐ অন্gwLZv, H AvZ¥vi NIvgাজা করে আধ্যাত্মিক উন্নতির প্রক্রিয়া পূর্ববর্তী ধর্মগুলোতেও ছিল। ওয়ায়েস করনী (রা.) তার প্রমাণ। কোনো সন্দেহ নেই যে, ওয়ায়েস করনী (রা.) তাসাওয়াফের উচ্চতম স্থানে পৌঁছুতে সক্ষম হয়েছিলেন, কামেলিয়াত হাসেল করেছিলেন। এতে দু'টো বিষয় প্রমাণিত হয়। একটি হলো এই যে- wekbexi Dci hLb beq¨Z Avjvn অর্পণ করেন তখনও পূর্ববর্তী দীনগুলোর মধ্যে যে তাসাওয়াফের প্রক্রিয়া ছিল তা যথেষ্ট ছিল। দ্বিতীয়টি হলো এই যে- সুতরাং তাসাওয়াফের প্রক্রিয়ায় আধ্যাত্মিক উন্নতিই যদি দীনের মুখ্য, মুখ্য না হলেও প্রধান উদ্দেশ্য হতো তবে মোহাম্মদের (দ.) আর প্রয়োজন ছিল না। কেননা ঐ সময় ইহুw`, wLóvb এমন কি দীনে হানিফের মধ্যেও যথেষ্ট পরিমাণে আহবার, রোহবান অর্থাৎ সুফি সাধক সন্ন্যাসী ছিলেন। সুতরাং একদল সুফি দরবেশ তৈরি করা শেষ নবীর আগমনের উদ্দেশ্য হতে পারে না। এজন্য রসুলের পুরো জীবনে একটি বারও তিনি মসজিদে নববীতে গোল হয়ে বসে আসহাবদের নিয়ে 'আল্লাহু Avল্লাহু' বলে যেকর করেছেন এমন নজির কেউ দেখাতে পারবে না। বরং নবুয়্যত পাবার মুহূর্ত থেকে ওফাত পর্যন্ত পৃথিবীর ব্যস্Zg G gvbIwUi Rxeb কেটেছে মানুষের মধ্যে, জনকোলাহলে নিরবিচ্ছিন্ন সংগ্রামে, সশস্ত্র সংগ্রামে- এ ইতিহাস অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই।

দীনের আলেমরা, পণ্ডিতরা এই দীনের ছোটখাটো কম প্রয়োজনীয় আদেশ-নিষেধগুলো নিয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণ করে বিভিন্ন মতামত, ফতোয়া সৃষ্টি করে

উম্মাহকে বহুভাগে বিভক্ত করে এর ঐক্য ধ্বংস করে দিয়েছিলেন। কোনো জাতি যত শক্তিশালীই হোক যদি তার মধ্যে ঐক্য না থাকে তবে কখনও টিকতে পারবে না, কখনও শত্রুর বিরুদ্ধে জয়ী হতে পারবে bv, AvZ¥i ¶vl করতে পারবে না, এটা প্রাকৃতিক নিয়ম, ফিতরাত। প্রাকৃতিক নিয়ম হলোএই যে, ঐক্য অনৈক্যের উপর বিজয় লাভ করবে, সু-শৃঙ্খল বিশৃঙ্খলের উপর বিজয় লাভ করবে, সাহসী ভীরুর উপর বিজয় লাভ করবে। তাই ঐ প্রাকৃতিক আইন মোতাবেকই এই উম্মাহ শত্রুর কাছে পরাজিত হয়ে কয়েক শতাব্দীর Rbv ঘৃণ্য গোলামে পরিণত হয়েছিল। কিন্তু যদি ঐ আলেম, ফকিহ, পণ্ডিতরা এই উম্মাহকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন নাও করে দিতেন, তা হলেও ভারসাম্যহীন বিকৃতি সুফিদের কাজের ফলে জাতির অন্তর্মুখিতার ফলে জাতি ধ্বংস হয়ে যেত, যেমন গেছে। চিন্তাহীন লোক প্রশ্ন করতে পারেন- জাতি ধ্বংস হয়েছে কোথায়? জাতিতো বেঁচে আছে, একশ' ষাট কোটির সংখ্যায় বেঁচে আছে। কোটি কোটি লোক নামায পড়ে, রোযা রাখে, যাকাত দেয়, হজ্ব করে, তাহাজ্জুদ পড়ে। পঞ্চাশটির অধিক ভৌগোলিক রাষ্ট্রে এরা সংখ্যাগরিষ্ঠ, তেলসহ পৃথিবীর প্রাকৃতিক সম্পদের একটা প্রধান অংশের এরা মালিক। পৃথিবীময় এই জাতির লক্ষ লক্ষ আলীশান মসজিদ আছে, যেখানে কোটি কোটি লোক নামায পড়ে। এই জাতিকে ধ্বংস হয়ে যাওয়া জাতি কেন বলছি! বলছি তার কারণ আছে। প্রত্যেক জিনিসের অস্তিত্বের কারণ থাকে, সেটা হলো সেই জিনিসটার উদ্দেশ্য। প্রত্যেক কাজের উদ্দেশ্য থাকে। উদ্দেশ্যহীন জিনিসের, উদ্দেশ্যহীন কাজের কোনো অর্থ নেই, হতে পারে না। স্থূল D`vniY- আপনার একটি মোটর গাড়ি আছে। এই গাড়ির উদ্দেশ্য হলো আপনাকে বহন করে আপনার অভীষ্ট স্থানে নিয়ে যাওয়া। এই গাড়ির যন্ত্রপাতিতে যদি এমন গণ্ডগোল হয় যে, সেটা অচল হয়ে যায়, তবে ঐ গাড়ির আর কোনো অর্থ থাকে না। ঐ গাড়িটি যদি মহামূল্যবান গাড়িও হয়, পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ গাড়িও হয়, তবু ওটা কোনো কাজের নয়, কারণ যে একমাত্র কারণে ঐ গাড়িটি তৈরি করা হয়েছে, আপনাকে আপনার প্রয়োজনীয় স্থানে নিয়ে

যাওয়া, সেই কাজটাই ঐ গাড়ি দিয়ে হচ্ছে না। সুতরাং ওটা অর্থহীন, মহা দামী গাড়ি হলেও মূল্যহীন। আপনি যদি এত আহম্মক হন যে, গাড়ির উদ্দেশ্যই জানেন না, বুঝেন না, তবে আপনি কি করবেন? আপনি এই করবেন যে, গাড়ির নির্মাতারা গাড়ির সঙ্গে গাড়ির রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যে বই দেয় সেই বই দেখে অতি অধ্যবসায়ের সঙ্গে গাড়ির গায়ে পালিশ লাগিয়ে ওটাকে চকচকে করবেন, গদিগুলোয় ক্রিম লাগিয়ে নরম আরামদায়ক করে রাখবেন। বই মোতাবেক নির্দিষ্ট স্থানগুলোতে (Point) তেল ও চর্বি (Grease) লাগাবেন। গাড়িটি দেখতে চকচকে, সুন্দর দেখাবে কিন্তু আসলে অচল, কাজেই অর্থহীন। গাড়িটার আসল উদ্দেশ্যই আপনি জানেন না বলে আপনি মহা সুখী থাকবেন যে গাড়িটা দেখতে ভারী সুন্দর।

ভবিষ্যতে তাঁর উম্মাহর কী অবস্থা হবে বলতে যেয়ে একদিন আল্লাহর রসুল বললেন- এমন সময় আসবে যে, এই জাতি পৃথিবীর সব জাতিদের দ্বারা অপমানিত, লাঞ্ছিত, পরাজিত হবে। উপস্থিত সাহাবাদের মধ্য থেকে কেউ কেউ প্রশ্ন করলেন- হে আল্লাহর রসুল! তখন কি পৃথিবীতে তারা এত অল্প সংখ্যাক হবে যে, অন্য জাতিগুলো তাদের পরাজিত ও লাঞ্ছিত করবে? মহানবী তার জবাব দিলেন- bv, msL¨v তারা অসংখ্য হবে। জবাব শুনে আসহাব নিশ্চয়ই অত্যন্ত বিস্মিত হয়েছিলেন। বিস্মিত হবার কথাই। কারণ তখন ঐ ছোট্ট উম্মাহটার ঈমান ইস্পাতের মত, আকিদা সম্পূর্ণ ও সঠিক, উদ্দেশ্য পরিষ্কার, উদ্দেশ্য অর্জন করার প্রক্রিয়ায় দৃঢ়, ঐক্য লোহার মত, `ejZv ïa GB RvqMvq- সংখ্যাল্পতায়। তাই এর জবাবে তারা hLb শুনলেন যে, সেই একমাত্র দুর্বলতাই থাকবে না, সংখ্যায় ঐ উম্মাহ হবে অগণিত, তখন পরাজয় কী করে সম্ভব? বিশেষ করে যখন ঐ ছোট্ট উম্মাহ তাদের চেয়ে সংখ্যায় বহু বেশি, সুসজ্জিত, সুশিক্ষিত শত্রুদের বারবার পরাজিত করেছেন। তারা আবার মহানবীকে প্রশ্ন করলেন- Avgiv msL¨vq অসংখ্য হলে পরাজিত কি করে সম্ভব? রসুল জবাব দিলেন, একটা উপমা দিয়ে, বললেন- মনে করো লক্ষ লক্ষ উট, কিন্তু উটগুলো এমন যে যেটার

উপরই চড়ে বোসতে যাও ওটাই বসে পড়ে বা পড়ে যায়। ঐ অসংখ্যের মধ্যে এখানে ওখানে কিছু উট পাওয়া যাবে যেগুলোর পিঠে চড়া যাবে। বিশ্বনবীর উপমাটা লক্ষ্য করুন- উট। উটের উদ্দেশ্য কি? উট দিয়ে কি কাজ হয়? উট হচ্ছে বাহন, মানুষকে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে নিয়ে যাওয়ার জন্য। সেইটাই যদি উট দিয়ে না হয় তবে ঐ উট অর্থহীন- দেখতে অতি সুন্দর উট হলেও এবং সংখ্যায় অসংখ্য হলেও। শেষনবীর সেই ভবিষ্যদ্বাণী বহু আগেই পূর্ণ হয়েছে, সংখ্যায় অসংখ্য হওয়া সত্ত্বেও শত্রুর পদানত দাস হয়েছে, অপমানিত ও লাঞ্ছিত হয়েছে এবং হচ্ছে। মহানবীর বর্ণনা অনুযায়ী এরা দেখতে অতি সুন্দর উট, লম্বা কোর্তা, পাগড়ি, লম্বা দাড়ি, ছেটে ফেলা মোচ, টাখনুর ওপরে ওঠা পাজামা, কাঁধে চেক রুমাল, দিনে পাঁচবার মসজিদে দৌড়াচ্ছেন, গোল হয়ে বসে চারিদিক প্রকম্পিত করে আল্লাহর যিকর করছেন, LvbKvq বসে মোরাকাবা, কাশফ করছেন- দেখতে একেবারে নিখুঁত উট। কিন্ আসলে উট নয়, ওদের পিঠে চড়া যায় না, চড়লেই বসে পড়ে।

KviY wK? KviY dZIqvevRiv Ges fvimvg¨nxb mwdiv RwZi ewngLx আকিদাকে উলটিয়ে অন্র্মুখী করে দিয়েছেন, দুর্বার সংগ্রামের জন্য যে জাতিটিকে আল্লাহ আর তার রসুল সৃষ্টি করেছিলেন সেটার অন্রাত্মাকে ফতওয়াবাজরা এবং সুফিরা নির্জনবাসী, উদাসী, বৈরাগীতে পরিণত করে দিয়েছেন, কাপুরুষে পরিণত করেছেন। যে উদ্দেশ্যে এ জাতি সৃষ্টি করা হয়েছিল তাই-ই নাই, কাজেই এই জাতিও এখন অর্থহীন। প্রমাণ চান? kivn-শরিয়তের অত্যন্ পাবন্দ, পাঁচ ওয়াক্ত মসজিদে যেq bvgvhx, j¤v দাড়ি, মোছ মোড়ানো, টুপি-পাগড়ী মাথায়, হাতে সর্বদা তসবিহ অর্থাৎ মুত্তাকী একজনকে যেয়ে বলুন যে- দেশে মানুষের অপরাধ বেড়ে যাচ্ছে, ইসলাম বিরোধীরা এই দীনের বিরুদ্ধে সোচ্চার ও সক্রিয় হয়ে উঠেছে, শুধু তাই নয়, তারা এমন কি কাগজে পত্রে আল্লাহ, রসুল ও দীনের বিরুদ্ধে বিদ্রূপ করে অপমান করে লিখে, প্রকাশ করছে, চলুন আমরা একতাবদ্ধ হয়ে এর বিরুদ্ধে দাঁড়াই, এগুলোকে প্রতিহত করি। আপনার এ ডাক শুনে খুব সম্ভব ঐ অতি

মুসলিম মোত্তাকী পরহেজগার আপনার মুখের দিকে কয়েক সেকেণ্ড চেয়ে থেকে মুখ ঘুরিয়ে চলে যাবেন। অন্ত শতকরা পঁচানব্বই জনই যাবেন। Avcwb wK করছিলেন জানেন? আপনি রসুলাল্লাহ বর্ণিত ঐ অসংখ্য উটের একটায় চড়তে গিয়েছিলেন। ঐ উটগুলোর নামায, রোযা, তসবিহ, ডান পা দিয়ে মসজিদে ঢোকা কিছুই গৃহীত হবে না, সমস্ Av¯াকুড়ে নিক্ষিপ্ত হবে। এরা এবং যারা মানুষের অর্থাৎ গায়রুল্লাহর তৈরি আইন-Kvbb, `Êwewa A_vr জীবনব্যবস্থায় বাস করেও তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে না তাদের সম্বন্ধে বিশ্বনবী বলেছেন তাদের রোযা হচ্ছে না খেয়ে থাকা আর তাহাজ্জুদ হচ্ছে ঘুম bó Kiv|

কার্ল মার্কস ধর্মকে আফিম বলেছেন। তাকে একদিক দিয়ে দোষ দেই না। তিনি 'ধর্ম' বলতে যা দেখেছিলেন তা অবশ্যই আফিম। তিনি দেখেছিলেন তার নিজের দেশে খ্রিষ্টান ধর্ম যেটা মানুষের জাতীয় জীবনের ব্যর্থতার কারণে ব্যক্তি জীবনে নির্বাসনের পর ওটা যাজক ও সমাজের একটি বিশেষ শ্রেণির হাতে শোষণের হাতিয়ার হয়ে দাঁড়িয়েছিল। হিন্দু-বৌদ্ধ ইত্যাদি "ধর্ম"কে দেখেছিলেন- ঐ একই অবস্থা প্রায়। তাদের মধ্যে যারা ধার্মিক তারা সংসার ত্যাগ করে হয় বনবাসে গেছেন, না হয় মন্দিরে, মঠে, প্যাগোডায় ঢুকেছেন- সমাজকে ছেড়ে গেছেন শোষক অত্যাচারীদের হাতে। ব্যতিক্রম তিনি দেখতে পেতেন এই শেষ 'ধর্মে'র দিকে চাইলে। কিন্তু তা পারলেন না, কারণ মার্কস যখন চিন্তা করছেন অর্থাৎ গত উনিশ শতাব্দী (খ্রিষ্টীয়) ততদিনে সামান্য কিছু লোকের মধ্যে ছাড়া, মোহাম্মদের (দ.) প্রবর্তিত 'ধর্ম' পৃথিবীতে নেই। মার্কস দেখলেন অন্যান্য আর দশটা 'ধর্মে'র মতই আরেকটি সেই অন্gLx Ôag© hvi অনুসারীরা ইউরোপীয়ানদের জুতার তলায় গড়াগড়ি দিচ্ছে, 'ধর্মে'র বিধান নিয়ে নিজেদের মধ্যে দলাদলি করছে, হাতে তসবিহ নিয়ে মসজিদে দৌড়াচ্ছে, খানকায় বসে পীর-gwরদী করছে- সমাজের হর্তাকর্তারা শোষক, অন্যায়কারী। কাজেই মার্কস পৃথিবীর দিকে চেয়ে যে 'ধর্ম'গুলো তখন দেখলেন সেগুলোকে তিনি যে আফিম আখ্যা দিয়েছিলেন সে জন্য তাকে

কিছুমাত্র দোষ দেই না, তিনি একেবারে সত্য কথা বলেছিলেন। মার্কসের প্রতি আমার অভিযোগ এই যে, তিনি শেষ ইসলামটাকে Avi Zvi ইতিহাসটাকে ভালো করে পড়ে দেখলেন না, পড়লে মার্কস যদি অকপট হৃদয়ে মানব সমাজের শুধু অর্থনৈতিক নয় সব রকমের শোষণ, অন্যায়, অত্যাচার নির্মূল করতে চেয়ে থাকতেন তবে তাকে সমাজতন্ত্র আবিষ্কার করতে হতো না। সমাজতন্ত্র আবিষ্কার করে তিনি তো মানব জীবনের একটি মাত্র অঙ্গনে (Facet), অর্থনৈতিক অঙ্গনের, সমাধান বের করলেন। কিন্তু মানুষের জীবন কী শুধু অর্থনৈতিক সমস্যাতেই পূর্ণ? নিশ্চয় নয়, অনেক কিছুই নিয়ে মানুষ। মার্কসের সমাধান হলো মানুষের জীবনের শুধু একটি অঙ্গনের ভারসাম্যহীন সমাধান। এ সমাধান পূর্ণ সমাধান নয়, তাই ইতিমধ্যেই কার্যত সমাজতন্ত্রের কবর হয়ে গেছে, যতটকু টিকে আছে সেটা পুরাতন নেতাদের নামের উপর ভর করে, জেনারেশন গ্যাপ হলে স্বাভাবিক নিয়মে সেটাও তিরোহিত হয়ে যাবে। ১৯৯০-তে সমাজতন্ত্রের ব্যর্থতা সুস্পষ্ট হয়ে যাওয়ায় মার্কসবাদীদের তীর্থভূমি সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙ্গে যায়, তারপরই সারা দুনিয়ায় সমাজতন্ত্র নিক্ষিপ্ত হয় আঁস্াকুঁড়ে। সে সময়ের গোঁড়া সমাজতান্ত্রিকরা আজও দুর্বল কণ্ঠে সমাজতন্ত্রের জয়গান করেন কিন্তু বাস্বে তারা সমাজতন্ত্রের প্রবক্তা মার্কস লেলিনের আদর্শকে বিসর্জন দিয়েছেন এবং বর্তমানে তারা চরম পুঁজিবাদী গণতন্ত্রের অনুসারী। মার্কস শেষ জীবনব্যবস্থাটাকে খোলা মন নিয়ে পর্যবেক্ষণ করলে দেখতে পেতেন যে, মানুষের জীবনের প্রতি অঙ্গনের সমস্যার সমাধান এতে দেয়া আছে, শুধু অথনৈতিক নয়। আর সেটা মানুষের সীমিত মগজের সমাধান নয়। যিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, শুধু মানুষকে নয় এই বিশাল বিশ্বজগৎকে সৃষ্টি করেছেন, তাঁর দেয়া সমাধান। সমাধান দিয়ে তিনি বলছেন- যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন তোমরা কি তার চেয়ে বেশি জানো? তারপর নিজেই এ প্রশ্নের জবাব দিচ্ছেন- ‖Z‖b mg¯ কিছুই জানেন (সুরা মুলক ১৪, সুরা আল হজ্ব ৬৩)। মার্কসের কাছে এ যুক্তির খণ্ডন আছে? মার্কস যদি এই জাতির ইতিহাস

পড়তেন তবে দেখতেন বিশ্বনবী যে জীবনব্যবস্থা শিক্ষা দিয়ে গেছেন তা পরমাণু বোমের মত ফেটে অর্ধেক পৃথিবীকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। আফিম অমন করে ফাটেনা, আফিম নিঃশব্দে বুঁদ করে দেয়, যেমন করে ফতোয়ার বিশ্লেষণ আর বিকৃত তাসাওয়াফের আফিম বিশ্বনবীর তৈরি এই মহাশক্তিশালী বোমাটিকে বুঁদ করে নিষ্ক্রিয় করে দিয়েছে, আর তাই মার্কস অন্যান্য 'ধর্মে'র সাথে সাথে একেও আফিম বলতে পারছেন, আর দুর্ভাগ্যক্রমে আমরা প্রতিবাদও করতে পারছি না।

এই ভারসাম্যহীন সুফিবাদের প্রভাবে এই জাতির আকিদা, দৃষ্টিভঙ্গী (Concept) এমনভাবে আজ বিকৃত যে, গহ্বরে ঢুকে প্রাণপণে তসবিহ জঁপা আর খুঁটিনাটি নিয়ম পালন করাকেই আজ সম্পূর্ণ 'ধর্মকর্ম' করা মনে হচ্ছে। এ দীনের প্রকৃত উদ্দেশ্য অর্থাৎ আলাহকে ইবলিসের দেয়া অশান্তি সৃষ্টির চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে তাঁর দীনকে পৃথিবীতে চালু করে শান্তি cwZôv, Zv আজ এই মহা দীনদারদের মন-মগজ থেকে বহু দূরে। তাবুকের অভিযানে, যেখানে কোনো যুদ্ধই হলো না, প্রচণ্ড গরমের ভয়ে কয়েকজন আসহাব যোগ দেন নি বলে তাদের শাস্তি দেয়া হলো, তাদের কয়েক মাসের জন্য একঘরে (Boycott) করে দিয়ে এবং এ শাস্তি মহানবী দেন নি, দিয়েছিলেন স্বয়ং আল্লাহ। আর আজ যদি আল্লাহর রসুল পৃথিবীতে ফিরে এসে এ জাতিকে ডেকে বলেন- "হে আমার জাতি! আল্লাহ আমার উপর এই দীন এ ইসলামকে সংগ্রামের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠার যে ভার দিয়েছিলেন তা আমি আরম্ভ করে তোমাদের হাতে ছেড়ে গিয়েছিলাম পূর্ণ করার জন্য। তোমরা তো সেটা বহু আগেই ছেড়ে দিয়েছ, আমার সুন্নাহ ত্যাগ করেছ। এখন তোমাদের প্রথম কেবলা শত্রুর হাতে। ফিলিপাইনে, ইথিওপিয়ায়, সুদানে, ভারতে, বসনিয়ায় এবং পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে শত্রুরা তোমাদের ভাইদের হত্যা করতে করতে শেষ করে আনছে আর তোমরা এখনও ঘরে বসে তসবিহ পড়ছ? ওঠো! সব ত্যাগ করে একতাবদ্ধ হয়ে আমার উম্মাহর জন্য আল্লাহ যে জেহাদ ও সশস্ত্র সংগ্রাম ফরদ করে দিয়েছেন, সেটা আরম্ভ কর।" তাহলে কী হবে? এ জাতির

‘ধর্মীয়’ নেতারা তখন হুজরা আর খানকা শরীফ থেকে মাথা বের করে বলবেন- ÒBqv imjvjvn! আমরা জেহাদে আকবর নিয়ে খুব ব্যস্ AwQ| আপনিই তো বলেছেন নফসের সাথে জেহাদই হচ্ছে জেহাদে আকবর। অস্ত্র হাতে নিয়ে ছোট জেহাদ আমরা করি না, ও জেহাদ আপনিই জীবনভর করে এসেছেন, এখনও আপনিই করেন গিয়ে।” নিঃসন্দেহে বলা যায়- যেরুযালেম বা বায়তুল মোকাদ্দসের মত মক্কা এবং কাবা আজ যদি শত্রুর হাতে চলে যায় তাহলেও ঐ জেহাদের আকবরের জেহাদিরা ঐ শত্রু অধিকৃত কাবার দিকে মুখ করেই ফরদ, নফল নামায পড়তে থাকবেন, তাহাজ্জুদ পড়তে থাকবেন, আর এই ‘উম্মতে মোহাম্মদী’ তার দৈনন্দিন কাজ-Kg, e¨emv-ewYR¨ PvKwi করতে থাকবে, আজ বায়তুল মোকাদ্দস হারাবার পরও যেমন করছে। একথা বোঝার শক্তিও এ হতভাগ্য জাতি হারিয়ে ফেলেছে যে, তাদের ঐ অতি wbôvi mg¯ এবাদত আল্লাহ ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করছেন। একপেশে, ভারসাম্যহীন তাসাওয়াফ জাতির আকিদা, ইসলামের প্রকৃত আকিদার ঠিক উল্টো আকিদা শিক্ষা দিয়ে একে কোথায় নিয়ে এসেছে। এখানে একটি কথা বলে নেই, এই দানের তথাকথিত আলেম শ্রেণির সামনে জেহাদের প্রসঙ্গ উঠলেই তারা সমস্বরে বলে ওঠেন, ‘আল্লাহর রসুল বলেছেন, আসল জেহাদ হলো আত্মার কু-প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে, নফসের বিরুদ্ধে, এটাই হচ্ছে জেহাদের আকবর বা সর্বশ্রেষ্ঠ জেহাদ। আর অস্ত্র হাতে যুদ্ধ, ওটা হলো জেহাদে আসগর, মানে ছোট জেহাদ।’ এই কথাগুলো তারা রসুলাল্লাহর নামে চালিয়ে দেন অথচ এগুলো কোনো হাদিস নয়। এই হাদিসের সংকলক এমাম বায়হাকি নিজেই স্বীকার করেছেন যে, এই হাদিসের সনদ ত্রুটিযুক্ত এবং এই দয়িফ হাদিস সম্বন্ধে হাফেয ইবনে হাজ্জার প্রমুখ মোহাদ্দেসরা বলেছেন, এটা কোনো হাদিসই না, এটা একটা আরবি প্রবাদ বাক্য মাত্র। তার চেয়েও বড় কথা হচ্ছে কোনো হাদিস সহীহ্ কি না তা যাচাই করার প্রথম কষ্ঠিপাথর হচ্ছে কোর’আন। সেই কোর’আনেই আল্লাহ স্বয়ং আমাদের বলে দিচ্ছেন বড় জেহাদ অর্থাৎ জেহাদে আকবর বা কবীর কোন্টা। সুরা ফোরকানের ৫২ নং

আয়াতে তিনি বলেছেন, "সুতরাং কাফেরদের কথামত চল না Ges Gi (কোর'আনের) সাহায্যে তাদের সঙ্গে বড় জেহাদ কর। জেহাদান কবীর কর।" অর্থাৎ কাফেরদের বিরুদ্ধে জেহাদই হচ্ছে জেহাদে আকবর, নফসের সঙ্গে নয়। রসুলাল্লাহর দুনিয়া থেকে বিদায়ের ৬০/৭০ বছর পরে এই জাতির পথভ্রষ্ঠ লোকেরা যখন নীতি হিসাবে জেহাদ ত্যাগ করলেন তখন এই জাতির আলেমরা তাদের ঐ কাজের ন্যায্যতা প্রমাণের চেষ্টায় হাদিস উদ্ভাবন করলেন যে নফসের সঙ্গে জেহাদই হচ্ছে জেহাদে আকবর, বড় জেহাদ যা পবিত্র কোর'আনের সঙ্গে সরাসরি সাংঘর্ষিক।

এখানেই এই বিকৃতির শেষ নয়। পেছনে বলে এসেছি যে, এই ভারসাম্যহীন তাসাওয়াফ শুধু মাত্র একটি প্রক্রিয়া। আত্মার ধোয়ামোছা, ঘষামাজা করে আত্মার শক্তি বৃদ্ধি করা। এ প্রক্রিয়া অত্যন্ RwUj mZivs Gi bvbv iKg c_ (তরিকা) আছে। আত্মার মার্জনা ও পরিষ্কারের প্রক্রিয়া অন্যান্য সব ধর্মেও আছে এবং ঐ সব ধর্মেও বহু বিভিন্ন প্রক্রিয়া (তরিকা) আছে। উদ্দেশ্য একই অর্থাৎ আত্মার শক্তিবৃদ্ধি সুতরাং সবার প্রক্রিয়ার মধ্যে মিলও আছে। এ কারণেই 'মুসলিম' সুফিদের ও অন্যান্য ধর্মের আধ্যাত্মিক সাধকদের মধ্যে বিশেষ কোনো বিরোধ নেই। এমনকি কিছুটা উর্ধ্বে উঠে যাওয়ার পর অনেক সাধকদের বোঝা মুস্কিল তারা আসলে কোনো ধর্মের। এই জন্য একাধিক উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন সুফিদের মৃত্যুর পর দুই তিন ধর্মের লোকদের মধ্যে তাদের লাশ নিয়ে টানাটানি হয়েছে। কথাটা বোধ হয় পরিষ্কার করে বোঝাতে পারলাম না। এই শেষ ইসলামের যে ভারসাম্যটার কথা আগে বলে এসেছি সেটার কথা হচ্ছে। এক দিয়ে জাতীয় শরিয়াহ অন্যদিকে ব্যক্তিগত শরিয়াহ ও আত্মা এবং এ দুটোর ভারসাম্য। পূর্ববর্তী সমস্ দীনেরও ঐ ভারসাম্য ছিল কিন্তু এই শেষ ইসলামে একটা ব্যতিক্রম এল। এই ব্যতিক্রমটা হলো এই যে, জাতীয় শরিয়াহ এর আগের দীনগুলোতে ছিল সীমিত, সমস্ পৃথিবীর Rb¨ bq, mg¯ মানব জাতির জন্য নয়। কিন্তু শেষটা এল সমস্ পৃথিবীর জন্য, যাকে বলে সার্বজনীন। শুধু তাই নয়, এল পৃথিবীর ও মানব জাতির

বাকি আয়ুষ্কালের জন্য। কাজেই এর মধ্যে এমন কোনো AvBb-Kvbb, wbqg আল্লাহ দিলেন না যা পৃথিবীর এক জায়গার জন্য ঠিক অন্য জায়গার জন্য অঠিক, পালন করা মুশকিল বা অচল। এমনও দিলেন না যা আজ ঠিক আগামীতে কঠিন বা অচল; এক কথায় স্থান বা কালের প্রভাবাধীন নয়। সুতরাং পূর্ববর্তী দীনগুলো থেকে এই শেষ দীনের জাতীয় দিকটার আইন-Kvbb বেশ কিছু তফাৎ হতে বাধ্য হলো। কিন্তু ভারসাম্যের যে অন্য পার্শ্বটা অর্থাৎ আত্মার দিকটা, ওটাতে তফাৎ বিশেষ কিছু হলো না, কারণ আত্মার উন্নতির প্রক্রিয়ায় বড় কোনো অমিল নেই পূর্ববর্তী দীনগুলোর সাথে, কারণ সব ধর্মের প্রত্যেক মানুষের মধ্যে স্বয়ং আল্লাহর আত্মা (রুহ) অবস্থান করছে। ভারসাম্যহীন সুফিরা যখন জাতীয় শরিয়াহকে সম্পূর্ণভাবে বর্জন করে আত্মার উন্নতির প্রক্রিয়ায় লেগে গেলেন তখন দেখলেন যে, ঐ ব্যাপারে পূববর্তী দীনগুলোর আত্মার উন্নতির প্রক্রিয়ার সাথে যথেষ্ট মিল আছে। যে Rxeb-বিধান অর্থাৎ শরিয়াহকে সংগ্রাম করে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা করার আদেশ স্রষ্টা দিলেন, পূববর্তী দীনগুলোর শরিয়াহগুলোর সঙ্গে এর বৈশিষ্ট্য বেশ প্রকট, কিন্তু অপর পার্শ্বের অর্থাৎ আত্মার দিকটাতে মিল আছে। সুফিরা শুধু ঐ দিকটাকে আঁকড়ে ধরে দেখলেন অন্যান্য ধর্মের, দীনের ঐ দিকটায় সংঘর্ষের বিশেষ ক্ষেত্র নেই। অন্যান্য দীনের পূর্ববর্তী ধর্মগুলোর আধ্যাত্মিক সাধকদের সাথে সুফিদের কোনো সংঘর্ষ তো হলোই না, বরং বহু সুফি দুই দীনের মাঝামাঝি স্থান যাকে বলা যায় (Twilight Zone) খুঁজে নিলেন। অর্থাৎ সম্পূর্ণভাবে এটাও না ওটাও না, এর কিছু প্রক্রিয়া ওর কিছু প্রক্রিয়া। এর অসংখ্য উদাহরণ দিতে পারি- সবচেয়ে ভালো উদারহণ বোধহয় শিখ 'ধর্মের' প্রবর্তক গুরু নানক। যতদূর জানা যায় ইনি মুসলিম সাধক ছিলেন, সুফি ছিলেন, একাধিকবার হজ্ব করেছিলেন। সাধনার উচ্চ স্রে উঠে তিনি দেখলেন হিন্দু ধর্মেও আত্মার উন্নতির ভালো প্রক্রিয়া আছে।

প্রকৃতপক্ষে হিন্দু বলে কোনো ধর্ম নেই, উপমহাদেশে অনেক নবীর (আ.) আগমন হয়েছে, তাদের দীনগুলোর বিকৃত রূপ আজও সমস্ উপমহাদেkgq

ছড়িয়ে রয়েছে, প্রত্যেকটি গোড়ায় সেই তওহীদ, দীনুল কাইয়্যেমা, সনাতন ধর্ম। ভারতে নবী রসুলদের আগমনের ইতিহাস অনেক প্রাচীন। বলা চলে হাজার বছর তো বটেই, এমন কি লক্ষ বছরও হতে পারে। সুতরাং এই দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে এই এলাকায় আগত নবী রসুলদের প্রকৃত শিক্ষাকে বিকৃত করা হয়েছে। ভাষাগত তারতম্যের কারণে এবং সময়ের ব্যবধানে এই নবীদের অনেকের নাম পর্যন্ পরিবর্তিত হয়ে গেছে, তারা এখন অন্য নামে পরিচিত হচ্ছেন। যেমন ঈসা (আ.) এর আগমন মাত্র দুই হাজার বছর আগে। কেউ তাকে ডাকেন যিশু, কেউ যশুয়া, কেউ ঈসা আবার কেউ জেসাস। এভাবে তার শিক্ষাকেও বিকৃত করে খ্রীস্ট ধর্মের রূপ দেওয়া হয়েছে; যদিও আল্লাহ খ্রিষ্টান ধর্ম বলে আলাদা কোনো ধর্ম পাঠান নি। অন্যান্য নবী রসুলদেরকে আল্লাহ যে সর্বব্যাপী তওহীদ দিয়ে পাঠিয়েছেন, ঈসা (আ.) কেও সেই তওহীদ, সেই সার্বভৌমত্ব, দীনুল কাইয়্যেমা, সনাতন ধর্ম দিয়ে পাঠিয়েছেন এবং তার অনুসারীরা ছিলেন মো'মেন এবং gmwjg| পবিত্র কোর'আন নাযেল না হলে মানুষ আজও ঈসা (আ.) সম্পর্কে প্রকৃত সত্য জানতে পারত না, ঐ বিকৃতটাই জানত। ঠিক তেমনি হিন্দুদের পুরাণে, বেদে, সংহিতায়, রামায়নে ও মহাভারতে যে ইতিহাস আমরা পাই সেখানেও রয়েছে প্রচুর বিকৃতি। সেই সব বিকৃতির মধ্যেই মিশে আছে কিছু মহাসত্য hv দেখার মত দৃষ্টিশক্তি এই বিকৃত ইসলামের আলেমদের নেই। থাকলে তারা দেখতে পেতেন যে, ঐ সব ধর্মগ্রন্থে যে সব অবতারদের কথা বলা হয়েছে তাদের অনেকেই আল্লাহর প্রেরিত নবী, এবং যে ধর্মগ্রন্থগুলোর চর্চা হিন্দু ধর্মে হয়ে থাকে সেগুলোর কিছু কিছু আল্লাহরই পাঠানো কেতাব। আরও দেখতে পেতেন যে, জেসাস যেমন ঈসারই (আ.) উচ্চারণ ভেদ বা নামান্র, তেমনি মনু নুহের (আ.) নামান্র, যুধিষ্ঠির ইদ্রীস (আ.) এর নামান্i|

যাহোক, এই হিন্দু ধর্মেও আত্মার উন্নতির ভালো প্রক্রিয়া রয়েছে। গুরু নানক আধ্যাত্মিক উন্নতির কিছু প্রক্রিয়া সেখান থেকেও নিলেন, নিয়ে মিশ্রণ করে GK ZwiKv cবর্তন করলেন, যে তরিকায় মুসলিম, হিন্দু, খ্রিষ্টান, বৌদ্ধ সব

দীন থেকেই লোক যোগ দিল ঘষামাজা করে আত্মার শক্তি বৃদ্ধি করতে। এই তরিকা কালে একটি নতুন ধর্মেরই রূপ নিল যেটা আজ শিখ ধর্ম; যেমন ইহুদি ধর্মের সংস্কারে ঈসার (আ.) প্রচেষ্টা কালে একটি নতুন ধর্মের, খ্রীস্ট ধর্মের রূপ নিয়েছিল। বর্তমান 'ইসলাম ধর্মের' তরিকাগুলো আলহাজ্জ্ব সুফি নানকের তরিকার মত সাফল্য লাভ করতে পারে নি তাই শিখ ধর্মের মত আলাদা রূপ নিতে পারে নি কিন্তু একই রাস্তায় আছে। এক তরিকার অনুসারীরা অন্য তরিকার লোকদের থেকে নিজেদের আলাদা মনে করেন, এক পীরের মুরিদরা অন্য পীরের মুরিদদের পথভ্রষ্ট মনে করেন। এরই পরবর্তী পদক্ষেপ হচ্ছে অন্য ধর্ম সৃষ্টি যা নানক সাফল্যজনকভাবে করেছেন। নানকের শিষ্য অর্থাৎ মুরিদদের মধ্যে কিছু বৌদ্ধ ও খ্রিষ্টান থাকলেও প্রধানতঃ প্রায় সম্পূর্ণটাই ছিল হিন্দু ও মুসলিম। অমৃতসরের স্বর্ণমন্দির, শিখদের কেবলার ভিত্তিপ্রস্র স্থাপন করেছিলেন আরেক মুসলিম সুফি সাধK- মিয়া মীর। অদৃষ্টের বিদ্রূপ- পরবর্তীকালে ভারত ভেঙ্গে দুই রাষ্ট্র হবার সময় এই শিখরা হিন্দুদের পক্ষ হয়ে লক্ষ লক্ষ মুসলিম হত্যা করেছে, আর বর্তমানে যেখানে পারছে হিন্দু হত্যা করছে।

এই দীনের যে তাসাওয়াফ আছে তা ভারসাম্যপূর্ণ, এর জাতীয় জীবনের শরিয়াহর সঙ্গে ভারসাম্যপূর্ণ। ইসলামের প্রকৃত তাসাওয়াফ হচ্ছে যখনই কোনো কাজ করা হবে তখন মনে রাখতে হবে এই কাজটি আল্লাহর অনুমোদিত কিনা, যদি আল্লাহ ও রসুলের অনুমোদিত হয়ে থাকে তাহলে সেটা করা আর যদি আল্লাহ রসুলের নিষিদ্ধ হয়ে থাকে সেটা না করা। অর্থাৎ কাজটি করা অথবা না করা এবং সেটা হবে আল্লাহর আদেশ বা নিষেa মোতাবেক। হুকুম দেয়ার একমাত্র অধিকারী আল্লাহ কারণ সার্বভৌমত্ব হলো আল্লাহর। রসুলের কথা বলার কারণ রসুল আল্লাহর হুকুমের বাহিরে হুকুম দিতে পারেন না (সুরা হাক্কা- 46, miv bRg 3-৪)। আল্লাহর হুকুমের কোনটার কি মানে সেটা হলো রসুলের জীবনীতে অর্থাৎ রসুলের কথায়। mZivs Bmলামের আধ্যাত্মিকতার শুরু হলো এখান থেকে। এটা করতে

করতে কে কত উচ্চে উঠতে পারে, নিখুঁত (Perfect) হতে পারে সেটা যার যার আমল। এটাকেই আল্লাহ বলেছেন আমার যেকর, সকাল সন্ধ্যা তাঁর যেকর এ রত থাকা (সুরা আল আহযাব-৪১, ৪২)। অন্যভাবে বলা যায় তাকওয়া। জান্নাতে স্র নির্ধারিত হবে এই তাকওয়া বা যেকরের উপর নির্ভর করে। বর্তমানে আধ্যাত্মিকতার নামে যে সুফিবাদ চালু আছে সেটা আল্লাহ ও রসুলের নয়। মো'মেনদের মধ্যে যিনি আল্লাহর হুকুমের ব্যাপারে যত সচেতন, যত বেশি মোত্তাকি তিনি তত বড় আধ্যাত্মিক সাধক। গাছের নিচে, ঝোপ ঝাড়ে বসে, গুহায়, খানকায় বসে অধ্যাত্ম অর্জন শেষ ইসলামের অধ্যাত্ম নয়। আধ্যাত্মিক সাধকদের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে ষড় রিপুকে দমন করে আত্মার উন্নতি সাধন। এখানে ষড়রিপু সম্পর্কে দুইটি বিষয় উল্লেখ করতে চাই। প্রথম ধরুণ 'লোভ'। লোভ হলো মানুষের ষড়রিপুর একটি রিপু। লোভ মানুষকে হীন পশুতে পরিণত করে দিতে পারে। একজন সাধক চোখ বন্ধ করে, না খেয়ে, আত্মাকে নিয়ন্ত্রণ (Control) করতে পারে, যেমন হয়তো সে ৫০ বছরে কেবল লোভ থেকে মুক্ত হলো (যদিও আদৌ ১০০% সম্ভব কিনা তা যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে)। অন্যদিকে আল্লাহর রাস্তায় জেহাদের ডাক যখন আসে একজন মো'মেন মোজাহেদ সঙ্গে সঙ্গে তার বাড়ি, ঘর, সহায় সম্পত্তি, AvZ¥q cwiRb, evev-মা, স্ত্রী, সন্তান সব কিছুর মায়া ত্যাগ করে জেহাদের অংশগ্রহণ করে, অতঃপর সেখানে অবশেষে নিজের জানটুকু পর্যন্ত Avjvni iv¯ায় কোরবান করে শহীদ হয়ে যায়। তাহলে লোভ থেকে, মোহ থেকে, ক্রোধ থেকে, ভোগের বাসনা থেকে ১০০% কে মুক্ত হয়ে গেল, কামেলিয়াত ARb Kij, wbðq ঐ মোজাহেদ। একজন মোজাহেদ জেহাদ করে প্রথমত মানবজাতির কল্যাণের জন্য, আল্লাহকে বিজয়ী করার জন্য, পক্ষান্তরে সাধু, ফকীর, দরবেশ জুহুদ বা আত্মিক সাধনা করে একান্তই নিজের জন্য, স্বীয় আত্মিক পরিতৃপ্তি ও পরিশুদ্ধির জন্য। প্রশ্ন হলো বছরের পর বছর ধরে যে সাধক জুহুদ করে অর্থাৎ সাধনা করে একটা একটা করে রিপু জয় করতে চেষ্টা করল কিন্তু কোনোটা থেকেই হয়তো পুরোপুরি মুক্ত হতে পারল না সেখানে

একজন মোজাহেদ কিভাবে সমস্ কিছু বিসর্জন দেওয়ার মাধ্যমে একসঙ্গে সকল ষড়রিপু থেকে পূর্ণরূপে মুক্ত হয়ে সর্বোচ্চ কামেলিয়াত হাসিল করল। এর সহজ উত্তর, এটা মহান আল্লাহ্ করে দিয়েছেন কারণ সে আল্লাহকে বিজয়ী করার জন্য আত্মনিয়োগ করেছে।

এখানে একটা কথা প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, এই সুন্দর পৃথিবী আল্লাহ্ সৃষ্টি করেছেন বনি আদমের জন্য, বনি আদম আল্লাহর খেলাফত করবে, এখানে তারা শান্তিতে থাকবে, দুনিয়ার আলো বাতাস, খাদ্য পানীয় ইত্যাদি ভোগ করবে, বংশ বৃদ্ধি করবে, দনিয়া চাষাবাদ করবে এটাই হলো স্বাভাবিক। কিন্তু মানুষ যদি কাম প্রবৃত্তি দমন করতে থাকে, পাহাড়ে জঙ্গলে বসে সংসার না করে জীবন অতিবাহিত করে তাহলে মানবজাতি একসময় বিলুপ্ত হয়ে যাবে। কয়েকটি প্রশ্ন এখানে প্রাসঙ্গিক:

ক) যদি নারী পুরুষ বৈবাহিক জীবন যাপন না করে তাহলে আল্লাহ্ নারীদের সৃষ্টি করলেন কেন?

খ) বনি আদমের বংশ বৃদ্ধি হবে কিভাবে, আল্লাহর খেলাফত কে করবে?

M) mg¯ মানবজাতির পক্ষে কি এসব তরিকা অবলম্বন করা সম্ভব? যদি সম্ভব না হয় তবে তা সার্বজনীন নয়। আর যা সার্বজনীন নয় তা ইসলাম হতে পারে bv|

ঘ) তাছাড়া আল্লাহর রসুল (দ.) বলেছেন, 'তোমাদের উপর তোমাদের নফ্সের হক রয়েছে। নফল সওম রাখো এবং তা থেকে বিরত থাকো। রাতের বেলা তাহাজ্জুদের সালাহ কায়েমে করো এবং ঘুমাও। আমি তাহাজ্জুদের সালাহ কায়েম করি এবং ঘুমাইও। কোনো কোনো সময় সওম রাখি। আবার কোনো কোনো সময় সওম ত্যাগও কোরি। গোশত খাই, চর্বিও খেয়ে থাকি। স্ত্রীদের নিকটও যাই। যে আমার সুন্নাহ ত্যাগ করে, সে আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয়।' শরীরকে বঞ্চিত করাকে তিনি জুলুম বা অন্যায় বলে আখ্যায়িত করেছেন।

সুতরাং এই কথা পরিষ্কার যে, ইসলামের অধ্যাত্মবাদ হলো প্রত্যেক কাজে আল্লাহর উপস্থিতি গণ্য করা অর্থাৎ এটা মনে করা যে আমার এই কাজ আল্লাহ দেখছেন এবং আল্লাহর আদেশ নিষেধ অনুযায়ী সেই কাজ করা বা না করা। যে এটা যত বেশি স্মরণে রেখে জীবন অতিবাহিত করল সে তত বড় কামেল, তত বড় মোত্তাকী। আখেরী নবীর সাহাবীদের মধ্যে অর্থাৎ প্রকৃত উম্মতে মোহাম্মদীর মধ্যে এই তাসাওয়াফই ছিল। কিন্তু মোটামুটি খ্রিষ্টীয় নবম শতাব্দীতে পারস্য থেকে যে একপেশে বিকৃত সুফিবাদ ইসলামে প্রবেশ করে একে স্থবির করে দিলো, বিশ্বনবীর অপরাজেয়, দুর্ধর্ষ উম্মাহটাকে কাপুরুষ বানিয়ে দিল সেটা ইসলামের তাসাওয়াফ নয় এবং আজও ঐটাই 'মুসলিম' দুনিয়াময় জোরে সরে চলছে, ঐ প্রাণ হত্যাকারী তাসাওয়াফ প্রক্রিয়াকেই ভালো মুসলিম হবার উপায় হিসাবে বিবেচনা করা হচ্ছে। কঠিন পরিশ্রম রেয়াযাত করে আত্মার শক্তি বৃদ্ধি করা হচ্ছে। এ প্রক্রিয়া অন্যান্য ধর্মেও আছে এবং তারা সাধনা করে শক্তি লাভ করেন। তাদের কেরামত এই 'মুসলিম' সাধকদের চেয়ে কোনো অংশে কম নয়। এই সাধনা করার জন্য এই উম্মাহর সৃষ্টি করা হয় নি। একে সৃষ্টি করা হয়েছে পূর্ববর্তী দীনগুলোর বিকৃত অবস্থার আইন-কানুন ও মানুষের মস্তিষ্ক প্রসূত রাজনৈতিক, আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা চুরমার করে এই শেষ ইসলাম প্রতিষ্ঠা করে পৃথিবী থেকে সর্বরকম অবিচার, অন্যায়, শোষণ-যুলম নিশ্চিহ্ন করে শান্তি (ইসলাম) স্থাপন করার জন্য। এই ব্যাপারে আল্লাহর সরাসরি ঘোষণা হচ্ছে, আল্লাহ তাঁর রসুলকে পাঠিয়েছেন পথ-প্রদর্শন, হেদায়াহ ও সত্য দীন দিয়ে এই জন্য যে, তিনি পৃথিবীতে প্রচলিত অন্যান্য সমস্ত দীনগুলোর উপর একে প্রতিষ্ঠা করবেন। তাঁর রসুলের জীবনের লক্ষ্য এত দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলে দিয়েও সন্তুষ্ট না হয়ে, এ যে কত গুরুত্বপূর্ণ তা বোঝাবার জন্য বললেন- (GB K_vi) সাক্ষী হিসাবে স্বয়ং আল্লাহই যথেষ্ট (সুরা আল ফাতাহ ২৮)। আল্লাহ সেই পরিষ্কার দিক-নির্দেশনা তার নবী কি অমান্য করে অন্য কাজ করেছিলেন? অবশ্যই নয়, তার কর্মবহুল বর্হিমুখী, সংঘর্ষমুখী জীবনই তার প্রমাণ। সেই

জীবনের বর্তমানে যে তাসাওয়াফ চলে তার নামগন্ধ নেই, খানকাহ বলে কোনো শব্দ রসুলাল্লাহ বা তার আসহাব কোনোদিন শুনেনও নাই। তসবিহ কী জিনিস তারা জানতেন না (তসবিহ বহু পরে, অধ্যাত্মবাদের অনুপ্রবেশের পর খ্রিষ্টানদের Rosary ও হিন্দুদের জপমালা থেকে নেয়া হয়েছে)। ইতিহাস ও তার সিরাতসমূহ সাক্ষী যে তার জীবন শুধু সংগ্রাম, সংগ্রাম আর সশস্ত্র সংগ্রাম। আর এই বিকৃত তাসাওয়াফে সংগ্রামের গন্ধও নেই। এই তাসাওয়াফ যে ইসলামের নয় তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ হচ্ছে এই যে, এই তাসাওয়াফ অনুশীলনকারীদের মধ্যে বহু লোক আছেন যারা বর্তমানে চালু পাশ্চাত্যের আইন ব্যবসায়ী, বহু আছেন যারা ব্যাংকের পরিচালক, ব্যাংকে কাজ করে ব্যাংকের সঙ্গে সুদভিত্তিক ব্যবসা করেন। এইসব লোকদের মধ্যে অনেক আছেন যারা রেয়াযত করে আধ্যাত্মিক শক্তি বৃদ্ধি করেছেন। তাদের কাশ্‌ফ হয়, অনেক গায়েবী খবর তারা জানতে পারেন, তাদের কেরামতের শক্তিও অর্জিত হয়েছে। এখন প্রশ্ন - মানুষের তৈরি যে আইন ধ্বংস করে, যে শোষণমূলক, সুদভিত্তিক ধনতান্ত্রিক অর্থনীতি মাটিতে মিশিয়ে দিয়ে আল্লাহর AvBb I Rxebe¨e¯' প্রতিষ্ঠা করতে আল্লাহ তার শেষ নবীকে ও তার উম্মাহকে নির্দেশ দিয়েছেন, সেইগুলোই যাদের পেশা, জীবিকা তারা কি করে ঐ উম্মাহভুক্ত হতে পারেন? বিশেষ জটিল কষ্টসাধ্য প্রক্রিয়ায় অন্যান্য ধর্মের লোকেরা সাধনা করে যেমন ঐসব শক্তি লাভ করেন, এরাও তাই করছেন। শেষ দীনের উদ্দেশ্য ও প্রক্রিয়ার সাথে এ সবের কোনো মিল নেই- দুটো m¤úY Avjv`v wRwbm| f j ejjvg, Avjv`v wRwbm bq, weixZMvgx wRwbm- একটি বহির্মুখী ও বিস্ফোরক, অন্যটি অন্তর্মুখী স্থবির।

জানি না এ কথা বোঝবার মত করে লিখতে পারলাম কিনা যে এই দীনের, Rxeb-ব্যবস্থার একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে পৃথিবীতে সব রকম অন্যায়-AwePvi, শোষণ, অশান্তি, রক্তপাত বন্ধ করে শান্তি (Bmjvg) cwZôv Kiv| GBUvB হলো আল্লাহর প্রতি ইবলিসের চ্যালেঞ্জ, যে চ্যালেঞ্জ আল্লাহ গ্রহণ করেছেন। ফেরেশতারা, মালায়েকরা বলেছিলেন এই নতুন সৃষ্টি মানুষ পৃথিবীতে অশান্তি

(ফাসাদ) ও রক্তপাত (সাফাকুদ্দিমা) করবে। ফাসাদ শব্দের অর্থের মধ্যে Akা‍ি, অবিচার, শোষণ, অত্যাচার সব কিছুই আসে আর সাফাকুদ্দিমা শব্দের অর্থের মধ্যে খুন, যখম, যুদ্ধ ইত্যাদি সব কিছুই আসে। মালায়েকরা মানুষ সৃষ্টির বিরুদ্ধে এ যুক্তি আল্লাহর কাছে পেশ করেন নি যে মানুষ তোমার এবাদত করবে না, নামায, রোযা, হজ্ব করবে না, মন্দীরে, মসজিদে, গির্জায়, mxbাগগে আর প্যাগোডায় যাবে না। আজ পৃথিবীময় মানুষ মসজিদে, মন্দিরে, সীনাগগে, প্যাগোডায় আর গির্জায় শুধু ভীড় করছে তা নয়, ওগুলোতে জায়গা পাওয়া মুশকিল। প্রতিদিন শত শত নতুন উপাসনালয় পৃথিবীতে তৈরি হচ্ছে, তাও উপাসকদের জায়গা হচ্ছে না। এ ছাড়াও নানাভাবে মানুষ যার যার ধর্মের সম¯ রকম অনুশাসন প্রাণপণে পালন করতে চেষ্টা করছে। কি ফল হচ্ছে? পৃথিবীতে অন্যায়, অবিচার, মযলুমের ক্রন্দন, রক্তপাত, যুদ্ধ, হত্যা কমছে? অবশ্যই নয় যে, কোনো পরিসংখ্যান নিঃসন্দেহে বলে দেবে যে ওগুলো অত্য‍ন্ দ্রুতগতিতে বেড়ে যাচ্ছে। এই শতাব্দীতে দুটি বিশ্বযুদ্ধে চৌদ্দ কোটি বনি আদম যে শুধু হতাহত হয়েছে তাই নয়, ঐ যুদ্ধের পর সংঘাত এড়াবার মানবিক প্রচেষ্টার ফল জাতিসংঘের (United Nations) জন্মের পরও শুধু ২০০০ খি. পর্য‍ন্ পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে যুদ্ধে ৪০,৯৬৮,০০০ (চার কোটি নয় লক্ষ আটষট্টি হাজার) মানুষ শুধু নিহতই হয়েছে, আহতদের সংখ্যা স্বভাবতই এর দশ গুণের বেশি (Stockholm International Peace Research Institute)| Avi GB bZb kZvãxi GKwU w`bI অতিবাহিত হয় নি, যেদিন পৃথিবীতে যুদ্ধ ও রক্তপাত হয় নি। শুধুমাত্র ইরাক I AvdMwb¯ানেই নিহত হয়েছে ১০ লক্ষ মানুষ, মায়ানমার, সিরিয়া, ফিলিস্ি ন এসব দেশের কথা বাদই দিলাম। এই মৃত্যুর আনুষাঙ্গিক যে দুঃখ, nাহাকার আর অশ্রু তা কোনো পরিসংখ্যানে নেই। এ ছাড়া প্রতিদেশে, গরীব, ধনী সব রকম দেশে, পৃথিবীময় খুন, যখম, ধর্ষণ, চুরি-WvKwZ, `bwZ, রাজনৈতিক দাঙ্গা, হানাহানি- এক কথায় সর্বরকম অপরাধ বাড়ছে এবং

লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। তাহলে মানুষের এই যে ধর্ম পালন, অতি নিষ্ঠার সাথে যার যার ধর্মের আনুষ্ঠানিকতার অনুশীলন, এসব করে কি লাভ হলো? কিছুই না। এগুলোয় কিছুই হবে না বলেই মানুষ সৃষ্টির বিরুদ্ধে যুক্তিতে মালায়েকরা এ যুক্তি দেন নি যে মানুষ তোমার এবাদত করবে না, তোমার উপাসনা করবে না, বলেছিলেন মানুষ ফাসাদ আর সাফাকুদ্দিমা অর্থাৎ অন্যায়, অবিচার, অশান্তি, যুদ্ধ আর রক্তপাত করবে (সুরা বাকারা ৩০)। আল্লাহ মানুষকে ঐ ফাসাদ আর সাফাকুদ্দিমা এড়াবার জন্য একটি মাত্র পথ বলে দিলেন, আদমকে (আ.) বলে দিলেন এবং আদমের (আ.) পর তার প্রতিটি নবীর মাধ্যমে মানুষকে বলে দিলেন। সেই পথটি হচ্ছে জীবন-weavZv (এলাহ) বলে একমাত্র তাকেই, আল্লাহকেই, স্রষ্টাকেই স্বীকার করে নেওয়া, অন্য কোনো বিধান না মানা, এবং এটাই হলো তওহীদ, উলুহিয়াত (Sovereignty)। কিন্তু মনে রাখতে হবে ঐ তওহীদ আজকের এই শুধু ব্যক্তিগত জীবনের তওহীদ নয়, পূর্ণ জীবনের তওহীদ, ব্যক্তিগত ও জাতীয় উভয় জীবনের তওহীদ। শুধু ব্যক্তিগত জীবনের তওহীদ হচ্ছে শেরক। কারণ Rvতীয় জীবনে অন্যের বিধান স্বীকার করা, মেনে নেওয়ার অর্থ আল্লাহর অংশীদার স্বীকার করে নেওয়া। আর যে উভয় জীবনে অন্যের বিধান মেনে নিলো, সেতো কাফের।

মানুষকে আল্লাহ এই যে একটিমাত্র শর্ত দিলেন অর্থাৎ শুধু একমাত্র তাকেই cf, Gjvn A_vr Rxeb-বিধাতা বলে স্বীকার করা, অন্য সর্বরকম feavb অস্বীকার করা, অর্থাৎ শুধুমাত্র আল্লাহর সার্বভৌমত্ব মেনে নেওয়া; এই যথেষ্ট। এটা কেন? এত সংক্ষিপ্ত, এত সহজ, এত ছোট্ট একটি শর্ত, একটা দাবী, এ কেন? এটা এই জন্য যে,

ক) যে সংবিধান, জীবন-বিধান জাতীয় জীবনে মেনে চললে পৃথিবী থেকে অশান্তি দূর হয়ে শান্তি আসবে, তেমন সংবিধান একমাত্র স্রষ্টা ছাড়া আর কেউ তৈরি করতে পারবে না, অসম্ভব। স্রষ্টাকেই একমাত্র বিধান দাতা বলে স্বীকার করে না নিলে তার বিধান মানার প্রশ্ন আসে না। তাই তার শর্ত ও দাবী

মানুষের প্রতি এই যে আমাকে ছাড়া আর কাউকে বিধান দাতা, এলাহ বলে মানবে না।

খ) একবার তাকে একমাত্র এলাহ বলে স্বীকার করে জাতীয় জীবনে তার দেওয়া আইন (রাজনৈতিক, আর্থ-mvgwRK, `Êwa me iKg) cwZôvi ci ব্যক্তিগত অপরাধ নিজে থেকেই প্রায় লোপ পেয়ে যাবে। ব্যক্তিগত অপরাধের নিয়ন্ত্রণের জন্য তার দেওয়া আইনই যথেষ্ট। কাজেই সর্বপ্রথম ও সব চেয়ে প্রয়োজনীয় হচ্ছে জাতীয় জীবনের তাকে একমাত্র এলাহ বলে স্বীকার করে নেওয়া। এটা করা হলে বাদ বাকি আর সব নিজে থেকেই ঠিক হয়ে যাবে। তাই আল্লাহ বিচারের দিন যার মধ্যেই সাচ্চা তওহীদ পাবেন তাকেই সমস্ গুনাহ মাফ করে দেবেন, অর্থাৎ জান্নাতে প্রবেশ করবে। এ ব্যাপারে অগুনতি হাদিস ও হাদিসে কুদসী রয়েছে। এমন কি চুরি ও ব্যভিচারের মত কবিরা গোনাহকারীও জান্নাতে যাবে, যদি সে সাচ্চা, সত্য সত্যই বিশ্বাস করে যে এলাহ, বিধানদাতা, আল্লাহর ছাড়া আর কেই নেই (হাদিস-Ave hi (iv.) থেকে বুখারী, মুসলিম ও মেশকাত)। অর্থাৎ জাতীয় ও ব্যক্তিগত জীবনে সে আর কারো তৈরি আইন-কানুন নিয়ম নির্দেশ মানতে পারে না। অন্যদিকে আল্লাহ কোর'আনে বহুবার বলছেন আমার ইচ্ছা হলে আমি আমার বান্দার সব গোনাহ মাফ করে দেব কিন্তু শেরক অর্থাৎ আমার দেওয়া বিধান, আইন-কানুন বাদ দিয়ে অন্যের তৈরি আইন-কানুন গ্রহণকারীকে আমি কখনই মাফ Kie bv (miv Avb wbmv 48)|

আজ পৃথিবীর 'অতি মুসলিমরা' নামাযে, রোযায়, হজ্বে, তাহাজ্জুদে, Zviবিতে, দাড়িতে, টুপি-পাগড়ীতে, পাজামায়, কোর্তায় নিখুঁত। শুধু একটিমাত্র ব্যাপারে তারা নেই, সেটা হলো তওহীদ। যে আংশিক অর্থাৎ ব্যক্তিগত তওহীদ ঐ অতি মুসলীমদের মধ্যে আছে তা আল্লাহ আজও যেমন ঘৃণা ভরে প্রত্যাখ্যান করে রেখেছেন, হাশরের দিনও তেমনি ঘৃণা ভরে প্রত্যাখ্যান করবেন। কারণ তিনি বলে দিয়েছেন যে, আল্লাহর কেতাবের কোনো অংশে বিশ্বাস আর কোনো অংশে অবিশ্বাসের শাস্তি শুধু যে কেয়ামতের

দিনে ভয়াবহ হবে তাই নয়, এই দুনিয়ার জীবনেও অপমান, লাঞ্ছনা (আল evKviv 85)| প্রশ্ন হলো এমন জীবনব্যবস্থা কি সম্ভব যেটা সমস্ `wbqvi মানুষকে একসঙ্গে শান্ি দিতে পারবে? এর উত্তর হচ্ছে: হ্যাঁ। এটা সম্ভব হবে যদি সমগ্র মানবজাতি একমাত্র আল্লাহকে তার সার্বিক জীবনের বিধান দাতা, এলাহ হিসাবে গ্রহণ করে নেয় এবং আল্লাহর দেওয়া জীবনব্যবস্থাকে নিজেদের জীবনে প্রতিষ্ঠিত করে। এই দীনের একটি নাম হচ্ছে দীনুল ফেতরাত অর্থাৎ প্রাকৃতিক দীন। কারণ প্রাকৃতিক নিয়মের সঙ্গে সামঞ্জস্যশীল করে আল্লাহ এই জীবনব্যবস্থাটি প্রণয়ন করেছেন। আগুন-পানি, আলো-বাতাস, অক্সিজেন ইত্যাদি প্রাকৃতিক উপাদানগুলো যেমন পৃথিবীর সকল মানবজাতির জন্য অবশ্য প্রয়োজন এবং সবার উপযোগী, তেমনি এই জীবনব্যবস্থাও পৃথিবীর সর্বত্র প্রযোজ্য, প্রয়োগযোগ্য, গ্রহণযোগ্য ও শান্ি`vqK| এজন্যই আখেরী নবী, বিশ্বনবী মোহাম্মদ মোস্ফা (দ.) এর উপাধি আল্লাহ দিয়েছেন রহমাতাল্লিল আলামীন। তাঁর উপর নাযেলকৃত জীবন-ব্যবস্থা গ্রহণ করে নিলেই সমস্ পৃথিবী হবে আল্লাহর রহমতে পরিপূর্ণ। আজকে অন্যায় অশান্িতে কানায় কানায় পূর্ণ পৃথিবীতে শান্ি Avbvi Rb¨ Avjvni ZInx` A_াৎ জীবনের সর্ব অঙ্গনে একমাত্র আল্লাহর হুকুম মেনে নেওয়া ছাড়া কোনো বিকল্প নেই।

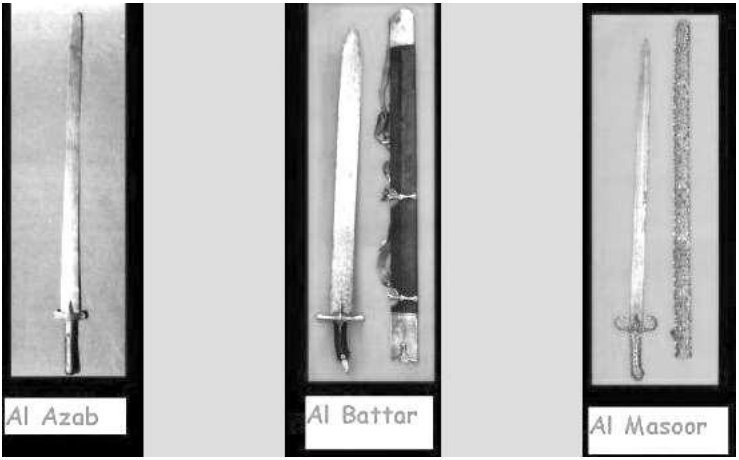

রসুলাল্লাহর তিনটি তলোয়ার

মহানবী কেমন বিপ্লবী ছিলেন?

যে সময়টার (Period) কথা আলোচনা করতে যাচ্ছি তা হলো-gmwjg নামধারী এই জাতিটির জাতিগতভাবে দীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম থামিয়ে দেওয়া থেকে ইউরোপীয় শক্তিগুলোর দাসে পরিণত হওয়া পর্যন্ত কয়েকশ' বছর। এই সময়কালের মধ্যে এই জীবনব্যবস্থার ও এই উম্মাহর একটি ভয়ংকর ক্ষতি করা হয়েছিল যার ফল আজও আমরা বয়ে বেড়াচ্ছি। নতুনভাবে গজিয়ে উঠা ধর্মের ধারক-বাহক, ধ্বজাধারী তথাকথিত আলেম-পুরোহিত শ্রেণির চুলচেরা বিশ্লেষণের ফলে জাতির মাঝে যে অনৈক্য ও ফেরকা-মাযহাব সৃষ্টি হয়েছে তা ভবিষ্যতে ইনশা'ল্লাহ লুপ্ত হয়ে যেয়ে আবার আগের মত কঠিন ঐক্য এই উম্মাহর মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হবে-যখন এই উম্মাহ আবার তার প্রকৃত আকিদা ফিরে পাবে। বিকৃত তাসাওয়াফের অন্তর্মুখী চরিত্রের ও সেরাতুল মোস্তাকীম ছেড়ে দিয়ে দীনের অতি বিশ্লেষণের বিষময় ফল উপলব্ধি করে উম্মাহ ইনশাল্লাহ আবার একদিন সেরাতুল মোস্তাকীমের সহজ, সরল রাস্তা, দীনুল কাইয়্যেমাতে অর্থাৎ তওহীদে ফিরে আসবে। কিন্তু এখন যে ক্ষতির কথা বলছি সে ক্ষতির পূরণ কঠিন হবে। সেটা হলো-রসুলাল্লাহ'র সম্পর্কে এই উম্মাহর ধারণা বিকৃত এবং বিপরীতমুখী হয়ে যাওয়া।

GB mgqকালের পণ্ডিত, ফকিহ, মোফাস্সের মোহাদ্দেসরা যে অক্লান্ত অপরিসীম পরিশ্রম করেছেন এই দীনের কাজে, তা পড়লে, চিন্তা করলে বিস্ময়ে অবাক হয়ে যেতে হয়। বিশেষ করে মোহাদ্দেসরা রসুলাল্লাহর (দ.) হাদিস সংগ্রহ ও যাচাই করতে যে অধ্যবসায়, পরিশ্রম আর কোরবানি করেছেন তার তুলনা মানুষের ইতিহাসে আর নেই। কিন্তু এরা সবাই বিশ্বনবীর (দ.) জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনীয় যে ভাগটি সেটাকে যথার্থ গুরুত্ব দেন নি, সেটা হলো মহানবীর (দ.) জীবনের সামরিক ভাগ। অবশ্য এটাকে সম্পূর্ণভাবে বাদ দিতে পারেন নি কারণ কোর'আনে স্বয়ং আল্লাহ যে তাঁর নবীকে (দ.) সংগ্রামের মাধ্যমে Ab¨ mg¯ বিধানকে নিষ্ক্রিয়

করে সমস্ পৃথিবীতে এই জীবনব্যবস্থা, দীনকে প্রতিষ্ঠার আদেশ দিয়েছেন (miv Avj dvZvn 28, AvZ ZIev 33, Avm-সাফ ৯), এই উম্মাহকেও যে আদেশ দিয়েছেন সংগ্রাম চালিয়ে যেতে, যে পর্যন্ না পৃথিবী থেকে যুলুম, অত্যাচার, অশান্তি আর রক্তপাত দূর হয়ে শান্তি (Bmjvg) cwZwôZ nq (miv Avbdvj 22-২৩)। এগুলো তো আর বাদ দেয়া সম্ভব নয়। তারপর বিশ্বনবীর (দ.) জীবনী লিখতে গেলে তিনি যে সমস্ জেহাদে, কিতালে এবং গাযওয়াতে (যুদ্ধ) নেতৃত্ব দিয়েছিলেন সে সব লিখতেই হয়েছে। কিন্তু লিখলেও তারা সেগুলোর প্রাধান্য দেন নি, প্রাধান্য দিয়েছেন তাঁর জীবনের অনেক কম গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারগুলোয়। যে মানুষটির জীবনের মাত্র নয় বছরের মধ্যে আটাত্তরটি যুদ্ধ হয়েছে যার সাতাশটি যুদ্ধে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, তার মধ্যে নিজে সক্রিয়ভাবে যুদ্ধ করেছিলেন নয়টিতে, আর বিভিন্ন দিকে সামরিক অভিযান পাঠিয়েছিলেন পঁয়ত্রিশটি যেগুলোর সমরনীতি এবং ব্যবস্থাপনা তাঁকেই করতে হয়েছিল, সে মানুষের জীবনটাকে প্রায় নিরবচ্ছিন্ন যোদ্ধার জীবন বলতে আপত্তির কোনো কারণ আছে? প্রতিটি যুদ্ধের আগে কত রকম প্রস্তুতি নিতে হয়েছে। অস্ত্রশস্ত্রের ব্যবস্থা, সেগুলোর কার্যকারিতা পরীক্ষা, শত্রুপক্ষের অবস্থান ও চলাচল, তাদের সংখ্যা ও অস্ত্রশস্ত্রের সংবাদ (Intelligen.), im` mieivn e¨বস্থা ইত্যাদি কত রকমের কত বন্দোবস্ করতে হয়েছে, তার উপর প্রতি যুদ্ধের বিভিন্ন রকমের সমস্যা উদ্ভূত হয়েছে, সেগুলোর সমাধান করতে হয়েছে-এই ব্যাপারে ঐ সময়ের পণ্ডিতদের কাছ থেকে আমরা এখন যে তথ্য পাই তা অন্যান্য বিষয়ের তথ্যাদির তুলনায় অতি সামান্য। অথচ যাকে অতগুলো যুদ্ধ করতে হয়েছিল তার সম্পর্কে লিখতে গেলে তাঁর সামরিক জীবনের খুঁটিনাটিই মুখ্য হয়ে দাঁড়াবার কথা। কিন্তু হয়েছে উল্টো। মহানবীর (দ.) ব্যক্তিগত জীবনের খুঁটিনাটি কম প্রয়োজনীয় ব্যাপারগুলোর পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ তাদের লেখায় আছে কিন্তু তাঁর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক সংগ্রামের দিক এত কম স্থান পেয়েছে যে, মনে হয় তারা এটাকে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করেছেন।

এর কারণ আছে। এই ফকিহ, মোফাস্‌সের, মোহাদ্দেস এরা সবাই আবির্ভূত হয়েছিলেন এই উম্মাহ তাঁর নেতার (দ.) প্রকৃত সুন্নাহ অর্থাৎ সংগ্রামের মাধ্যমে পৃথিবীতে এই দীন প্রতিষ্ঠা করে শান্তি (ইসলাম) প্রতিষ্ঠা করার সুন্নাহ Z¨vM Kivi ci| GB D¤§vহ সৃষ্টির প্রকৃত উদ্দেশ্য তখন তাদের সম্মুখ থেকে অদৃশ্য হয়ে গেছে, আকিদা বিকৃতি হয়ে গেছে। উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হারিয়ে গিয়েছিল বলেই তো তারা সংগ্রাম ত্যাগ করে খাতা-কলম নিয়ে ঘরে বসেছিলেন এই দীনের চুলচেরা বিশ্লেষণ করতে, আরেক দল এসবও কিছু না করে খানকায় ঢুকে তাদের আত্মার ঘষামাজা করতে শুরু করেছিলেন, নেতার (দ.) প্রকৃত সুন্নাহ সংগ্রাম মুষ্টিমেয় লোক ছাড়া কারোরই সম্মুখে ছিল না। সুতরাং তারা যে ঐ সংগ্রাম সম্বন্ধে নিরুৎসুক, অনাগ্রহী হবেন তা স্বাভাবিক। তাই তাদের সারাজীবনের অক্লান্ত পরিশ্রমের, অসাধারণ অধ্যবসায়ের ফলশ্রুতিতে যে দীন, জীবনব্যবস্থা জনসাধারণের সম্মুখে উপস্থাপিত হলো তাতে বিশ্বনবীর (দ.) প্রকৃত সুন্নাহর অর্থাৎ আল্লাহর সত্যদীন প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রামের, জেহাদের বিবরণ অতি সামান্য, তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের কম প্রয়োজনীয় অভ্যাসের বিশদ বিবরণ, দীনের গুরুত্বহীন ব্যাপারগুলোর অবিশ্বাস্য বিশ্লেষণ। জনসাধারণের মনে দীন সম্বন্ধে আকিদা বদলে যেয়ে ঐ রকম হয়ে গেল। ফলে আজ এ জাতির সামনে মহানবীর প্রসঙ্গ আসলেই তাদের কল্পনায় একটি দৃশ্য ভেসে ওঠে যে, একজন পক্ককেশধারী দীর্ঘ শশ্রুমণ্ডিত বৃদ্ধ মানুষ, পরনে আরবীয় আলখেল্লা, মাথায় পাগড়ি, হাতে Zmex্n, bZg¯কে যেকর করতে করতে পথ চলেছেন, ডানে বাঁয়ে দৃকপাত করছেন না, কারও সাথে সাক্ষাৎ হলে নানা প্রকার সদুপদেশ দিচ্ছেন। ঠিক অন্যান্য ধর্মের অনুসারীরা বিভিন্ন নাটকে সিনেমায় উপন্যাসে তাদের নবী ও ধর্মপ্রচারকদেরকে যেভাবে চিত্রিত করে থাকে (যদিও তাঁরা বাস্তবে বর্তমান অনুসারীদের ধারণার ন্যায় ছিলেন না), এই বিকৃত ইসলামের অনুসারীরাও আমাদের নবীকে তেমন মনে করে। কিন্তু এরা কি একবারের জন্যও ভাবতে পারে যে, এরা যাঁর উম্মাহ হিসাবে নিজেদেরকে বিশ্বাস করে (অর্থাৎ আখেরী

নবী) তিনি ছিলেন মানবজাতির ইতিহাসের সবচাইতে বড় বিপ্লবী, যিনি ইতিহাসের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিলেন। যাঁর হাতে গড়া মৃত্যুভয়হীন দুর্ধর্ষ সৈন্যরা পৃথিবীর তৎকালীন দুইটি বিশ্বশক্তিকে (Super Power) একসঙ্গে ভেঙে চুরমার করে দিয়েছিলেন। যিনি যুদ্ধের সাজে সজ্জিত হয়ে নাঙ্গা জুলফিকার হাতে তেজস্বী আরবীয় অশ্বে চড়ে প্রচণ্ড টর্নেডোর গতিতে ঝাঁপিয়ে পড়তেন সহস্র সুশিক্ষিত কাফের সেনাব্যূহে। কাফেরের ব্যূহ লণ্ডভণ্ড করে শত্রুকে আহত ও নিহত করে ছিনিয়ে আনতেন বিজয়। যিনি যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে কন্যা ফাতেমার হাতে যুদ্ধে ব্যবহৃত রক্তমাখা তলোয়ার তুলে দিয়ে বলেছেন, "এই তলোয়ার আজ খুব কাজে এসেছে"। যিনি নিজ সৈন্যদের সমাবেশে নিজের তলোয়ার উর্ধ্বে তুলে উদাত্ত আহ্বান করেছেন, "কে আছে এর হক আদায় করবে?" (সেরাত ইবনে এসহাক), যিনি বলেছেন, "আমি আদিষ্ট হয়েছি মানবজাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে যে পর্যন্ bv Zviv আল্লাহকে একমাত্র এলাহ (হুকুমদাতা) হিসাবে মেনে নেয় (ইবনে ওমর থেকে বোখারী, মুসলিম), যিনি বলেছেন, "আমি যুদ্ধের নবী, আমি দয়ার নবী", যিনি বলেছেন, "আমাকে কেয়ামত পর্যন্ সকল যুগের জন্য তলোয়ার দিয়ে পাঠানো হয়েছে আর আমার রেযেক রাখা হয়েছে বল্লমের ছায়ার নিচে (মুসনাদে আহমদ), যাঁকে কাফেররা এক মাসের দূরত্ব থেকে ভয় পেতো, যাঁর অমিততেজা সাহাবীরা শত্রুর ছিন্নমস্ক এনে তাঁর সামনে পেশ করতেন, যিনি এমন এক সেনানায়ক-জীবনে কোনো যুদ্ধে পরাজিত হন নি; সেই বিস্ময়কর অপরাজেয় সেনাপতির প্রতিকৃতি আজ আর এ জাতির মানসপটে ভেসে ওঠে না। না ওঠার কারণ এদের কাছে মহানবী এখন এক অন্য মানুষ। মহানবীর প্রকৃত চরিত্র, উম্মাহর কর্মকাণ্ড একদম ভুলিয়ে দেওয়া হয়েছে, বাকিটুকু বিকৃত করা হয়েছে ফলে তারা লক্ষ্য থেকে ভ্রষ্ট হয়ে গেছে।

এই যে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে জাতি কয়েকশ' বছর কাটাল এই সময়টাতে পণ্ডিতদের ফতোয়াবাজী আর সুফিদের অন্র্মুখী সাধনা খুব জোরেসোরে চলছিল। কাজেই পচনক্রিয়াও দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছিল সমস্ জাতির দেহময়। কিন্তু ওর

মধ্যেও দলগত ও ব্যক্তিগতভাবে যাদের মনে প্রকৃত দীনের আকিদা ঠিক ছিল তারা তাদের কাজ করে যাচ্ছিলেন। কিন্তু ক্রমে ঐ পচনক্রিয়া জাতিকে এমন অবস্থায় নিয়ে এল যে এর মধ্যে আর ফতোয়াবাজী ও তসবিহ টপকানো ছাড়া cvq Avi wKQB Aewkó iBj bv| weÁvb, wPwKrmv, imvqb, AsK BZ¨vw` সর্বরকম জ্ঞান থেকে এ জাতি বঞ্চিত হয়ে এক অশিক্ষিত অন্ধ জাতিতে পরিণত হলো। অন্যদিকে জাতির স্রষ্টা বিশ্বনবী (দ.) যে সামরিক প্রেরণায় একে এমন এক দুর্ধর্ষ, অজেয় জাতিতে পরিণত করেছিলেন যার সামনে বিশ্ব শক্তিগুলো পর্যন্ত ঝড়ের মুখে শুকনো পাতার মত উড়ে গিয়েছিল, সে প্রেরণাও কর্পুরের মত উড়ে গিয়ে এক অন্তর্মুখী কাপুরুষ জাতিতে পরিণত হলো। যে বিজ্ঞানের ও প্রযুক্তির চর্চা করে, গবেষণা করে এই জাতি পৃথিবীর জ্ঞানকে সম্মুখে অগ্রসর করিয়ে দিয়েছিলেন সেই জ্ঞান এই জাতির শত্রু ইউরোপের খ্রিষ্টান জাতিগুলো লুফে নিয়ে তার চর্চা ও গবেষণা শুরু করল আর এই উম্মাহ ওসব ছেড়ে দিয়ে বিবি তালাকের মাসলা আর ফতোয়া নিয়ে মহাব্যস্ত হয়ে coj| GB D¤§vni AvnwiZ Ávb, weÁvb I chw³i wfwËi Dci wLóvb ইউরোপ তাদের প্রযুক্তির (Technology) সৌধ গড়ে তুলল এবং তুলে শক্তিমান হয়ে এই উম্মাহকে সামরিকভাবে আক্রমণ করল।

এটা ইতিহাস যে, এই আক্রমণ এই জাতি প্রতিহত করতে পারে নি এবং অল্প সময়ের মধ্যে বিরাট জাতি ইউরোপের বিভিন্ন জাতির পদানত দাসে পরিণত হয়ে যায়। ইউরোপের ছোট বড় রাষ্ট্রগুলো এই উম্মাহকে টুকরো টুকরো করে কেটে খণ্ডগুলো নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেয়। প্রতিরোধ যে হয় নি, তা নয়, হয়েছে, কিন্তু বিচ্ছিন্নভাবে। আর যে জাতির ঐক্য নেই সে জাতি শক্তিহীন, পরাজয় তার স্বাভাবিক এবং অবশ্যম্ভাবী। ফকিহ, মোফাসসের, পণ্ডিতরা পাণ্ডিত্য জাহির করতে যেয়ে নানা মাযহাব ফেরকা সৃষ্টি করে ঐক্য ধ্বংস করে দিয়েছিলেন আর সুফিরা উম্মাহর হাত থেকে তলোয়ার ছিনিয়ে নিয়ে তসবিহ ধরিয়ে দিয়েছিলেন, সংগ্রামী চরিত্রই মিটিয়ে দিয়েছিলেন। কাজেই উম্মাহ আর লড়বে কি দিয়ে ইউরোপের বিরুদ্ধে? সুতরাং যা হবার তাই হলো। যে

উম্মাহর উপর বিশ্বনবী (দ.) দায়িত্ব দিয়ে গিয়েছিলেন সংগ্রাম করে সমস্ পৃথিবীকে এই জীবনব্যবস্থার মধ্যে নিয়ে এসে মানব জাতির মধ্যে ন্যায় ও শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে, সেই জাতি তার সংগ্রামী চরিত্র হারিয়ে নিজেই অন্যের ক্রীতদাসে, গোলামে পরিণত হলো।

mdj AvZ¥`vb - e¨_ AvZ¥`vb

wiqv`j nvmvb

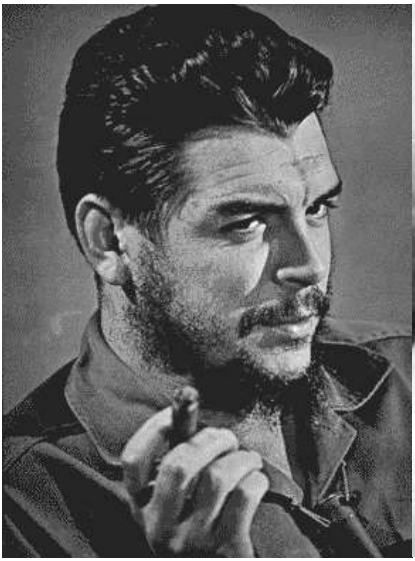

চে গুয়েভারা (Ernesto "Che" Guevara 1928–1967)

মাস্টার দা সূর্যসেন (১৮৯৪ - 1934)

বিপ্লবী আর সুবিধাবাদীদের আচরণ, দৃষ্টিভঙ্গি সবসময় আলাদা। সুবিধাবাদীদের দৃষ্টিতে বিপ্লবীদের বিচার করলে অবিচারের সম্ভাবনাই বেশি থাকে। সুবিধাবাদীদের কাছে বিপ্লবীদের কোরবানি বা ত্যাগ একটি অবোধ্য বিষয়। তারা যা কিছু করেন আত্মস্বার্থেই করেন, কিন্তু উপরে সবসময় একটা পরোপকারের মোড়ক থাকে। আন্দোলন, রাজনীতি ইত্যাদি তাদের পেশা বা ব্যবসা। এতে তারা যে টাকা ব্যয় করেন সেটা পুঁজি খাটানোর মতো, পরে লাভসহ ফেরত পাওয়ার আশাতেই করে থাকেন। লাভের গুড়ে পিঁপড়ার

ভাগও তারা দিতে রাজি নন। গণতান্ত্রিক রাজনীতির এটা বলা চলে বৈশিষ্ট্যগত প্রবণতা। পক্ষান্তরে বিপ্লবীদের দর্শন সুবিধাবাদীদের (Opportunist) চেয়ে অনেক উন্নত ও মহৎ। বিপ্লব মানে কোনো প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থাকে আমূল পরিবর্তন করা। বিপ্লব শুধুই একটি শব্দ নয়, এটি স্বপ্নসমষ্টি। আলোর দিকে, শুভর দিকে মানুষের অগ্রযাত্রার নাম বিপ্লব। বিপ্লব এসেছে যুগে যুগে কালের দাবিকে মেটাতে। এ পৃথিবীর সবচেয়ে আলোকময় শব্দ 'বিপ্লব' যার টানে জীবন দেয় হাজারো তরুণ প্রাণ। এ কাজে আত্মত্যাগ, কোরবানি অপরিহার্য, লাগবেই লাগবে। কিছু মানুষকে তাদের জীবন ও সম্পদ নিজ আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য ত্যাগ করতেই হবে। বিপ্লব ও আত্মবলিদান একে অপরের সমার্থক শব্দ, সকল বিপ্লবের রং লাল। এই চূড়ান্ত ত্যাগের বিনিময়ে বিপ্লবীরা নিজেদের পার্থিব জীবনে হয়তো কিছুই লাভ করতে পারেন না, কিন্তু মানুষের মনের মণিকোঠায় তাদের কারও কারও নাম অমর হয়ে থাকে, আবার অনেকের নাম ঢাকা পড়ে যায় বিস্মৃতির অতলে। বিপ্লবীরা এসবের দিকে দৃষ্টিপাত করেন না। কিন্তু প্রশ্ন হলো, এত কোরবানি ও Z¨\গের বিনিময়ে যে বিপ্লব সাধিত হয় সেটার সফলতা বা ব্যর্থতার মানদণ্ড কী? এখানে একটি বিষয় সুস্পষ্ট হওয়া দরকার- আত্মহত্যা ও আত্মদানের মধ্যে পার্থক্য কী? এ দু'টিতেই স্বপ্রণোদিত হয়ে ব্যক্তি প্রাণবিয়োগ ঘটালেও বিরাট পার্থক্য নিহিত থাকে উদ্দেশ্যের ভিতরে। যখন কেউ নিজের ব্যক্তিগত জীবনযন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য, ঋণের দায় থেকে বাঁচার জন্য, কোনো কাঙ্ক্ষিত বিষয় না পাওয়ার হতাশায়, নির্যাতিত হওয়ার ভয়ে, পরাজয়, অপমানের গ্লানিতে, রোগ-শোক, রাগ, দুঃখের বশবর্তী হয়ে পৃথিবী থেকে পলায়নের জন্য স্বেচ্ছায় প্রাণ বিয়োগ করে সেটা আত্মহত্যা। ইসলামে এই আত্মহত্যা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। তাছাড়া আল্লাহর দেওয়া দেহ ও আত্মার ভারসাম্যপূর্ণ জীবনব্যবস্থা অনুসরণের ফলে মানুষের জীবনে উপরোক্ত যন্ত্রণাকর পরিস্থিতি আসবেই না, এক কথায় আত্মহত্যা করার প্রয়োজন পড়বে না। পক্ষান্তরে আত্মদান হলো মানবতার কল্যাণার্থে নিজের জীবনকে

বিলিয়ে দেওয়া। এখানে ব্যক্তিগত ও পার্থিব কোনো ¯v_ _vKv m¤e bq| অর্থাৎ ব্যক্তিগত কারণে করলে আত্মহত্যা, পরার্থে করলে আত্মদান। এই আত্মদান দুই প্রকার হতে পারে- mdj AvZ¥`vb Ges e¨_ AvZ¥`vb| বিপ্লবের সফলতা ও ব্যর্থতার নিরিখেই আত্মদানের সফলতা ও ব্যর্থতা নিরূপিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। অর্থাৎ যদি বিপ্লবের কারণে সমাজের আমূল এবং Bতিবাচক পরিবর্তন সাধিত হয় তবেই সেটা সফল বিপ্লব, আর যদি সমাজ এর আগে যেমন কদর্যতা, কলুষতা, ক্রন্দন, অবিচার, ধনী ও দরিদ্রের ব্যাপক বৈষম্য, অশান্তি আর অন্যায়ে পরিপূর্ণ ছিল তেমনই থেকে যায় তবে সেই wece I AvZ¥`vb e¨_| bq wK?

"বিপ্লবী" কথাটি শোনা মাত্রই এখন আমাদের মানসচক্ষে ভেসে ওঠে সমাজতন্ত্রের মহানায়ক চে গুয়েভারা বা ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের মাস্টার দা সূর্যসেনের (১৮৯৪ - ১৯৩৪) চরিত্র। তাদের পরবর্তী প্রজন্মগুলির কাছে এরা একেকজন ক্রেজ। সেই বিপ্লবীদের চুল, দাড়ি, পোশাক-AvkvK Ggb কি তামাকের ব্র্যান্ড পর্যন্ত অনুকরণ করা হয়। ভাবাশ্রয়ী বিপ্লবীদের কাছে weশেষ করে চে এখন একটি ফ্যাশনের আইকন হয়ে দাঁড়িয়েছেন। এরা দু'জনই মানুষের অধিকার ও দেশকে স্বাধীন করার জন্য জীবন বিসর্জন করে গেছেন। সূর্যসেনকে বলা হয় আত্মত্যাগের বাতিঘর। তাদের প্রতি কোনো অমর্যাদা না করে একটি প্রশ্ন পাঠকের সামনে উপস্থাপন করতে চাই-

যে স্বপ্ন নিয়ে তারা বিপ্লবের বহ্নিশিখায় ঝাঁপ দিয়েছিলেন তাদের সেই বিপ্লব কি সফল হয়েছিল, তাদের স্বপ্নগুলো কি বাস্তবায়িত হয়েছিল?

সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সফলতা-e¨_Zv:

অতি সংক্ষেপে বলছি। রাজতন্ত্র, সামন্তবাদ, ঔপনিবেশিক গোলামি ও ধনতান্ত্রিক পুঁজিবাদের সাঁড়াশি আক্রমণ থেকে শ্রমজীবী মানুষকে মুক্তি দেওয়ার শ্লোগান তোলে কমিউনিজম। বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে শ্রেণি সংগ্রামের ইতিহাসে নতুন এক মাত্রা যোগ করে কমিউনিস্ট বিপ্লবীরা। তাদের প্রথম বড় বিপ্লবটি ঘটে রাশিয়াতে। এটাকে কমিউনিস্টপন্থীরা তাদের

সফলতার মাইলফলক মনে করেন। যেকোন বিপ্লবের প্রকৃতিই হলো এটা বিদ্যুৎবেগে ছড়িয়ে পড়ে। বিদ্রোহী কwei fvlvq:

ÒAwg kveY cveb eb¨v,

কভু ধরণীরে করি বরণীয়া, কভু বিপুল ধ্বংস ধন্যা।”

প্রশ্ন হলো: কমিউনিজমের প্লাবন কি ধরণীকে ‘বরণীয়া’ করেছিল নাকি ‘বিপুল ধ্বংসধন্যা’ করেছিল?

যে রাশিয়াকে বলা হতো “ওয়ার্কার্স প্যারাডাইস” সেই রাশিয়া হয়ে গেল biKZj¨| ïa iwkqv bq, hvivB Kমিউনিজমকে গ্রহণ করল তারাই সেই আগুনে পতিত হলো। তারা দেখতে পেল এ তো স্বাধীনতা নয়, স্বর্গসুখ নয়, বরং এত সামন্তবাদী রাজাদের শাসনের চেয়ে আরো নিকৃষ্ট, এ যেন কড়াই থেকে চুলোয় লাফ দেয়ার মত, নরক। ফলে সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠার অল্প কিছুকাল পরেই তাদের স্বপ্নভঙ্গ হলো। এই ব্যবস্থায় তাদের মতপ্রকাশের অধিকার থাকল না, ব্যক্তি স্বাধীনতা বলে কিছুই থাকল না। যার ফলে সমাজতন্ত্রের cZb NUj|

gvKm©÷-লেনিনিনিস্টদের ঐ বিপ্লব কি সফল-বিপ্লব ছিল? যে বিপ্লবের বিষক্রিয়া থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য মানুষ এভাবে পালায় সেটা যে ব্যর্থ বিপ্লব তা আশা কোরি বলে দিতে হবে না।

ভারতের স্বাধিকার আন্দোলন কতটুকু সফল?

এবার দৃষ্টি ফেরানো যাক ভারতবর্ষের দিকে। ১৯১৭ অক্টোবরের রুশ বলশেভিক বিপ্লব দিকে দিকে জ্বালিয়ে দিল বিদ্রোহের দাবানল। ভারতবর্ষে এই বিপ্লব এল স্বাধিকার আন্দোলনের রূপ ধরে। ঔপনিবেশিকতার বুটের নিচে পিষ্ট ভারতবাসী স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখল নতুন করে, দু’শো বছরের শোষণ ও ত্রাসনের বিরুদ্ধে জ্বলে উঠল বিদ্রোহের আগুন। সুকান্ত লিখলেন, “এত বিদ্রোহ কখনও দেখেনি কেউ/দিকে দিকে ওঠে অবাধ্যতার ঢেউ।” স্বাধীন হলো ভারত উপমহাদেশ। কিন্তু কি ফল পাওয়া গেল?

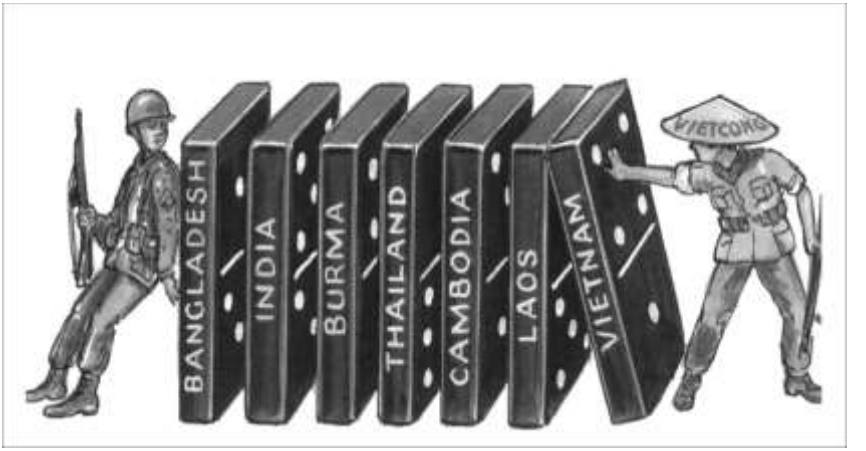

এভাবেই একদেশ থেকে অন্য দেশে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের অনুপ্রেরণা ছড়িয়ে পড়ে

সেই ভারতবর্ষ এখনও তৃতীয় বিশ্ব হিসাবে চিহ্নিত, এখনও বঞ্চনা, রেসিজম, শোষণ ও দাসত্বের শিকার। এখনও আমরা পশ্চিমাদের হুকুমের দাস। সুতরাং প্রশ্ন আসে সূর্যসেনের আত্মবলী ভারতবাসীকে প্রকৃত মুক্তি দিতে পেরেছে? প্রকৃত স্বাধীনতা দিতে পেরেছে? অর্থাৎ তাঁরা যে স্বাধীনতা বা মুক্তি চেয়েছেন সে মুক্তি হয় নি; কারণঃ ব্রিটিশ দাসত্বের যুগে ভারতে প্রতিদিন যতগুলি খুন হতো, যতগুলি ছিনতাই, রাহাজানি হতো, যতটুকু দুর্নীতি হতো, যতগুলি মেয়ে ধর্ষিত হতো, গণধর্ষিত হতো এখন কি তার চেয়ে বেশি হয় না কম হয়? এর উত্তর পাঠক খুব ভালোভাবেই জানেন। National Crime Records Bureau এর হিসাব মতে ভারতে ২০১১ সনে ২৪,২০৬ টি ধর্ষণের অভিযোগ রেজিস্ট্রিভুক্ত হয়েছে, যদিও বিশেষজ্ঞরা একমত যে, প্রকৃত সংখ্যা এই হিসাবের চেয়ে অনেক বেশি। সেদেশে প্রতি ২২ মিনিটে একটি ধর্ষণের অভিযোগ রেজিস্ট্রিভুক্ত হয়। মাত্র কিছুদিন আগেও সেখানে একটি মেডিকেল ছাত্রীকে চলন্ত বাসে গণধর্ষণের প্রসঙ্গকে কেন্দ্র করে ধর্ষণের বিরুদ্ধে একরকম গণজাগরণ সৃষ্টি হয়েছিল। পরিসংখ্যান বলে ১৯৫৩ থেকে ২০০৬ সন পর্যন্ত ভারতে খুন, অপহরণ, চুরি আর ডাকাতির হার বেড়েছে

গড়ে ২১২%। সূর্যসেন কি এই দেশ চেয়েছিলেন? অন্যায় অপরাধে পরিপূর্ণ এই অবস্থাই ভারতীয় স্বাধীকার আন্দোলনের মহান বিপ্লবীদের স্বপ্নভঙ্গের সাক্ষ্য দিচ্ছে। সুতরাং এটা বলা অসঙ্গত হবে না যে, এই কথিত স্বাধীনতার জন্য যারা যা কিছু ত্যাগ স্বীকার করেছেন তা সফল হয় নি। আলোচনার প্রথমে বলেছিলাম, কোনো বিপ্লব সফল কি ব্যর্থ তা নির্ধারণের জন্য দু'টি দিক প্রধানত বিবেচ্য। যথা- ক) বিপ্লবে আত্মদান ব্যক্তিস্বার্থে হয়েছে নাকি জাতির কল্যাণার্থে হয়েছে।

খ) বিপ্লবের ফলাফল। অর্থাৎ সেই আত্মদানে, কোরবানিতে যদি প্রকৃত মুক্তি মেলে তবেই সেটাকে সফল বিপ্লব বলে আখ্যায়িত করা যায়, সেই আত্মদানকে তখন সফল বলা যাবে এবং যাঁর নেতৃত্বে সেই বিপ্লব সাধিত হবে তিনি সফল বিপ্লবী হিসাবে পরিগণিত হবেন। এই দৃষ্টিকোণ থেকে-mdj বিপ্লবী শেষনবী মোহাম্মদ (দ.)।

সফল বিপ্লব হলো সেটাই যে বিপ্লব মানুষকে অন্যায়, অবিচার থেকে মুক্তি দিয়ে একটি সুখময় জীবন উপহার দেয়। এ অর্থে মানব ইতিহাসের সবচেয়ে সফল বিপ্লবী মহানায়ক ছিলেন আল্লাহর আখেরী নবী মোহাম্মদ (দ.)। তাঁর মাধ্যমে যে শেষ জীবন বিধান স্রষ্টা প্রেরণ করেছিলেন তা মানeRwZi একাংশ গ্রহণ ও সমষ্টিগত জীবনে কার্যকরী করার ফলে জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দু'টি অংশ অর্থাৎ নিরাপত্তা ও অর্থনীতিতে কী ফল হয়েছিল তা ইতিহাস যা এই বইয়ের "ইসলামের অর্থনীতির সফলতা এবং পুঁজিবাদ ও মার্কসীয় অর্থনীতির ব্যর্থতার নেপথ্যে" অধ্যায়ে উল্লেখ করেছি। মানবরচিত কোনো জীবনব্যবস্থাই এর একটি ভগ্নাংশও মানবজাতিকে উপহার দিতে পারে নাই। এই শান্তিময় জীবন উপহার দিতে যত মো'মেন রক্ত দিয়েছেন, সম্পদ দিয়েছেন এবং জীবন উৎসর্গ করেছেন তাদের সেই কোরবানি সফল।

সমাজবিজ্ঞানীরা বিপ্লবকে সংজ্ঞায়িত করেছেন এভাবে, Revolution is a sudden, extreme, or complete change in the way people live, work, etc. তাদের দেওয়া সংজ্ঞা মোতাবেকই যদি বিচার

কোরি তবে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বিপ্লবী আমাদের নবী। তাঁর সৃষ্ট বিপ্লবের ফলে অর্ধেক দুনিয়াতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল অনাবিল শান্তি। তিনি যে কেবল মানুষের জীবনব্যবস্থার প্রতিটি ক্ষেত্রের আমূল পরিবর্তন সাধন করেছেন তাই নয়, মানুষের আধ্যাত্মিক শূন্যতাও তিনি সম্পূর্ণরূপে দূর করেছিলেন। ইসলামের কঠোর বিরুদ্ধবাদী, মহানবীকে (দ.) প্রতারক, ভণ্ড বলে প্রমাণ করা চেষ্টায় প্রথম সারির লেখক স্যার উইলিয়াম মুরও স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন যে, "এ ব্যাপারে কোনো প্রশ্ন নেই যে ইসলাম খাঁটি একত্ববাদ এবং b্যায়বিচার ও মানবতার ওপর ভিত্তি করে যে মূল বিধান দিয়েছে তা দিয়ে যেসব নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠী মূর্তিপূজা এবং ভূতপ্রেত পিশাচ পূজায় লিপ্ত ছিল, যেমন মধ্য আফ্রিকার জনগোষ্ঠীসমূহ, তাদেরকে উপরের দিকে টেনে তোলে। আর কোনো কোনো দিকে বিশেষ করে ব্যবহার চাল-চলনের বিষয়ে এইসব জনগোষ্ঠীর ˆbwZKZvi ev¯ব উন্নতি সাধন করেছে (Mahomet and Islam, London 1895, Page 246)|

প্রখ্যাত প্রাচ্যবিদ এ জে টয়েনবি মন্তব্য করেছেন, "যদি কখনও এই এলাকাগুলোতে (মধ্য আফ্রিকা ও ইন্দোনেশিয়াতে) এখানকার স্থানীয় জনসাধারণ আধ্যাত্মিকতা দিয়ে নিজেদের পূরণ করতে সক্ষম হয়ে থাকে, তাহলে ইসলামী আদর্শই তাদের আধ্যাত্মিক শূন্যতাকে পূরণ করেছে।" (সিভিলাইজেশন অন ট্রায়াল, নিউ ইয়র্ক, ১৯৪৮, পৃষ্ঠা ২০৭-208)|

পাশ্চাত্যের চিন্তাবিদদের মধ্যে যাদের অন্তরের কিছুটা প্রসারতা আছে, সত্যের প্রতি কিছুটা শ্রদ্ধা আছে তাদের মধ্যে অনেকেই তাঁর (দ.) জীবনী পড়ে মানব জীবনের উপর তাঁর (দ.) প্রভাব দেখে বিস্ময়ে অবাক হয়ে গেছেন। এমনি অবাক বিস্ময়ে ফরাসি ইতিহাসবেত্তা লা মার্টিন লিখেছেন- "If greatness of purpose, smallness of means, and astounding results are the true criteria of human genius, who could dare

to compare any great man in modern history with Muhammad?...

“Philosopher, orator, apostle, legislator, warrior, conqueror of ideas, restorer of rational dogmas, of a cult without images; the founder of twenty terrestrial empires and of one spiritual empire, that is Muhammad. As regards all standards by which human greatness may be measured, we may well ask, is there any man greater than he?”

“যদি উদ্দেশ্যের মাহাত্ম্য, উপকরণের স্বল্পতা এবং বিস্ময়কর ফলাফল ব্যক্তি প্রতিভার মাপকাঠি হয়ে থাকে তবে আধুনিক যুগে এমন মহামানব আর কে আছে যার সঙ্গে মোহাম্মদের তুলনা করা যায়?...

`vkনিক, বাগ্মী, নবী, আইন প্রণেতা, যোদ্ধা, ধারণাকে জয় ও প্রতিষ্ঠাকারী, বিচারবুদ্ধিসহ বিশ্বাসকে পুনর্জীবনদানকারী, মূর্তিহীন ধর্মের পুনঃপ্রবর্তক, বিশটি জাগতিক সাম্রাজ্যের ও একটি আধ্যাত্মিক সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা-GB হচ্ছেন মোহাম্মদ। মানবীয় মহত্ব ও বিরাটত্ব মাপার যতগুলি মাপকাঠি আছে সেসবগুলি দিয়ে মাপলে আমরা প্রশ্ন করতে পারি- তার চেয়ে বড়, মহীয়ান আর কোনো মানুষ আছে?” [Histoire de la Turquie (1854)]| আমেরিকান জ্যোতির্বিদ, ইতিহাসবেত্তা ও গণিতশাস্ত্রবিদ মাইকেল হার্ট তার ÔThe 100” বইয়ে আদম (আ.) থেকে বর্তমান পর্যন্ত একশ’ জন মানুষের লিস্ট, তালিকা করেছেন যারা মানব জাতির উপর সবচেয়ে বেশি প্রভাব বিস্ার করেছেন। তাতে সর্বপ্রথম নাম মোহাম্মদ (দ.)। ভূমিকায় তিনি লিখেছেন, মোহাম্মদকে (দ.) এক নম্বর করায় অনেকেই পছন্দ করবেন না, কিন্তু সত্যের খাতিরে আমাকে তা করতে হয়েছে।

GUv ev¯ব সত্য যে, পাশ্চাত্য সভ্যতার ভিত্তিই রচিত হয়েছে অনেকটা Bসলাম বিদ্বেষের জমিনের উপরে। তাই পশ্চিমা দার্শনিকদের লেখায় মহানবী সম্পর্কে সঠিক মূল্যায়ন খুঁজে পাওয়া খড়ের গাদায় সুঁই খোঁজার চেয়েও কঠিন। উইকিপিডিয়াতে আধুনিক পৃথিবী বিনির্মাণে অবদান রেখেছেন এমন ২৬০ জন বিপ্লবীর নামের তালিকা দেওয়া হয়েছে, কিন্তু তার মধ্যে আমাদের bexi bvg নেই। কী নির্মম ইতিহাস বিকৃতি!

বিপ্লবের সফলতা-ব্যর্থতার আরেকটি মাপকাঠি তার মহানায়কদের প্রতি অনুসারীদের ভালোবাসা, শ্রদ্ধা এবং মতবাদের স্থায়িত্ব। এ বিচারেও আল্লাহর রসুল বিপ্লবীদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ আসনে সমাসীন। ব্রিটিশ স্পাই হ্যামফার একজন মুসলিম সেজে তুরস্কের মুসলিম সমাজের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তুলেছিলেন। মুসলিমরা তাদের নবীকে কেমন ভালোবাসে এর কিছু নিদর্শন প্রত্যক্ষ করেছেন। তিনি আহম্মদ ইফেন্দি নামে এক ভদ্রলোকের সম্পর্কে লিখতে গিয়ে বলেছেন যে, "যখন ইফেন্দি মোহাম্মদের (দ.) নাম উচ্চারণ করতেন, তার চক্ষু অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠত [Confession of British Spy]|" এটা সকলেই স্বীকার করবেন যে, নবী দুনিয়া থেকে বিদায় নেওয়ার ১৪০০ বছর পরেও মুসলিমদের সামনে যখন রসুলের জীবন আলোচিত হয় তখন তাদের চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে যায়, তারা আবেগাপ্লুত হয়ে যান। নিজ নবীর প্রতি এমন ভালোবাসার নিদর্শন অন্যান্য ধর্মের অনুসারীদের মধ্যে খুব বিরল। নেতার প্রতি ভালোবাসার আরেক রূপ প্রকাশিত হয় যখন ইসলাম-বিদ্বেষীরা তাদের চলচ্চিত্র, সাহিত্য, কার্টুন ইত্যাদির মাধ্যমে রসুলাল্লাহর অবমাননা করে থাকে। এর বিরুদ্ধে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে নবীর উম্মাহ হওয়ার দাবিদার এই জনসংখ্যা বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। যদিও তারা এখন শুধুই নামে মুসলিম, তারা ইসলামে নেই, আল্লাহর সার্বভৌমত্ব মানে না, কোর'আনের বিধান দিয়ে রাষ্ট্রীয় ও জাতীয় জীবন পরিচালনা করে না, তথাপিও রসুলের কোনো অবমাননায় তারা এখনও এতটাই উত্তেজিত হয় যে বহু লোক জীবন দিতে দ্বিধা করে না। নেতার প্রতি অনুসারীদের এই

ভালোবাসার দ্বিতীয় কোনো উদাহরণ দুনিয়াতে আছে? পক্ষান্তরে ইউরোপের যে দেশগুলি কমিউনিজমের নিষ্পেষণের শিকার হয়ে গণতন্ত্রের পথে যাত্রা করেছে তাদের প্রায় সব দেশেই বিপ্লবের মহানায়কদের প্রতিকৃতিগুলি কেবল নামিয়েই ফেলা হয় নি, সেই মূর্তির উপর সাধারণ মানুষ পদাঘাত করে ঘৃণা প্রকাশ করেছে। বিপ্লবের গৌরব এবং অগৌরব এখানেই।

[ভ.ই. লেনিনের ভাস্কর্যটি নামিয়ে তার উপর আক্রোশ মেটাচ্ছে ক্ষুব্ধ জনতা। ৫ মার্চ ১৯৯০, বুখারেস্ট।]

জোরপূর্বক শ্রমব্যবস্থাই দাসত্ব

হোসাইন মোহাম্মদ সেলিম
এমাম, হেযবুত তওহীদ

কোনো মানুষই স্বনির্ভর নয়

মানুষকে বলা হয় আশরাফুল মাখলুকাত অর্থাৎ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব। অন্যান্য প্রাণীর সঙ্গে মানুষের মৌলিক পার্থক্য হলো তার মধ্যে আল্লাহর রূহ আছে। সামাজিক জীব হিসাবে সে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে অন্যের উপর নির্ভরশীল। সৃষ্টিগতভাবেই সে কখনওই স্বনির্ভর নয়, কোনো না কোনোভাবে অন্যের Dci wbfরশীল অর্থাৎ মুখাপেক্ষী, অভাবী। আল্লাহ তায়ালা হচ্ছেন একমাত্র সামাদ অর্থাৎ অমুখাপেক্ষী। মানুষ একা একা চলতেই পারবে না। তাকে চলতে হবে সমাজবদ্ধভাবে। একটি সমাজের সব মানুষ এক রকম নয়, তাদের শারীরিক যোগ্যতা, মেধা, দক্ষতার ক্ষেত্র, পছন্দ-অপছন্দ, রুচি, মন-মানসিকতায় প্রচুর বিভিন্নতা রয়েছে। এটি মহান আল্লাহর নিখুঁত সৃষ্টি নৈপুণ্যের স্বাক্ষর। এটা যদি না থাকত তাহলে, ভালো এবং মন্দের কোনো পার্থক্য থাকত না, ন্যায় অন্যায়ের কোনো পার্থক্য থাকত না সর্বোপরি সমাজে কোনো ভারসাম্য থাকত না। আল্লাহ বলেন, "তিনিই মহান আল্লাহ, যিনি পৃথিবীতে তোমাদের প্রতিনিধি বানিয়েছেন এবং তোমাদের একজনকে আরেকজনের উপর মর্যাদা (ফদল) দিয়েছেন। উদ্দেশ্য হলো, তিনি তোমাদের যা কিছু দিয়েছেন তার মাধ্যমে তোমাদের পরীক্ষা করবেন (সুরা আন'আম : আয়াত ১৬৫)। এই পরীক্ষার ক্ষেত্র হচ্ছে এমন এক সমাজব্যবস্থা যা গড়ে উঠবে পারস্পরিক আন্তরিক সেবা-বিনিময়ের উপর ভিত্তি করে। Acর এক আয়াতে তিনি বলছেন, দুনিয়ার জীবনে এদের মধ্যে জীবন-যাপনের উপায়-উপকরণ আমি বণ্টন করেছি এবং এদের মধ্য থেকে কিছু

লোককে অপর কিছু সংখ্যক লোকের ওপর অনেক বেশি মর্যাদা দিয়েছি, যাতে এরা একে অপরের সেবা গ্রহণ করতে পার (সুরা যুখরুফ ৩২)।

অনাদিকাল থেকেই মানুষ পরস্পরের উপর নির্ভরশীল হয়ে জীবন যাপন করছে। আর সেখান থেকেই উৎপত্তি হয়েছে সেবা দান বা গ্রহণের বিষয়টি। যিনি সেবা গ্রহণ করবেন সেটি তার জন্য যেমন প্রয়োজন তেমনি যিনি সেবা প্রদান করবেন তার জন্যও দরকার। স্রষ্টার এ এক অনন্য কৌশল! এই সেবা দেয়া বা নেয়া প্রধানত দুই ভাবে হতে পারে। একটা হলো স্বেচ্ছায় বা স্বপ্রণোদিত ভাবে, আরেকটি হলো অনিচ্ছায় বা বাধ্য হয়ে। সেবা প্রদানের পেছনে বস্তুগত যে কারণ থাকে তা হলো কর্মসংস্থান, অন্ন-e¯-আশ্রয় নিয়ে বেঁচে থাকা। দরিদ্র মানুষগুলি অবস্থাসম্পন্ন মানুষদের আনুগত্যে সমর্পিত হয় মূলত এ কারণেই, কিন্তু যখন এই আনুগত্য ও কাজ করে দেওয়ার ক্ষেত্রে আত্মার সংযোগ ঘটে, তখন এই সাহায্য সহযোগিতাগুলিই কর্তব্যবোধ, মানবতাবোধ, ভালোবাসা থেকে উৎসারিত হয়ে এবাদতে পর্যবসিত হয়।

সেবা ও দাসত্ব

অনাদিকাল থেকে মানুষ প্রধানত দু'টি কারণে অন্যের সেবা করে আসছে - প্রথমত তার প্রয়োজনে এবং দ্বিতীয়টি স্রষ্টার সন্তুষ্টির আশায় এবং দায়িত্বেva, কৃতজ্ঞতাবোধ, কর্তব্যবোধ অর্থাৎ আত্মার তাগিদ থেকে। প্রথম প্রকারের সেবা ব্যাখ্যার প্রয়োজন করে না। আর দ্বিতীয় প্রকারের সেবা সে করে এসেছে দায়বদ্ধতা ও কৃতজ্ঞতা বোধ থেকে। যেমন বাবা মাকে সন্দনদের সেবা। সন্দান মনে করে সে তার মা বাবার প্রতি দায়বদ্ধ। তাই বাবা-মায়ের সেবা করে তাদের সেই ঋণ শোধ করার চেষ্টা করতে হবে, এতে বাবা মা খুশি হবেন, তাদের আশীর্বাদে আল্লাহ সন্দানের জীবন বরকতমণ্ডিত করবেন। evev-মা সন্দানকে তিলে তিলে বড় করে তোলেন, যখন তাঁরা বার্ধক্যে উপনীত হয় তখন সর্বদিকে দুর্বল হয়ে পড়েন, সে সময় সন্দানের দায়িত্ব ও কর্তব্য হলো বাবা-মায়ের সার্বিক তত্ত্বাবধান, সেবা ও সহযোগিতা করা। এটা মানবজাতির জীবনের একটি চলমান প্রক্রিয়া। মানুষ কেবল যে তার বাবা-

মায়ের কাছেই ঋণী তা নয়, সে তার জীবনে বহু বিষয়ের জন্য বহুজনের কাছে ঋণের জালে আবদ্ধ থাকে। যেমন শিক্ষাগুরু, যার কাছে মানুষ আধ্যাত্মিক ও বৈষয়িক শিক্ষা নিয়ে থাকে তাকে সেবা করা মানবসমাজের একটি চির˜b welq wQj hv GLb cvq wejxqgvb| AwZ!K `vqe×Zv, ভালোবাসা ও কৃতজ্ঞতা থেকে মানুষ মানুষকে এমন সেবা করেছে যা মহত্ত্ব ও উচ্চতায় কখনও কখনও আকাশকেও ছাড়িয়ে গেছে। সেবা করতে গিয়ে জীবন বিলিয়ে দেওয়ার অসংখ্য উদাহরণও সবার জানা আছে কিন্তু সেগুলি বর্তমানে কেবলই ইতিহাস।

জাগতিক প্রয়োজন ও আত্মিক প্রেরণা - এ দু'টির ভারসাম্য বজায় রেখে মানবসমাজে সেবার আদান-প্রদানই ছিল প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর দেওয়া জীবনব্যবস্থার শিক্ষা। কিন্তু মানুষ যুগে যুগে আল্লাহর দেওয়া শিক্ষাকে ভুলে গিয়ে এই ভারসাম্যকে নষ্ট করেছে। ইবলিসের প্ররোচনায় সমাজের একটি শ্রেণি রাজশক্তি, ক্ষমতা, পেশীশক্তি, অর্থ-weË, cfve-প্রতিপত্তির মালিক হয়ে; দরিদ্র, কমজোর মানুষকে জোর করে বাধ্য করতে আরম্ভ করেছে তাদের সেবা করার জন্য। জোর করে কাজ করানোর প্রক্রিয়া যখন আরম্ভ হলো ঠিক তখনই ভারসাম্য হারিয়ে গেল, সেবক হয়ে গেল দাস বা গোলাম (Slave), আর সেবা (Service) হয়ে গেল দাসত্ব (Slavery)। মানুষের হৃদয় থেকে আল্লাহর উপস্থিতি চলে গিয়ে তাদের মধ্যে যখন ইবলিসের প্রভাব বেশি ক্রিয়াশীল হলো, তখন তাদের মধ্যে এই ধারণা বাসা বাঁধল যে, অভাবী মানুষগুলি দাস হিসেবে তাদের সেবা করতে বাধ্য। আর তারা ভোগ বিলাসে অলস জীবন যাপন শুরু করল, আর এভাবেই সমাজে সৃষ্টি হলো দাস প্রথার। এই ভারসাম্যহীনতা কখনও কখনও এমন পর্যায়ে পৌঁছে গেল যে ঐ দাসদেরকে আর মানুষ বলেই মনে করা হতো না। তাদের ইচ্ছা অনিচ্ছার কোনো রকম মূল্যই ছিল না, তাদেরকে পণ্যের মত হাটে-বাজারে কেনা বেচা করা হতো, তাদেরকে দিয়ে কাজ আদায়ের জন্য নির্মমভাবে নির্যাতন করা হতো, এমনকি তাদেরকে হত্যা করাও অপরাধ হিসাবে গণ্য হতো না। ঐ

নিষ্পেষিত মানুষগুলি যেন ঐ প্রভুরূপী মানুষদের শ্রম দিতে বাধ্য হয় সেজন্য তাদের জমিজমা, বিষয় সম্পত্তি সবকিছু কেড়ে নেওয়া হতো। ফলে নিরুপায় হয়ে তারা বংশ পরম্পরায় প্রভুরূপী মানুষের শ্রমদাসত্ব স্বীকার করে নিত। আদম (আ.) থেকে শুরু করে শেষ নবী (দ.) পর্যন্ত আল্লাহ যুগে যুগে যে দীন পাঠিয়েছেন তার মূল রূপ চিরকালই ছিল অনন্য ভারসাম্যপূর্ণ। এই ভারসাম্য নষ্ট করে আত্মা হারিয়ে ফেলার কারণেই সমাজের যাবতীয় অন্যায় অশান্তি সূত্রপাত হয়েছে। শুধু দাস প্রথাই নয়, ভারসাম্যহীনতা থেকেই সৃষ্টি হয়েছে মানবজাতির সবচেয়ে বড় শত্রু, সবচেয়ে বড় ফেতনা- ইহুদি খ্রিস্টান বস্তুবাদী 'সভ্যতা' দাজ্জালের।

আরবের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে ইসলামের নবযুগ সূচনা

দাস হিসেবে মানুষ বেচা-কেনা মানবসমাজের একটি প্রাচীনতম ব্যবসা। আল্লাহর শেষ রসুল যখন আবির্ভূত হলেন তখনও আরবের একটি বড় ব্যবসা ছিল দাস ব্যবসা। আফ্রিকার বিভিন্ন দেশ থেকে কৃষ্ণাঙ্গদেরকে বন্দী করে, জাহাজ ভর্তি করে সারা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে তাদেরকে বিক্রি করা হতো। কেবল আফ্রিকান কৃষ্ণাঙ্গই নয়, যুদ্ধবন্দীদেরকেও দাসদাসী হিসাবে বিক্রি করে দেওয়া হতো হরদম। যেহেতু বিভিন্ন দেশের বাণিজ্য কাফেলাকে মক্কার উপর দিয়ে যেতে হতো তাই মক্কাও ছিল দাসব্যবসার একটি বড় কেন্দ্র। এই দাসদের দুঃখ দুর্দশা যে কি অবর্ণনীয় তা বর্ণনা করে হাজার হাজার বই লেখা হয়েছে। আমরা সেদিকে যাচ্ছি না, শুধু এটুকু বললেই যথেষ্ট হবে, যে সমাজে সেবাকে দাসত্বে রূপান্তরিত করা হয় সেই সমাজ একটা জাহান্নাম, অপরদিকে যে সমাজে মানুষ পরস্পরকে ভালোবেসে সেবা করে যায়, অন্যকে সাহায্য করে, দান করে, খাইয়ে নিজেদেরকে ধন্য মনে করে সেটাই হচ্ছে প্রকৃত ইসলামের সমাজ। সুতরাং ইসলামের সমাজব্যবস্থাই প্রকৃতপক্ষে সেবাভিত্তিক, আর বর্তমানে দাজ্জালের তৈরি সিস্টেমের মাধ্যমে জোর করে শ্রম আদায় করার ভিত্তিতে যে ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে সেটাই হচ্ছে প্রকৃত দাসভিত্তিক সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা।

cgvY: আল্লাহর রসুলের স্ত্রী আম্মা খাদিজা (রা.) খুব ধনাঢ্য ছিলেন। জাহেলি যুগে তিনি আরবের বাজার থেকে একটি দাস কিনেছিলেন, যার নাম ছিল যায়েদ ইবনে হারিসা। হুজুর পাক (দ.) এর সাথে বিয়ের পর তিনি যায়েদকে (রা.) স্বামীর সেবায় নিয়োগ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে রসুলাল্লাহ (দ.) যায়েদকে Avhv` করে দিলেন। কিন্তু যায়েদ (রা.) রসুলাল্লাহর সঙ্গ ত্যাগ করতে রাজি হলেন না। মহানবী (দ.) তখনও নবী হন নি। যায়েদের (রা.) বাবা চাচারা তাকে খুঁজতে খুঁজতে মহানবীর (দ.) কাছে আসলেন। মোহাম্মদ (দ.) বললেন, 'সে তো এখন মুক্ত, আপনারা তাকে নিয়ে যেতে পারেন।' কিন্তু যায়েদ (রা.) বললেন উল্টো কথা। তিনি বাবা চাচা কে বললেন, 'আপনারা ফিরে যান, আমি যাবো না। আমি তাঁর কাছেই থাকতে চাই।' সহজেই অনুমেয় যে যায়েদ (রা.) এর আচরণ কোনো দাসের আচরণ ছিল না। প্রকৃতপক্ষে তিনি মহানবীর (দ.) আচরণে ও ব্যবহারে এতটাই মুগ্ধ ছিলেন এবং নবী হিসাবে তাঁর প্রতি ঈমান এতই নিখাঁদ ছিল যে, জীবনের শেষ দিন পর্যন্ মহানবীর (স.) সাথে ছায়ার মত অনুবর্তী ছিলেন।

আনাস (রা.) যখন বালক ছিলেন তখন তাঁর মা ছেলেকে এই বলে রসুলাল্লাহর (দ.) কাছে তুলে দিলেন যে, 'ইয়া রসুলাল্লাহ! ও আপনার কাছে থাকবে এবং আপনার সেবা করবে।' এমন কথা কি কেউ কোনোদিন শুনেQ যে, একজন মা তার সন্তানকে এনে কারও দাসত্বে নিযুক্ত করেছে? ইতিহাস কখনো বলে না যে আনাস (রা.) রসুলাল্লাহর (দ.) দাস ছিলেন, বলা হয় খাদেম। খাদেম মানেই সেবক। আনাস (রা.) জীবনের একটা পর্যায়ে এসে ধনে, জনে, জ্ঞানে এত সমৃদ্ধ হলেন মানুষ দূর দূরান্ থেকে তাঁর কাছ থেকে imjvjvহর (দ.) জীবন সম্পর্কে, ইসলাম সম্পর্কে শিক্ষা গ্রহণ করতে আসত। তিনি রসুলাল্লাহর (দ.) জুতাগুলো পর্যন্ পরম শ্রদ্ধায় পরিষ্কার করে দিতেন যা ছিল প্রকৃত সেবা, দাসত্ব নয়। এরপরে ওমর (রা.) এর উদাহরণ আছে যা অকল্পনীয়। মদীনা থেকে যেরুজালেম প্রায় ১৩০০ কিলোমিটার পথ যার অধিকাংশই ছিল মরুভূমি। এই দীর্ঘ পথযাত্রায় ওমরের (রা.) সঙ্গী

ছিলেন একজন ব্যক্তি যাকে ইতিহাসে দাস বলে উল্লেখ করা হয়। কিন্তু এ কেমন দাস ছিলেন যাকে মনিব উটের পিঠে উঠিয়ে উটের রশি ধোরে উত্তপ্ত মরুর বালুকারাশির উপর দিয়ে পথ চলেন? আল্লাহর রসুল বলেছিলেন, 'তোমাদের অধীনস্থরা তোমাদের ভাই'। ইসলাম যে দাসকে ভাইয়ের মর্যাদা প্রদান করেছে তার উত্তম উদাহরণ হলো দ্বিতীয় খলিফার এই ইতিহাস। তাই দাস শব্দটি ইসলামের ক্ষেত্রে মোটেই প্রযোজ্য নয়। ইসলামে কোনো দাস দাসীর কোনো ব্যবস্থা নাই। ইসলামের আইন হলো, জোরপূর্বক কাউকে কোনো কাজে বাধ্য করা যাবে না, বাধ্য করলে সে দণ্ডিত হবে। আল্লwn হচ্ছেন মালেকুল মুলক, রাজ্য-সাম্রাজ্যের মালিক, মালিকিন্নাস (মানুষের প্রভু), মা'বুদ (যার দাসত্ব করতে হয়), একমাত্র রাব্বুল আলামীন (সৃষ্টি জাহানের একচ্ছত্র প্রভু)। সুতরাং কোনো মানুষ প্রকৃত অর্থে যেমনি কখনও কারও প্রভু ev gwjK (Master, Lord) হতে পারে না, তেমনি কেউ কারও দাস ev গোলামও (Slave, Servant) হতে পারে না। কেবল সেবক, অনুচর, mvnvh¨Kvix, KgPvix (Attendant, Helper, Employee) হতে পারে। এবং সেই সেবক বা অনুচরদের সম্পর্কেই রসুলাল্লাহ বলেছেন, 'তোমরা যা খাও তাদের কে তাই খাওয়াবে, তোমরা যা পরো তাদের কে তাই পরাবে, অসুস্থ হলে তাদেরকে সেবা করবে।' হুজুরের এই কথাগুলি নিছক উপদেশ ছিল না, এগুলি ছিল উম্মাহর প্রতি তাঁর হুকুম। এবং সকল আসহাবগণ রসুলের এই হুকুম অক্ষরে অক্ষরে পালন করে গিয়েছেন। রসুলাল্লাহর শিক্ষাপ্রাপ্ত উম্মতে মোহাম্মদীর কেউ কোনো সেবককে নির্যাতন করেছেন এমন একটি দৃষ্টান্ও ইতিহাসে পাওয়া যাবে না। একRb e¨w³i অধীনে একজন সেবক কাজ করবে কি করবে না, তা সিদ্ধান্ নেওয়ার পূর্ণ স্বাধীনতা তার থাকত। কোনো সেবক তার মালিকের দ্বারা নির্যাতিত হয়ে শাসকের কাছে নালিশ জানালে ন্যায়বিচার পেত। খলিফা ওমরের (রা.) একজন খ্রিস্টান সেবক ছিল যে বহু বছর খলিফার সঙ্গে ছিল কিন্তু ইসলাম

গ্রহণ করে নি। তাকে খলিফা নিজে বহুবার ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানিয়েছেন কিন্তু সে তার ধর্ম পরিবর্তন করে না। সুতরাং ইসলামে সেবকদের ধর্মীয় স্বাধীনতাও ছিল অবারিত।

অপরদিকে পৃথিবীতে যখনই বৈষয়িক উদ্দেশ্য ও মানবিকতার ভারসাম্য নষ্ট হয়েছে তখনই মানুষ নিজেকে মালিক, প্রভু আর অধীনস্থদের দাস মনে করেছে। এগুলো একদিনে হয় নি, আস্তে আস্তে ক্রমান্বয়ে অসম্ভব এক নির্যাতনের দিকে পৌঁছেছে। যখন মানুষ ভেবেছে যে, আমি সকল জবাবদিহিতার উর্ধ্বে, বিধানের উর্ধ্বে, তখন সে চরম স্পর্ধায় নিজেই প্রভু হয়ে দাঁড়িয়েছে, তখনই সে তার অধীনস্থদের গলায় শিকল লাগিয়ে, চামড়া পুড়িয়ে মার্কা দিয়ে, কথায় কথায় চাবুক পেটা করে, নাক কেঁটে, বস্ত্রহীন রেখে, দিনের পর দিন অনাহারে রেখে পশুর খোয়াড়ে বাস করতে বাধ্য করেছে।

ইসলাম দাস প্রথাকে বিলুপ্ত করেছে

ইসলামবিদ্বেষীরা ইসলামের উপর যে অপবাদগুলি আরোপ করে থাকে তার মধ্যে একটি বড় অপবাদ হচ্ছে, ইসলামে নাকি দাসপ্রথাকে উৎসাহিত করা হয়েছে, এখানে যুদ্ধবন্দীদের ক্রীতদাসরূপে এবং যুদ্ধবন্দিনীদের যৌনদাসীরূপে ব্যবহার করা যায়। এই ধারণাটি এত সর্বব্যাপী যে ইসলামের আলেমরাও এই ধারণাকেই অনেকাংশে মেনে নিয়েছেন, তারা বিষয়টি অস্বীকার করতে পারেন না কারণ ইসলাম-বিদ্বেষীরা পবিত্র কোর'আনের বেশ কিছু আয়াত তাদের বক্তব্যের পক্ষে উল্লেখ করেন এবং দেখিয়ে দেন যে, সত্যিই ইসলামে দাসপ্রথা আছে এবং 'গনিমত হিসাবে প্রাপ্ত দাসীদেরকে' উপপত্নীরূপে ব্যবহার করার অনুমতিও রয়েছে। তাদের এইসব যুক্তির উপযুক্ত জবাব দিতে ব্যর্থ আলেমরা ইসলামের অবমাননায় ক্ষুণ্ন হয়ে দুর্বল কণ্ঠে বলার চেষ্টা করেন যে, হ্যাঁ, দাসপ্রথা আছে বটে, কিন্তু তাদেরকে যে অধিকার দেওয়া হয়েছে সেগুলি আইয়ামে জাহেলিয়াতের চেয়ে অনেক বেশি। আসলে বিষয়টি তা নয়, প্রকৃত সত্য হলো, ইসলামে জোরপূর্বক শ্রমব্যবস্থা বা

দাস ব্যবস্থাই নেই, তাই দাসদের অধিকার দেওয়ার প্রসঙ্গও আসে না। অধিকার দেওয়ার কথা সেবকদের, দাসদের তো মুক্ত করেই দিতে বলা হয়েছে। আমরা এই ভুল ধারণাটি ভেঙ্গে দিয়ে এ প্রসঙ্গে প্রকৃত ইসলামের সঠিক দৃষ্টিভঙ্গিটি তুলে ধোরতে চাই। প্রচলিত কোর'আনে এ প্রসঙ্গে আল্লাহ কয়েকটি পরিভাষা ব্যবহার করেছেন। ইসলামিক ফাউন্ডেশনের আরবি-evsjv অভিধান মোতাবেক সেই পরিভাষাগুলির সঠিক অর্থগুলি এখানে দেয়া হলো।

(1) ivKvevZ: µxতদাস, ঘাড়ে দড়ি বাঁধা (১০৪৭ পৃঃ ১ম খণ্ড) সুতরাং সরল অর্থে রাকাবাত হচ্ছে ক্রীতদাস যার কোনো স্বাধীনতা থাকে না। তাকে জোরপূর্ব কাজে লাগানো হয়, বা এমন ব্যবস্থা কায়েম করা হয় যে, সে ইচ্ছার বিরুদ্ধে দাসত্বের শৃঙ্খল পরতে বাধ্য হয়।

(2) gvjvKvZ Avqgvb: মালাকাত অর্থঃ মানুষের ভিতরগত গুণ বা যোগ্যতা, প্রতিভা, আমি তার পূর্ণ মালিক (৮৪২ পৃঃ ২য় খণ্ড), আর আয়মান অর্থঃ ডানদিক, সৌভাগ্য, শক্তি, সামর্থ্য (১১০১ পৃঃ ২য় খণ্ড)। সুতরাং মালাকাত আয়মান অর্থ যারা ন্যায়সঙ্গতভাবে, স্বপ্রণোদিত হয়ে নিজেদের ভিতরকার গুণ, যোগ্যতা, প্রতিভা সবকিছু সহকারে সামর্থ্যবানের অধিকারভুক্ত হq| অনুবাদকরা কেউ কেউ একে অনুবাদ করেছেন, 'তোমাদের ডান হস্ত যাদেরকে অধিকার করিয়াছে'। এই অনুবাদ পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করে না, স্বেচ্ছায় আনুগত্য স্বীকারের ধারণাটি এতে অনুপস্থিত থাকে।

(3) Ave`: দাস, ক্রীতদাস, গোলাম, উপাসক, সেবক, বান্দা, চাকর, দাসত্বে wbôvevb `vm, hvi wcZvgাতাও দাস, বংশগত চাকর, নির্ভেজাল চাকর। এই শব্দটি আল্লাহ মানুষের ক্ষেত্রে বহুবার ব্যবহার করেছেন।

(4) AvgvZ: `vmx, ewv`, cwiPwiKv|

বিস্ময়কর বিষয় হলো, কোর'আনের অনুবাদকরা আল্লাহর ব্যবহৃত এই সবগুলি শব্দেরই প্রায় একই অনুবাদ করেছেন শুধুমাত্র 'দাস-`vmx'| GUv নিঃসন্দেহে ভুল অনুবাদ, কারণ সবগুলি শব্দের যদি একই অর্থ হতো, তাহলে আল্লাহ নিশ্চয়ই আলাদা আলাদা শব্দ ব্যবহার না করে একটি শব্দই ব্যবহার

করতেন। এবার কোর'আনের এ সংক্রান্ত আয়াতগুলি লক্ষ করি। এখানে ইসলামিক ফাউন্ডেশন কৃত কোর'আনের অনুবাদ উল্লেখ করা হয়েছে।

১. পূর্ব ও পশ্চিম দিকে তোমাদের মুখ ফিরানোতে কোনো পূণ্য নাই; কিন্তু পূণ্য আছে কেহ আল্লাহ, পরকাল, মালায়েকগণ, সমস্ত কেতাব এবং নবীগণে ঈমান আনয়ন করিলে এবং আল্লাহ প্রেমে আত্মীয় স্বজন, পিতৃহীন, অভাবগ্রস্ত, পর্যটক, সাহায্যপ্রার্থীগণকে এবং দাসমুক্তির জন্য অর্থ দান করিলে, সালাহ কায়েম করিলে ও যাকাত প্রধান করিলে এবং প্রতিশ্রুতি দিয়া তাহা পূর্ণ করিলে, অর্থ সংকটে, দুঃখ-ক্লেশে ও সংগ্রাম সংকটে ধৈর্য ধারণ করিলে। ইহারাই তাহারা যাহারা সত্যপরায়ণ এবং ইহারাই মোত্তাকী (বাকারা- 177)|

wk¶v: এ আয়াতে শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে রাকাবাত। যখন দাস ক্রয় বিক্রয় প্রচলিত ছিল সেই যুগে দাসদের কিনে নিয়ে মুক্ত করে দেওয়ার জন্য Avjvn এই আয়াতে মো'মেনদের উৎসাহিত করছেন। আবু বকর (রা.) সহ আরও অনেক সাহাবী কাফেরদের কাছ থেকে দাসদের ক্রয় করে নিয়ে আযাদ করে দিয়েছেন, বেলাল (রা.) ছিলেন সেই মুক্তদাসদের অন্যতম যিনি ছিলেন রসুলাল্লাহর সার্বক্ষণিক সহচর এবং যাকে রসুলাল্লাহ মোয়াজ্জেন হিসাবে সম্মানিত করেছিলেন। কাজেই যেখানে দাসদের মুক্ত করে দেওয়াকে পুণ্যের কাজ বলা হয়, সেই দাসদেরকে আবার মো'মেনদের অধীনস্থ করে রাখার কথা আল্লাহ বলতে পারেন না।

২. মোশরেক নারীকে ঈমান না আনা পর্যন্ত তোমরা বিবাহ করিও না। মোশরেক নারী তোমাদিগকে মুগ্ধ করিলেও, নিশ্চয়ই মো'মেন কৃতদাসী তাহা অপেক্ষা উত্তম। ঈমান না আনা পর্যন্ত মোশরেক পুরুষের সহিত তোমরা বিবাহ দিও না, মোশরেক পুরুষ তোমাদিগকে মুগ্ধ করিলেও, মো'মেন কৃতদাস তাহা অপেক্ষা উত্তম (বাকারা- 221)|

wk¶v: এ আয়াতে আল্লাহ 'আমাতু মো'মেনাতুন', 'আবদে মো'মেন' শব্দ দু'টি ব্যবহার করেছেন যার অর্থ মো'মেন কৃতদাসী এবং মো'মেন কৃতদাস। অনেকে তখনও রসুলাল্লাহর প্রতি ঈমান এনে মো'মেন মো'মেনা হয়েছিলেন

কিন্তু কাফেরদের দাসত্ব থেকে মুক্ত হন নি। এই সব বন্দীদের সম্মান ও মর্যাদা মোশরেকদের চেয়ে অনেক ঊর্ধ্বে। এমন কি মো'মেনদের সমাজেও hviv cwiPviK-পরিচারিকা বা সেবকের কাজ করে থাকে মোশরেক বিয়ে করা থেকে তাদেরকে বিয়ে করা উত্তম। উপরন্তু, এ আয়াতে আল্লাহ উক্ত পরিচারিকাদেরকে বিয়ে করে স্ত্রী হিসাবে গ্রহণ করার পক্ষে মত প্রকাশ করেছেন, উপপত্নি হিসাবে গ্রহণ করতে বলেন নি।

৩. তোমরা আল্লাহর এবাদত করিবে ও কোনো কিছুকে তাঁহার শরিক করিবে bv; Ges wcZv-gvZv, AvZ¥xq-¯Rb, GqvZxg, AfveM¯, wbKU-প্রতিবেশী, `i-প্রতিবেশী, সঙ্গী-সাথী, মুসাফির ও তোমাদের অধিকারভুক্ত দাস-দাসীদের প্রতি সদ্ব্যবহার করিবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ পছন্দ করেন না দাম্ভিক, অহংকারীকে (wbmv- 36)|

wk¶v: আল্লাহ এক্ষেত্রে শব্দ ব্যবহার করেছেন মালাকাত আয়মান যার অর্থ যারা স্বেচ্ছায় নিজেদের মন প্রাণ মো'মেনের সেবায় সমর্পিত করেছেন। এই ব্যক্তি আর ক্রীতদাস কি এক তাৎপর্য বহন করে? মালাকাত আয়মান তার এই সেবাকর্মে নিয়োজিত থাকা বা না থাকার ব্যাপারে পূর্ণ স্বাধীন।

৪. যাহারা নিজেদের স্ত্রীগণের সহিত জেহার (নিজের স্ত্রীকে মায়ের সঙ্গে তুলনা করা) করে এবং পরে উহাদের উক্তি প্রত্যাহার করে, তবে একে অপরকে স্পর্শ করিবার পূর্বে একটি দাস মুক্ত করিতে হইবে, ইহা দ্বারা তোমাদিগকে উপদেশ দেওয়া যাইতেছে। তোমরা যাহা কর আল্লাহ তাহার খবর রাখেন (সুরা মুজাদালা- ৩)। [আরও দেখুন সুরা বালাদ- 13, 14, miv নেসা- ৯২, সুরা মায়েদা- 89]

wk¶v: শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে রাকাবাত। নিজের স্ত্রীকে মায়ের সঙ্গে তুলনা করা একটি গর্হিত কাজ। এই কাজের জন্য আল্লাহ কাফফারা ঠিক করলেন একজন রাকাবাত বা ক্রীতদাস মুক্ত করা। পাপ স্খলনের জন্য প্রায়শ্চিত্যরূপে যে কাজটি করার নির্দেশ আল্লাহ দিচ্ছেন সেই কাজ নিঃসন্দেহে একটি পুণ্যের কাজ। অনেক সাহাবীরই জাহেলি যুগের কেনা ক্রীতদাস ছিল। আল্লাহর

অভিপ্রায় হচ্ছে পৃথিবীর সকল মানুষ হবে পরম স্বাধীন, তাই তিনি দাসমুক্তির জন্য মো'মেনদেরকে উৎসাহিত করলেন এবং মুক্তির বিভিন্ন পথ দিলেন, তার মধ্যে কাফফারা একটি। মো'মেন হত্যা করার জন্যও, বৃথা শপথের জন্য `vmg³ (ivKvevZ) Kivi weavb Avjvn দিয়েছেন।

৫. আল্লাহ জীবনোপকরণে তোমাদের কাহাকেও কাহারও উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়াছেন। যাহাদিগকে শ্রেষ্ঠত্ব দেওয়া হোইয়াছে তাহারা তাহাদের অধীনস্থ `vm-দাসীদিগকে নিজেদের জীবনোপকরণ হোইতে এমন কিছু দেয় না যাহাতে উহারা এ বিষয়ে তাহাদের সমান হইয়া যায়। তবে কি উহারা আল্লাহর নেয়ামত অস্বীকার করে? (নাহল- 71)

wk¶v: আয়াতে ব্যবহৃত "মালাকাত আয়মান" শব্দটির প্রকৃত অর্থ দাস-`vmx নয়, এর অর্থ স্বেচ্ছা-সমর্পিত সেবক। এই সেবকদেরকে দান করার ব্যাপারে কোনোরূপ কার্পণ্য যেন না করা হয় সে বিষয়ে আল্লাহ মো'মেনদেরকে এ আয়াতে সাবধান করেছেন। এমনভাবে তাদেরকে জীবনোপকরণ থেকে দান করেতে বলেছেন যেন তারাও পার্থিব সম্পদে তার মনিবের সমকক্ষ হয়ে গেলেও কার্পণ্য না করা হয়।

৬. হে মো'মেনগণ! তোমাদিগের মালিকানাধীন দাস-`vmxMY Ges তোমাদিগের মধ্যে যাহারা বয়ঃপ্রাপ্ত হয় নাই তাহারা যেন তোমাদিগের কক্ষে প্রবেশ করিতে তিন সময়ে অনুমতি গ্রহণ করে, ফজরের সালাতের পূর্বে, দ্বিপ্রহরে যখন তোমরা তোমাদিগের পোশাক খুলিয়া রাখ তখন এবং এশার সালাতের পর; এই তিন সময় তোমাদিগের গোপনীয়তার সময়। এই তিন সময় ব্যতিত অন্য সময়ে বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করিলে তোমাদিগের জন্য ও তাহাদের জন্য কোনো দোষ নাই। তোমাদিগের এককে অপরের নিকট তো যাতায়াত করিতেই হয়। এমনি করিয়া আল্লাহ তোমাদিগের নিকট তাঁহার নির্দেশ সুস্পষ্টভাবে বিবৃত করেন। তিনি সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময় (নূর- 58)|

wk¶v: মালাকাত আয়মানরাও মো'মেনদের পরিবারের অন্তf³| H wZb একান্ত গোপনীয়তার (চৎরাধপু) সময় ছাড়া সব সময় গৃহের সর্বত্র

যাতায়াতের জন্য অনুমতি আল্লাহ দিয়েছেন। এই অধিকার ক্রীতদাসদের ক্ষেত্রে কল্পনাও করা যায় না।

উল্লেখিত আয়াতগুলি থেকে এটা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত যে, ইসলামে দাসপ্রথা নেই, যেটা আছে সেটা সম্মতিপূর্বক সেবাদান। আল্লাহর দেওয়া জীবন-ব্যবস্থায় কী অপূর্ব সমন্বয়! একদিকে জাহেলি যুগে যে দাস-দাসীদেরকে জোর করে আনা হয়েছিল অর্থাৎ রাকাবাত, তাদেরকে বিভিন্ন পন্থায় মুক্ত করে দিতে বলা হয়েছে, অপরদিকে মানুষ যেহেতু মানুষের সাহায্য সহযোগিতা ছাড়া চলতে পারবে না, কাজেই যারা স্বেচ্ছায় কারও সেবা দান, শ্রমদান করার জন্য নিয়োজিত হয় (মালাকাত আয়মান), তাদেরকে এমনভাবে জীবনোপকরণ থেকে দান করতে বলা হয়েছে যেন সম্পদে, রেযেকে তার সমান হয়ে গেলেও কার্পণ্য না করা হয়। পৃথিবীর কোনো ব্যবস্থায় এমন অপূর্ব নিয়ম নেই। ক্রীতদাস আর মালাকাত আয়মানের মধ্যে আকাশ-cvZvj পার্থক্য। গলায় দড়ি পরিয়ে বাধ্য করে কাজ করানো, আরেকটি মনপ্রাণ, AvZ¥v mg¯কিছু সমর্পণ করে সেবা করা। এই দু'টি শব্দের wK GKB A_ হতে পারে? সুতরাং যারা কোর'আন অনুবাদ করেছেন তাদের অবশ্যই উচিত ছিল আল্লাহর ব্যবহৃত শব্দগুলোর প্রকৃত অর্থ দিয়ে অনুবাদ করা। তা না করে তারা উভয়টিই দাস হিসাবে অনুবাদ করেছেন। অবশ্য এর পেছনেও একটি সুগভীর কারণ রয়েছে যা বুঝতে হলে এই উম্মাহ সৃষ্টির উদ্দেশ্য সম্পর্কে mস্পষ্ট ধারণা থাকতে হবে।

কেন এই বিভ্রান্তি

হেদায়হ (সঠিক পথ নির্দেশনা) ও সত্যদীন দিয়ে আল্লাহ আখেরী নবী বিশ্বনবী মোহাম্মদ (স.) কে পাঠিয়েছেন তিনি যেন এটাকে অন্য সমস্ দ্বীনের, জীবনব্যবস্থার উপর প্রতিষ্ঠা করেন। (তওবা, ৩৩, ফাতাহ ২৮, সফ ৯)। এই হেদায়াহ হলো আল্লাহর তওহীদ, আল্লাহর সাবভৌমত্ব, লা এলাহা এল্লাল্লাহ

অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া জীবনের সর্ব অঙ্গনে অন্য কারো হুকুম না মানা। আর দ্বীনুল হক (সত্য জীবনব্যবস্থা) হলো ঐ হেদায়াহর উপর প্রতিষ্ঠিত, আইন, wewb, nvivg-হালাল, বৈধ-অবৈধ, জায়েজ-নাজায়েজ ইত্যাদি। মানব জাতির সামগ্রিক জীবনে অন্যায়, সুবিচার, এককথায় শান্তি cwZôvi Rb¨ gnvbex তাঁর আসহাবদের নিয়ে সংগ্রাম শুরু করলেন তাঁর জীবদ্দশায় সমস্ত জাজিরাতুল আরবে আল্লাহর দেওয়া সত্যদীন কায়েম হলো। তিনি এই দুনিয়া থেকে বিদায় নেওয়ার পর সংগ্রাম করে এই সত্যদীনকে মানবজীবনে প্রতিষ্ঠা করার দায়িত্ব এসে পড়ল তাঁর উম্মাহর উপর। উম্মতে মোহাম্মদী তাদের Dci AwcZ `wqZ cvjb Kivi Rb¨ A_vr Avjvni `xb cwZôvi msMvg করার লক্ষ্যে নিজেদের বাড়িঘর, সহায় সম্পত্তি, স্ত্রী-পুত্র, ক্ষেত-Lvgvi BZvw` বিসর্জন দিয়ে দুনিয়ার দিকে বেরিয়ে পড়ল। মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে অর্ধ পৃথিবীতে এই সত্যদীন প্রতিষ্ঠা করল, মোটামুটি ৬০/৭০ বছর পর্যন্ত Pjj Gক অখণ্ড জাতি হয়ে মানবজীবন থেকে সর্বরকম অন্যায়, অবিচার দূর করে ন্যায় সুবিচার অর্থাৎ শান্তি cwZôvi msMvg| Gi ciB msMvg Z¨vM Kiv হলো। দীন প্রতিষ্ঠার জেহাদ ত্যাগ করে অন্যান্য রাজা বাদশাহদের মত শান-শওকতের সঙ্গে রাজত্ব করতে আরম্ভ করল। এই সংগ্রাম- যেটা করার জন্যই এই উম্মতে মোহাম্মদীকে সৃষ্টি করা হয়েছিল এবং যা হচ্ছে রসুলাল্লাহর (দ.) প্রকৃত সুন্নাহ এবং যা ত্যাগ করলে কেউ প্রকৃত উম্মতে মোহাম্মদী থাকেন না। কিন্তু ঐতিহাসিক সত্য হলো এই যে, মহানবীর (দ.) পর ৬০/৭০ বছর পর্য্যন্ত ঐ সংগ্রাম 'জেহাদ' চলেছিল এবং তারপর তা বন্ধ করা হয় এবং উমাইয়া খলিফারা নামে খলিফা থেকেও আসলে পৃথিবীর আর দশটা রাজা-ev`kvni gZ kvb-শওকতের সঙ্গে রাজত্ব করা আরম্ভ করেন।

যখন মহানবীর আসহাবরা দুনিয়া থেকে চলে গেছেন, প্রকৃত মো'মেনরা চলে গেছেন তখন সেই আরবদের অনেকের মধ্যেই প্রাচীন জাহেলিয়াত মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল। সেই মুহূর্তে তাদের হাতে অর্ধ-`wbqv, j¶ j¶ gvbl তাদের আনুগত্য করছে। তারা আবার নিজেদেরকে ধারণা করতে শুরু

করেছিল মানুষের মালিক, প্রভু বলে। রসুলাল্লাহ যে জাহেলিয়াতের কবর দিয়েছিলেন, তারা সুযোগ পেয়েই আবার সেই জাহেলিয়াত অর্থাৎ দাসত্বব্যবস্থা, জোর করে ইচ্ছার বিরুদ্ধে মানুষকে দিয়ে কাজ করানোর ceYZv BZ¨াদি ফিরিয়ে আনল। তথাকথিত খেলাফতের সময় তাগুত রাজা-বাদশাহদের মত ভোগবিলাসে মত্ত শাসকেরা যে জাহেলি ব্যবস্থাকে কবর থেকে তুলে এনেছিল, আজও তাদের উত্তরসুরী অহঙ্কারী আরব শেখরা সমগ্র দুনিয়া থেকে শ্রমিক আমদানী করে জোর করে শ্রম আদায় করে সে ব্যবস্থাকে জিইয়ে রেখেছে। তাদের এই শ্রমদাস সরবরাহ করার জন্য তৃতীয় বিশ্বের দরিদ্র দেশগুলিতে ম্যানপাওয়ার ব্যবসা জমজমাট। উপরন্তু কোনো অপরাধ করলে এই শ্রমিকদেরকে পূর্ণ শাস্তি ভোগ করতে হয়, কিন্তু তাদের দেশের প্রভাবশালী, অর্থশালীরা একই অপরাধ করে লঘুদণ্ডে মুক্তি পেয়ে যায়। যখন কোর'আনের অনুবাদ করা শুরু হয় তখন সেই অনুবাদকদের সামনে আল্লাহ রসুলের প্রকৃত ইসলামটি নেই, আছে আরব শেখদের বিকৃত করা শিয়া, সুন্নী আর উমাইয়া আব্বাসীয় মোফাস্সেরদের ইসলাম। সেই বিকৃত ইসলামগুলিই wQj Abev`K-আলেম, মোফাসসেরদের জ্ঞানের পরিসীমা। ফলে তারা যুদ্ধবন্দী, গনিমত, রাকাবাত, মিলকুল আয়মান সব কিছুর একটি অ_B জানেন, আর সেটা হচ্ছে 'দাস-দাসী'। অবশ্য উমাইয়া, আব্বাসীয় রাজা বাদশাহরা তাদের অধীনস্থদের প্রতি আচরণের ক্ষেত্রে আল্লাহ-রসুলের বেঁধে দেওয়া সীমানা মেনে চলেন নি। তারা রসুলের জীবনাদর্শ ভুলে যান। সেই অনুবাদকেরা দয়া করে যদি একবার রসুলাল্লাহর জীবনের দিকে তাকান তবে দেখতে পাবেন, আল্লাহর রসুল এই দাসত্ব প্রথাকে নির্মূল করার জন্য আজীবন কী সংগ্রামটাই না করে গেছেন। এই সংগ্রাম কেবল যে কাফেরদের বিরুদ্ধে তা নয়, এটা ছিল বিশ্বময় প্রতিষ্ঠিত একটি সিস্টেমের বিরুদ্ধে, যা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধোরে মানুষের মন মগজে শেকর গেঁড়ে বসে ছিল। তিনি ক্রীতদাস যায়েদকে (রা.) মুক্ত করলেন। যায়েদ মুক্তি পেয়েও তাঁর সাথেই রইলেন। এরপর রসুল যায়েদকে নিজের ছেলে বলে ঘোষণা দিলেন, বললেন

যায়েদ (রা.) তাঁর সম্পদের উত্তরাধিকার। এটা ছিল কোরায়েশদের মিথ্যা আভিজাত্যের দেয়ালে এক প্রচণ্ড আঘাত। চারিদিকে ছি ছি পড়ে গেল, কী! গোলামকে ছেলে বলে ঘোষণা দিল মোহাম্মদ! রসুল বিচলিত হলেন না, নিজ সিদ্ধান্তে অটল রইলেন। এ হলো নবী হওয়ার আগের কথা। নবী হওয়ার পরে তিনি নিজ ফুফাতো বোন জয়নাবের (রা.) সঙ্গে যায়েদকে (রা.) বিয়ে দিলেন। তাদের বিয়ে টিকল না, যার অন্যতম কারণ জয়নাব (রা.) রসুলাল্লাহর ইচ্ছার প্রতি সম্মান দেখিয়ে যায়েদকে (রা.) স্বামী হিসাবে গ্রহণ করলেও তিনি যায়েদের পূর্ব পরিচয় ভুলতে পারেন নি। রসুলাল্লাহ খেয়াল করেছেন যে, তাঁর উম্মাহর মধ্যে অনেকেই যায়েদকে (রা.) তখনও ভিন্নভাবেই দেখে। এরপর রসুল চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিলেন। তিনি যায়েদকে (রা.) মু'তার যুদ্ধের সেনাপতি নিয়োগ দিলেন। তাঁর অধীনে যুদ্ধে প্রেরণ করলেন পুরো জাতিকে যার মধ্যে কোরায়েশসহ বড় বড় সম্ভ্রান্ত বংশীয় অনেক সাহাবিই ছিলেন। যায়েদকে (রা.) সেনাপতি নিয়োগ দেওয়ার পর অনেকেই সন্তুষ্টচিত্তে বিষয়টি মেনে নিতে পারল না, বিশেষ করে মোনাফেকরা জাতির ভিতরে জোর তৎপরতা চালাল যে, একজন দাসকে সকলের আমীর করা হলো? এটা কেমন কথা? এসব কথা শুনে রসুলাল্লাহ প্রচণ্ড রাগ করলেন এবং সবাইকে মসজিদে নববীতে ডেকে সাবধান করে দিলেন।

মু'তা যুদ্ধে যায়েদ (রা.) শহীদ হন। রসুলাল্লাহ তাঁর এন্তেকালের স্বল্পকাল আগে সেই যায়েদ (রা.) এর পুত্র ওসামা এবনে যায়দ এবনে হারিসাকে (রা.) wmwiqv-wdjw¯নের দারুস ও জর্দানের অন্তর্গত বালকা' সীমান্ত অঞ্চলে অভিযান পরিচালনার নির্দেশ দেন। এটা ছিল রসুলাল্লাহর জীবদ্দশায় সর্বশেষ অভিযান। প্রবীণ মোহাজেরগণের প্রায় সকলেই ওসামা (রা.) এর বাহিনীতে তালিকাভুক্ত হন। কতিপয় লোক তাঁর নেতৃত্ব সম্পর্কে বিরূপ সমালোচনা করেন। তাদের মন্তব্য ছিল, প্রবীণ আনসার ও মোহাজেরদের Dci GZ তরুণ একজনকে অধিনায়ক করা হয়েছে। তাদের মূল আপত্তি ছিল, ওসামা একজন ক্রীতদাসের পুত্র। এসব আলোচনা শুনে রসুল মাথায় পট্টি বাঁধা

অবস্থায় দু'জনের কাঁধে ভর করে মসজিদে যান এবং সকলকে ডেকে আবারও বলেন, 'হে সমবেত লোকেরা! তোমরা ওসামার যুদ্ধাভিযান কার্যকর কর। আমার জীবনের শপথ! তোমরা যদি তার নেতৃত্ব নিয়ে কথা বলে থাক, তবে এর আগে তোমরা তার পিতার নেতৃত্বের ব্যাপারে তো কথা তুলেছিলে। অথচ সে নেতৃত্বের যোগ্যই বটে, যেমন তার পিতাও এর যোগ্য ছিল। সে আমার নিকট অধিকতর পছন্দনীয়; আর তার পরে এই ওসামাও আমার নিকট অধিকতর প্রিয়।' রসুলের এই কথার পর সব গুঞ্জন থেমে যায়।

এভাবে আল্লাহর রসুল একটি প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থাকে উপর্যুপরি আঘাতে চুরমার করে দিয়ে গেছেন। বর্তমান পৃথিবী দাজ্জালের অধীন, পশ্চিমারা এখন বিজয়ী জাতি। যেহেতু বিজয়ীরাই ইতিহাস লেখে তাই যে বিজয়ীদের মধ্যে আল্লাহর ভয় নেই তাদের লেখা ইতিহাস সব সময় সত্য বলে না। এ কারণেই পাশ্চাত্য দাজ্জালি সভ্যতার অনুসারীরা আমাদেরকে শেখায় যে প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিঙ্কন ১৮৬৩ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দাস প্রথার অবসান ঘটান এবং মুক্তি ঘোষণার (Emancipation Proclamation) মাধ্যমে দাসদের চিরস্থায়ীভাবে মুক্ত করে দেন। সেই আব্রাহাম লিঙ্কনের স্বপ্নের গণতন্ত্রই আজ cজিবাদী রূপ নিয়েছে। মানবজাতির মধ্যে সৃষ্টি করেছে বিরাট ভারসাম্যহীনতা। গুটিকয়েক লোক অকল্পনীয় অর্থের মালিক হয়ে জঘন্য ভোগবিলাসে লিপ্ত, অর্থ খরচ করার পথ পাচ্ছে না। অপরদিকে বিরাট জনগোষ্ঠী বাধ্য হয়ে জীবন রক্ষার জন্য দাসত্বের অদৃশ্য শৃঙ্খল গলায় পরে আছে। এই দাসত্বের প্রধান একটি রূপ বিশ্বময় ভোগবাদী পণ্যের বাজার সৃষ্টি করার মাধ্যমে চাপিয়ে দেওয়া কর্পোরেট দাসত্ব। নিয়োগকর্তা মালিকপক্ষের অন্যায়, জুলুম, বঞ্চনার বিরুদ্ধে শ্রমিক শ্রেণির ক্ষোভ, অসন্তোষ চূড়ান্ত রূপ ধারণ করেছে। সুযোগ পেলেই সহিংসতা ও বিক্ষোভের আকারে প্রকাশ ঘটে সেই সঞ্চিত ক্ষোভের। শ্রমিকদের এই বিক্ষোভগুলিকে জোর করে দাবিয়ে রাখা হয়, পেটানো হয়, মেরে ফেলা হয়।

প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিঙ্কন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দাস প্রথার অবসান ঘোষণা করেন। সেই মার্কিনরাই এখন পৃথিবীর অন্যান্য দেশগুলিকে জোরপূর্বক নিজেদের দাসে পরিণত কোরে রেখেছে। এক বিশ্বব্যবস্থার নামে কায়েম কোরেছে নব্য `vmc_v| এর ১৪৭ বছর পর ২০০৯ সনে প্রথম অর্ধ-কৃষ্ণাঙ্গ ব্যক্তি হিসাবে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন বারাক হোসেন ওবামা। তার বিরুদ্ধে নির্বাচনপূর্ব প্রচারণায় সবচেয়ে বেশি উচ্চারিত হয়েছে তার এই অশ্বেতাঙ্গ পরিচয় যা প্রমাণ করে যে সভ্যজগৎ এখনও যথেষ্ট বর্ণবাদী। সেখানে আজও বহু কৃষ্ণাঙ্গ নির্যাতিত।

---

wKন্তু ইসলাম এর ঠিক বিপরীত। স্বেচ্ছায়, উভয়পক্ষের সম্মতিতে, সেবা প্রদানের মানসে শ্রম প্রদানই হচ্ছে ইসলামের নীতি। মানবজাতির রহমতস্বরূপ আবির্ভূত মহানবী নিজের জীবনে বাস্বে প্রয়োগ করে এবং তাঁর Abmvixivl Zv ev¯বায়ন করে কিভাবে দাসপ্রথা (জোরপূর্বক শ্রম আদায়) ব্যবস্থা চিরতরে নির্ম্মল করলেন তা আর এই জাতিকে জানতে দেওয়া হলো

না। মক্কা বিজয়ের পর ক্বাবা প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে তিনি দাসপ্রথার বিলুপ্তি ঘোষণা করেন। সেই ঐতিহাসিক ভাষণটি সংক্ষেপে তুলে ধোরছি।

মক্কা বিজয়ের পর কা'বা প্রাঙ্গণে রসুলাল্লাহর ভাষণ

হে মানুষ! আমি তোমাদেরকে হেদায়াত (পথ নির্দেশ) কোরছি যে, সেবকদের সাথে ভালো ব্যবহার করো। তাদেরকে কষ্ট দিও না। তোমরা কি অবগত নও যে, তাদের কাছেও এমন এক হৃদয় রয়েছে যা কষ্ট পেলে ব্যথিত হয় এবং আরামে খুশী হয়? তোমাদের কি হলো যে, তোমরা তাদের হৃদয়ের সন্তুষ্টি বিধান করো না? আমি লক্ষ্য কোরছি, তোমরা তাদেরকে হীন মনে করো এবং তাদের অধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করো না। এটা কি? এটা কি জাহেলিয়াতের অহঙ্কার নয়? নিঃসন্দেহে এটা যুলুম ও বে-Bbmvdx|

আমি জানি, জাহেলিয়াতের যুগে তাদের কোনো মর্যাদা ছিল না। পশুর চেয়েও তাদেরকে অধম মনে করা হতো। সর্বত্র আমীর ও গোত্র-m`vi iv m¤§vb I কর্তৃত্বের মালিক সেজে বসেছিল। আল্লাহর বান্দারা এ কথা ভুলে গিয়েছিল যে, মানুষ হিসাবে সবাই সমান এবং তোমাদের খেদমত-কারীরাও এনসাফের অধিকারী। সেটা ছিল এমন এক যুগ, যখন আমীর ওমরাহ এবং শাসকবর্গ তাদেরকে মানবীয় স্তরের ঊর্ধ্বে মনে করত। নিজেদেরকে নিষ্পাপ ঘোষণা কোরত। তাদের দৃষ্টিতে খাদেমদের জীবনের উদ্দেশ্য ছিল শুধুমাত্র মনিবদের খেদমত করা এবং তাদের যুলুম সহ্য করা। মনিবদের সাথে কাজের লোকদের বসা নিষিদ্ধ ছিল। তাদের সামনে খাদেমদের কথা বলা পাপ ছিল। মনিবদের কোনো কাজের সামান্যতম বিরুদ্ধাচারণ হত্যাযোগ্য অপরাধ ছিল। ইসলাম এ ধরণের রসম-রেওয়াজের অবসান ঘটিয়েছে এবং জাহে] অহঙ্কারকে ধূলিসাৎ করে দিয়েছে। হে মানুষ! আমি তোমাদেরকে অবহিত কোরছি যে, তোমাদের রবের ফরমান হচ্ছেঃ

'হে মানুষ! আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ ও এক নারী হতে। পরে তোমাদেরকে বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাতে তোমরা একে

অপরের সাথে পরিচিত হতে পার। তোমাদের মধ্যে আল্লাহর নিকট সে ব্যক্তি অধিক মর্যাদাসম্পন্ন যে তোমাদের মধ্যে অধিক মুত্তাকি। নিশ্চয়ই আল্লাহ সব কিছু জানেন, সমস্ খবর রাখেন।' (সুরা হুজরাত ১৩)

তোমরা জানো যে, সকল মানুষই আদমের সন্তান এবং আদম মাটির তৈরি। তাহলে অহঙ্কারের হেতু কি? মনে রাখবে, ইসলামের দৃষ্টিতে মানবতার ঊর্ধ্বে কোনো মর্যাদা নেই এবং মনিব-কাজের লোক, উচ্চ-bxP, abx-Mixe mevB সমান। ইসলামের দৃষ্টিতে যে জিনিস বৈশিষ্ট্যের দাবি করতে পারে তা হচ্ছে তাকওয়া (আল্লাহর আদেশ-নিষেধ সম্পর্কে সতর্কতা) ও আমলে সালেহ (দীন cwZôvi KvR)| GUvB hLb ev¯—v তখন কেন তোমরা তোমাদের কাজের লোকদেরকে নীচ মনে করো? আমি লক্ষ্য করেছি যে, মনিবের সাথে কোনো গোলাম কথা বলতে চাইলে রাগে মনিবের চেহারা হিংস্র প্রাণীর মতো রক্তলোলুপ হয়ে যায় এবং সে কোনোভাবেই তার ক্রোধ দমন করতে পারে না। এটা জাহেলিয়াত ছাড়া আর কি হতে পারে? এমন হতে পারে, কাজের লোক তার মনিবের চেয়ে উত্তম এবং তার আমলও আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য।

হে মানুষ! যখন হুকুমত ছিল জাহেলিয়াতের এবং নফসের পূজা তার চূড়ান্ত cfve we¯—vi করেছিল মানুষের উপর, তখন যে কী মর্মান্তিক দৃশ্যের সৃষ্টি হয়েছিল তা মানবতার দৃষ্টি কখনও ভুলতে পারে না। আমি সে যুগও দেখেছি, যখন দাসদের সাথে বর্বর আচরণ ও জুলুম করা হতো। মহাপবিত্র আল্লাহ তাদের উপর রহম করেছেন, তাদের অধিকার প্রকাশ করে দিয়েছেন এবং তাদের সাথে উত্তম ব্যবহার করার হেদায়াত করেছেন। আমি আমার রবের ফরমান মোতাবেক বলছি যে, তোমরা তাদেরকে নিজেদের ভাই মনে করো। তাদের কাছ থেকে এতটুকু কাজ আদায় করো যতটুকু তারা সহজে করতে পারে। তোমরা যা খাও তাদেরকে তা খেতে দাও। তোমরা যা পরো তাই তাদেরকে পোরতে দাও। তাদের সাথে এরূপ ব্যবহার করো যেরূপ তোমরা আপনজনের সাথে করে থাকো, তাদের জন্য তা পছন্দ করো যা তোমরা

নিজেদের জন্য করো। তাদেরকে নীচ ও তুচ্ছ মনে করো না। তোমরা যখন সফরে যাও আর তারাও তোমাদের সঙ্গে থাকে, তখন তাদের আরামের প্রতিও খেয়াল রেখো। তোমাদের সাথে সওয়ারি থাকলে কিছুক্ষণ তোমরা আরোহণ করো এবং কিছুক্ষণ তাদেরকেও আরোহণের অনুমতি দিও। মানুষ হিসেবে তারা কোনো অংশেই তোমাদের চেয়ে ছোট নয়। যেরূপ হৃদয় তোমাদের রয়েছে; সেরূপ তাদেরও রয়েছে। তোমরা কি লক্ষ্য করো নি যে, Aমি যায়েদকে আযাদ করে আমার ফুফাতো বোনের সাথে তার বিয়ে দিয়েছি এবং বেলালকে মোয়াজ্জেন নিযুক্ত করেছি এজন্য যে তারা আমার ভাই। তোমরা দেখেছ যে আনাস আমার কাছে থাকে, তাকে আমি ছোট মনে করি না। কোনো কাজ না করলেও আমি তাকে বলি না যে কেন তুমি তা করো নি। ঘটনাক্রমে তার দ্বারা কোনো ক্ষতি হয়ে গেলেও আমি তাকে কোনো ভর্ৎসনা করি না। আমি তোমাদেরকে নসিহত করছি যে, তোমাদের কোনো খাদেম যখন খাবার নিয়ে আসে তখন তাকেও তোমাদের সাথে বসানো উচিত। তারা যদি একসঙ্গে বসতে পছন্দ না করে, তাহলে তাদেরকে কিছু খাবার দিয়ে দেয়া উচিত। তোমাদের কোনো সেবক অপরাধ করে থাকলে সত্তরবার তাকে মাফ করবে–এ জন্য যে, তুমি যাঁর গোলাম, তিনি তোমার অপরাধ হাজার বার মাফ করে দেন। মনে রেখো, কোনো লোক তার গোলামের প্রতি অন্যায় অপবাদ আরোপ করলে কেয়ামতের দিন আল্লাহ তাকে কঠিন শাস্তি দিবেন। আমি পুনরায় তোমাদেরকে বলছি, তোমাদের সেবক তোমাদের ভাই। তারা বাধ্য হয়ে তোমাদের অধীন হয়েছে। তাই যার ভাই তার নিজের অধীন তার উচিত, সে নিজে যা খায় তা-ই তাকে খেতে দেয়, নিজে যা পরে তা-ই তাকে পোরতে দেয় এবং সাধ্যের বাইরে তার কাছ থেকে কোনো কাজ আদায় না করে। সালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতাল্লাহ।

আধুনিক দাসপ্রথার ভয়ঙ্কর রূপ

সম্প্রতি অস্ট্রেলিয়াভিত্তিক মানবাধিকার সংগঠন 'ওয়ার্ক ফ্রী ফাউন্ডেশন' এর পক্ষ থেকে 'দ্যা গ্লোবাল স্লেভারি ইনডেক্স ২০১৩' নামে একটি সূচক প্রকাশিত হয়েছে যেখানে দেখা যাচ্ছে এই সভ্যযুগেও তিন কোটি মানুষ শ্রম দাসত্বের শিকার। অন্যদিকে উইকিপিডিয়ার তথ্যমতে 'এন্টি-স্লেভারি ইন্টারন্যাশনাল' নামে একটি শ্রমদাস বিরোধী সংগঠন দাবী করেছে বর্তমানের এই শ্রম দাস সংখ্যা প্রায় ৪০০ বছরের ইতিহাসে আফ্রিকা থেকে আমেরিকায় আনা আফ্রিকান দাসের মোট সংখ্যাও এর প্রায় অর্ধেক। জরিপে দেখা যায়, দাসত্ব অবস্থায় সবচেয়ে বেশি সংখ্যক অর্থাৎ পৃথিবীর প্রায় অর্ধেক (১ কোটি ৪০ লাখ) লোক বাস করে ভারতে। কিন্তু দেশের জনসংখ্যা অনুপাতে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক (প্রায় ৪ ভাগ) মানুষ দাসত্ব পরিবেশে বাস করে পশ্চিম আফ্রিকার দেশ মৌরিতানিয়ায়। দ্বিতীয় অবস্থানে আছে চীন (২৯ লাখ ৪৯ হাজার ২৪৩), তৃতীয় অবস্থানে পাকিস্wb (21 jvL 27 nvRvi 132), মৌরিতানিয়ায় এ সংখ্যা মোট জনসংখ্যার শতকরা প্রায় ৪ ভাগ। আর বাংলাদেশের অবস্থান দশম। দাসত্বের শিকার হওয়া এসব মানুষকে জোর করে শ্রমদানে বাধ্য করা হয়, ঠিক যেমনটি করা হত প্রাচীন দাসযুগে। নতুন এই দাসদের দিয়ে বলপ্রয়োগ করে বিনা পারিশ্রমিকে খাটানো হয়। এটা হচ্ছে AvaywbK `vmc_vi GKwU খণ্ডচিত্র। পুরো চিত্র আরও ভয়ঙ্কর। পুরো পৃথিবীকে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বিশ্ব নামে তিনটি ভাগে ভাগ করেছে দাজ্জাল অর্থাৎ ইহুদি খ্রিষ্টান 'সভ্যতা'। তারা ঔপনিবেশিক যুগে বিশ্বের সমৃদ্ধ ও খনিজসম্পদে পূর্ণ দেশগুলিকে সামরিক শক্তিবলে, ছলে-বলে-কৌশলে পদানত করে ভ্যাম্পায়ারের মত শোষণ করে বর্তমানে সম্পদের পাহাড়ের উপরে বসে আছে। তারা যে পুঁজিবাদী অর্থনীতি দুনিয়াময় চালু করেছে সেই সিস্টেমে আজও সারা দুনিয়ার সম্পদ হাতড়ে নিজেদের কোষাগারে জড়ো করছে। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির উপরে বাধ্যতামূলক দারিদ্র্য চাপিয়ে

দিয়েছে, ফলে সে দেশগুলোর অধিকাংশ মানুষকে দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করতে হচ্ছে। তারা বেঁচে থাকার ন্যূনতম শর্ত পূরণের জন্য বাধ্য হচ্ছে নিজেদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে শ্রম দিতে। আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে চিন্ব করলে উদাহরণ হিসাবে আমরা পোশাকশিল্প খাতকে নিতে পারি। অতি অল্প বেতনে এখানে শ্রমিক নিয়োগ দেওয়া হয়। কাগজে কলমে ৮ ঘণ্টা সর্বোচ্চ কর্মঘণ্টা হলেও কেউ যদি ওভারটাইম না করে, চাকরি থাকে না। নামমাত্র বেতনে মানবেতর পরিবেশে বাস করতে তারা বাধ্য হয়। তার উপর কয়েকমাসের বেতন বকেয়া রাখা হয় যেন কেউ চাকরি ছাড়তে না পারে। এভাবে সিস্টেমের অদৃশ্য দড়ি দিয়ে ক্রীতদাস বানিয়ে রাখা হয়েছে বস্ত্রশিল্প খাতের লাখ লাখ মানুষকে। এ করুণ অবস্থাi KviY wbqg, bxwZ, c×wZi ভারসাম্যহীনতা। আজ আবার দাজ্জালের আত্মাহীন জীবনব্যবস্থায় সকল সেবাই টাকা দিয়ে কিনতে হয়। পারিবারিক পরিবেশে স্বজনদের আন্বiK সেবা একজন অসুস্থ মানুষকে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সুস্থতায় ফিরিয়ে নিতে সক্ষম। সেখানে টাকার বিনিময়ে হাসপাতালে গিয়ে চড়ামূল্যে যে সেবা কিনতে হচ্ছে তার মধ্যে আর যাই থাক আন্তরিকতা থাকতে পারে না। ফলে হাসপাতালে সুস্থ মানুষও অসুস্থ হয়ে যায়। এমনই অবস্থা সকল সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের। এছাড়াও আধুনিক শ্রমদাসদের ব্যাপারে শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোর মালিকগণ ক্ষেত্র বিশেষে নামমাত্র কিংবা বিনা পারিশ্রমিক দিয়ে যেভাবে শ্রম Av`vq করছে তাতে অধিকাংশ আধুনিক শ্রমজীবীরাই কার্যত দাস পদবাচ্য হয়ে পড়েছে। ক্রীতদাস প্রথার আধুনিক নাম দাঁড়িয়েছে আদম ব্যবসা বা ম্যানপাওয়ার বিজনেস। প্রাক-ইসলামী যুগের আরবরা আফ্রিকানদেরকে দাস হিসাবে কিনে আনত, এখন কিনে নেয় আমাদের মত স্বল্পমূল্যে আত্মবিক্রয়ে অভিলাসী তৃতীয় বিশের মানুষকে। ইসলামে একজন মালিককে তার অধীনস্থ সেবককে ঠিক সেই পরিমাণে খাবার দিতে হয় যা সে নিজে ভোগ করে, সেই মানের পোশাক দিতে হয় যা সে নিজে পরিধান করে, অসুস্থ হলে সেই গুরুত্বসহকারে চিকিৎসা দিতে হয় যা সে নিজে গ্রহণ করে|

ক্রীতদাস প্রথার আধুনিক নাম দাঁড়িয়েছে আদম ব্যবসা বা ম্যানপাওয়ার বিজনেস। cwK-ইসলামী যুগের আরবরা আফ্রিকানদেরকে দাস হিসাবে কিনে আনতো, এখন কিনে নেয় আমাদের মত স্বল্পমূল্যে আত্মবিক্রয়ে সন্তুষ্ট তৃতীয় বিশ্বের মানুষকে। সেখানে তারা উদয়াস্ত কঠিন পরিশ্রম করে। সামান্য অর্থের বিনিময়ে মান-m¤§vb I অধিকার সবকিছু বিকিয়ে দিয়েও মানবেতর পরিবেশে বসবাস করতে হয়। আর তাদের প্রভু আরবরা প্রতিদিন কোটি কোটি টাকা ফুর্তি করে ওড়ায়।

কিন্তু আধুনিক দাসদের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই সামান্য বেতন দিয়েই gwjK Zvi `vq-দায়িত্ব শেষ করে। সুতরাং ইসলামের সম্মতিপূর্বক সেবা-বিনিময় ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থার সঙ্গে আর কোনো ব্যবস্থার তুলনাই চলে না। আর বর্তমানে পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থা টিকিয়ে রাখতে দাজ্জাল যে আধুনিক দাসত্ব চালু করেছে তা ক্রীতদাস প্রথার চাইতেও করুণ এবং জঘন্য।

gw³ i c_

অতীতে যখনই এই ভারসাম্য বিনষ্ট হয়েছে, তখনই সেবক দাসে পরিণত হয়েছে, মালিকও হয়ে গেছে চরম অহঙ্কারী। অপরদিকে বছরের পর বছর, এমন কি প্রজন্মের পর প্রজন্ম দাসত্বের কারণে দাসদের মন মানসিকতায় জন্ম নিয়েছে নিদারুণ হীনম্মন্যতা ও দাস মনোবৃত্তি। কঠোর শাসন, অশিক্ষা, কুশিক্ষার মধ্যে সুবিধাবঞ্চিত জীবনযাপনের ফলে তারা জাতিগতভাবে হয়ে গেছে শিষ্টাচারবর্জিত, সৃষ্টিশীল চিন্তায় অক্ষম, সর্বোপরি অভাবের তাড়নায় নৈতিক চরিত্রহীন। মানবজাতি দু'টি ভাগে বিভক্ত- প্রভু ও গোলাম। প্রভুর সাধ্য নেই দাসের কষ্ট বোঝার, দাসের প্রতি তার অবজ্ঞামিশ্রিত ঘৃণা। দাসের সাধ্য নেই প্রভুর মন বোঝার, প্রভুর প্রতি তার ভয়মিশ্রিত ঘৃণা। ইবলিসের প্ররোচনায় তারা উভয়েই মনুষ্যত্বের সঠিক অবস্থান থেকে সরে গেছে। এখন যদি কেউ চিন্তা করে মালিক আর শ্রমিককে এক পংক্তিতে বসাবে সেটা হবে অপ্রাকৃতিক, সেটা স্বতঃস্ফূর্ত হবে না। সমাজতন্ত্র চেয়েছিল শ্রেণি বৈষম্য মিটিয়ে মালিক আর শ্রমিককে এক কাতারে আনবে যা সফল হয় নি। অতীতে দাসেরা যেভাবে প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে পালিয়েছে, সমাজতান্ত্রিক রাশিয়া, চীন, ভিয়েতনাম, কিউবা, পশ্চিম জার্মানি থেকেও মানুষ নৌকাভর্তি করে, দেশের প্রাচীর ডিঙ্গিয়ে, বেলুনে চড়ে এমন বহুভাবে পালিয়েছে। হাজারে হাজারে প্রাণ হারিয়েছে সাগরে ডুবে, মেশিনগানের গুলি খেয়ে। সুতরাং সমাজতন্ত্র পারে নি শ্রেণিহীন সমাজ গড়তে করতে এবং পারবেও না। কেন পারে নি তার চুলচেরা ব্যাখ্যায় না গিয়ে এটুকু বললেই যথেষ্ট যে, মানুষের জীবনে অর্থনীতিই সবটুকু নয়। সমাজতন্ত্র সমাজের সকল মানুষকে জোর করে

অর্থনৈতিকভাবে সমান করতে চায়, একই খাদ্যতালিকা ও একই র‍্যাশনের Lvei‌র সবাইকে খাওয়াতে চায়, সে এটা বুঝতে অক্ষম যে আল্লাহ সকল মানুষকে এক যোগ্যতা, এক মানসিকতা, একই রুচি দিয়ে সৃষ্টি করেন নি, তাদের রেজেকের মধ্যে তারতম্য আল্লাহই দিয়েছেন এবং এই তারতম্য অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত ও প্রাকৃতিক (সুরা আন'আম ১৬৫)। এই আয়াতে আল্লাহ শব্দ ব্যবহার করেছেন 'ফদল' A_r DËg, hvi Abevv` mvaviYZ Kiv nq 'শ্রেষ্ঠ', যদিও এ শব্দটি আরবী 'ফদল' শব্দের পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করে না। এই অনুবাদ থেকে মনে হতে পারে যে ইসলামে কিছু মানুষকে অন্যের উপরে শ্রেষ্ঠত্ব (Supremacy) দেওয়া হয়েছে এবং স্বভাবতই কিছু মানুষকে নিকৃষ্ট পদবাচ্য করা হয়েছে, যা একপ্রকার শ্রেণিবৈষম্যেরই প্রকাশ। গুণে, সামর্থ্যে ও দক্ষতায় প্রতিটি মানুষ এক নয়। এক লোক তার যোগ্যতাবলে মাসে দশ লক্ষ টাকা উপার্জন করতে সক্ষম, আরেকজনের যোগ্যতা হলো পাঁচ হাজার টাকা রোজগারের। এদের দু'জনকে একই মানের জীবনযাপনে বাধ্য করা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। প্রতিটি মানুষের মধ্যে একটি স্বাধীনচেতা মন আছে সমাজতন্ত্র তা স্বীকার করে না, তাই সে প্রত্যেকের উপার্জনকে জোর করে সরকারিকরণ করে। কিন্তু ইসলাম মানুষের ব্যক্তি মালিকানাকে সম্পূর্ণ স্বীকার করে।

বর্তমানে মালিক ও শ্রমিক উভয় শ্রেণির মধ্যে সংস্কৃতিগত ও চরিত্রগত যে we¯‌র ফারাক, সেই ফারাক বজায় রেখে মালিক শ্রমিককে এক কাতারে emlানো সম্ভব নয়। আগে এই ফারাক দূর করতে হবে। একটি উদাহরণ দিই। ধরুন, আপনি একইসঙ্গে একজন শিল্পপতি ও একজন শ্রমিককে নিমন্ত্রণ করেছেন। মালিক এসেছেন যথারীতি স্যুটপ্যান্ট পরে, সুগন্ধী মেখে আর শ্রমিক এসেছেন তার সাধারণ বেশে, ঘর্মাক্ত কলেবরে। আপনি তাদেরকে খেতে দিলেন মেঝেতে পাটি বিছিয়ে। শ্রমিক বসে পড়লেন। মালিক ইতস্Z করছেন তারই চাকরশ্রেণির একজন লোকের সঙ্গে বসে খেতে। তদুপরি তিনি মাটিতে বসে খেতেও অভ্যস্ত নন। শ্রমিকের সেদিকে দৃষ্টি নেই। প্লেটে ভাত বাড়াই ছিল। শ্রমিক নিজের জামায় এবং পাটিতে হাত ভালেভাবে মুছে খেতে

লেগে গেলেন। এ দৃশ্য দেখে মালিকের আর রুচি হলো না খেতে বসার। আপনি মনে মনে ভাবলেন, শ্রমিক লোকটি হাত না ধুয়েই খানা শুরু করল? সে একা খেতে শুরু না করে অন্যদের জন্য একটু অপেক্ষা করতে পারত না? বা অন্যদেরকে ডাকতে পারত না? এই সাধারণ ভদ্রতা, সৌজন্যবোধগুলি কেন শ্রমিকদের নেই?

এই দৃশ্যটি যদিও গল্প আকারে বললাম, কিন্তু ভেবে দেখুন এটাই বাস্e wK bv| kvmK-শোষিত, মালিক-শ্রমিক, বুর্জোয়া-প্রলেটারিয়েটের ব্যবধান ঘোঁচাতে প্রয়োজন এমন একটি ভারসাম্যপূর্ণ শ্রমব্যবস্থা যাতে উভয়পক্ষেরই মানসিকতা ও চরিত্রের পরিবর্তন ঘটবে। সেই জীবনব্যবস্থাই হচ্ছে আল্লাহর সত্যদীন। এই সিস্টেম প্রাকৃতিকভাবেই মালিকের মন থেকে AvZ¥¤wiZv `i করে দেবে। মানবসমাজে অর্থ, শিক্ষা, বংশ কোনো কিছুই সম্মানের মানদণ্ড হিসাবে বিবেচিত হবে না, মর্যাদার একটাই মানদণ্ড হবে যে, কে আল্লাহর wewa-নিষেধ পালনের ব্যাপারে অধিক সতর্কতা অবলম্বনকারী অর্থাৎ তাকওয়া কার বেশি। মালিক শ্রমিকের মধ্যে শ্রমিক যদি অধিক মুত্তাকী হয়, gwjK তাকে অবহেলা তো করবেই না, বরং তার প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকবে, আচরণেও সেটা প্রকাশিত হবে। সমাজের বঞ্চিত, নিগৃহীত মানুষেরাই শ্রমজীবী হয়। hM-যুগান্তরের দাসত্ব, পরাঙ্মুখতা তাদের মানবিক গুণাবলীকে বিকশিত হতে দেয় না, ফলে তারা আচার-ব্যবহার, রুচিবোধ, সংস্কৃতিবোধ, সৌন্দর্যবোধের বিচারেও অপরিশীলিত ও দরিদ্র থাকেন। অভিজাত শ্রেণির সামনে তাদের হৃদয় থাকে হীনম্মন্যতায় আচ্ছন্ন। ইসলাম এই শ্রমজীবীদেরকেও এমন একটি ব্যবস্থার মধ্যে প্রতিপালিত করবে যে, তারাও সকল বিচারে সভ্য হয়ে উঠবেন। সুতরাং প্রকৃত ইসলামের বাস্তবায়নে একদিকে শ্রমিক এমন সুশিক্ষায় শিক্ষিত হবেন যে তার মধ্যে সৌন্দর্যবোধ, রুচিশীলতা, পরিচ্ছন্নতা, শিষ্টাচার, ভদ্রতাজ্ঞান, অন্যের জন্য ত্যাগের মানসিকতা, পরোপকারিতা ইত্যাদি গুণাবলী সৃষ্টি হবে। অন্যদিকে ইসলাম মালিককে করবে নিরহঙ্কার,

শ্রমজীবী মানুষের দুঃখকষ্টের অংশীদার, তাদেরকে দাসের পরিবর্তে ভাই মনে করার উদারতা সৃষ্টি করবে।

cwðমা বস্তুবাদী 'সভ্যতা' দাজ্জালের অনুসারীদের প্রতি আমাদের কথা হলো, সাধ্য থাকলে এই ঘোষণা দিন:

(১) কেউ কাউকে সিস্টেমের ফাঁদে ফেলে যেমন: বেতন বকেয়া রেখে, বরখাস্তের ভয় দেখিয়ে জোরপূর্বক শ্রমদানে বাধ্য করবে না।

(২) ঘাম শুকানোর আগে শ্রমের ন্যায্য মূল্য পরিশোধ করতে হবে।

(3) mাধ্যের অতিরিক্ত কাজ কারও উপর চাপানো হবে না।

(৪) শ্রমিক প্রয়োজনে যেখানে খুশি, যার কাছে খুশি শ্রম ও সেবার বিনিময়ে উপার্জন করবে। এ ব্যাপারে তার উপর কোনো রকম বিধি নিষেধ আরোপ করা হবে না।

উপরোক্ত নীতিগুলি ইসলামের যা আল্লাহর রসুল বাস্বায়ন করে গেছেন। আবার প্রকৃত ইসলাম প্রতিষ্ঠা হলে উপরোক্ত নীতিমালা অক্ষরে অক্ষরে পালন করা হবে ইনশা'আল্লাহ।

সাম্যের অনন্য উদাহরণঃ

মো'মেনের সম্মান কাবার ঊর্ধ্বে

ইতঃপূর্বে দেখানো হয়েছে আল্লাহর রসুল আইয়্যামে জাহেলিয়াতের জোরপূর্বক শ্রমব্যবস্থাকে অর্থাৎ দাসত্ব ব্যবস্থাকে বিলুপ্ত করে দিয়ে কীভাবে একটা সেবাভিত্তিক সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনি কেবল মুখেই মানবতা ও সাম্যের বাণী প্রচার করেন নি, সেটাকে বাস্বায়িত করে দেখিয়েছেন। তাঁর কথv Avi KvR GK wQj | KLbI Ggb nq wb hv wZwb মুখে বলেছেন কিন্তু কাজে তা করেন নি বা অন্যটা করেছেন। তাঁর কথা আর কাজ ছিল সমান্তরাল। আমরা পূর্ববর্তী অধ্যায়ে দেখিয়েছি একদা-μxZ`vm যায়েদ বিন হারিসাকে (রা.) কীভাবে তিনি সম্মানের উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত করেছিলেন। এখন আমরা আলোচনা করব বেলাল (রা.) সম্পর্কে।

আল্লাহর দৃষ্টিতে মো'মেনদের সম্মান কত ঊর্ধ্বে হলে তিনি স্বয়ং তাঁর মালায়েকদেরকে নিয়ে মো'মেনদের উদ্দেশে সালাহ পেশ করেন বলে ঘোষণা করেন (সুরা আহযাব ৪৩)। তিনি এও বলেছেন, 'সকল সম্মান, ক্ষমতা ও গৌরবের অধিকারী তো কেবল আল্লাহ, তাঁর রসুল ও মো'মেনগণ, কিন্তু মোনাফেকরা তা জানে না' (সুরা মুনাফিকুন ৮)। আর মো'মেনদের সম্মান সম্পর্কে আল্লাহর রসুলের মূল্যায়ন আমরা বহু হাদিস ও ইতিহাস থেকে জানতে পারি। আব্দাল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, "একদিন আল্লাহর রসুল কাবার দিকে দৃষ্টিপাত করে বললেন, লা এলাহা এল্লাল্লাহ। তুমি অত্যন্ত পবিত্র এবং তোমার ঘ্রাণ অতি মিষ্ট। তুমি অতি সম্মানিত। তবে একজন মো'মেনের পদমর্যাদা ও সম্মান তোমার চেয়েও অধিক। আল্লাহ একজন মো'মেন সম্পর্কে এমনকি মন্দ-ধারণা পোষণ করাকেও হারাম করেছেন। (Zvevi wb)

অপর বর্ণনায় আবদাল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) বলেন, "আমি রসুলাল্লাহকে GKw`b Kvev তাওয়াফ করার সময় বলতে শুনেছি, 'হে কাবা! কী বিরাট

তোমার মহিমা আর কী মিষ্টি তোমার সুবাস। তুমি কত মহান আর তোমার পবিত্রতাও কত মহান! কিন্তু তাঁর শপথ যাঁর হাতে মোহাম্মদের প্রাণ, আল্লাহর দৃষ্টিতে একজন মো'মেনের পবিত্রতা তোমার পবিত্রতার চাইতেও অধিক (ইবনে মাজাহ)। আল্লাহর রসj GKw`b eû bex-রসুলের স্পর্শধন্য পবিত্র c¯র হাজরে আসওয়াদের দিকে দৃষ্টিপাত করে বলেছিলেন, "হে কালো পাথর। কসম সেই আল্লাহর যাঁর নিয়ন্ত্রণের অধীন আমার সকল অনুভূতি! একজন মো'মেনের সম্মান ও পদমর্যাদা (Rank) আল্লাহর কাছে তোমার সম্মান ও মর্যাদার চাইতেও অধিক মহিমান্বিত।" (ইবনে মাজাহ, আস-mqwZ, Av`-`vi Avj gvbmi)|

সুতরাং যে মো'মেনদের প্রতি আল্লাহ ও মালায়েকগণ সম্মিলিতভাবে সালাহ পেশ করেন, যাঁদের সম্মান কাবারও ঊর্ধ্বে তাঁদেরকে আল্লাহর রসুল বাস্বে কীভাবে সম্মানিত করেছেন সেটাই এখন দেখা যাক। যায়েদ (রা.) আর বেলাল (রা.) উভয়েই জাহেলি যুগে ক্রীতদাস ছিলেন তবে তাঁদের মধ্যে একটি বড় পার্থক্য ছিল। তা হলো, যায়েদ (রা.) কৃষ্ণাঙ্গ ছিলেন না, তিনি ছিলেন একটি সম্ভ্রান্ পরিবারের হারিয়ে যাওয়া ছেলে। আর আবিসিনয়ার কৃষ্ণাঙ্গ বেলালের (রা.) উপর মাত্রাতিরিক্ত নির্যাতনের প্রধান কারণ তাঁর হীন সামাজিক অবস্থান। অভিজাত কোরায়েশ সমাজের কাম্য ছিল যে ক্রীতদাসরা সর্বদা বোবা পশুর মতো বিনা বাক্যে কেবল হুকুম তামিল করবে আর জুলুম সহ্য করবে। তাদেরও যে হৃদয় আছে এটা তারা মনেই করত না। বেলাল (রা.) যেমন ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন তেমনি আরো অনেকেই করেছিলেন কিন্তু তাঁর মতো ক্রীতদাসদের বেলায় কোরায়েশদের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল অনেকটা এমন যে, একজন ক্রীতদাস যে কিনা নরাধম জীব, সে কেন ধর্ম নিয়ে চিন্ করবে, সে কেন নিজের ধর্মীয় পরিচয়ের ব্যাপারে সিদ্ধান্ নেবে, তার তো এসব চিন্া করারই অধিকার নেই। একজন দাস হয়ে মক্কায় বাস করে কোরায়েশদের ধর্মকে অস্বীকার করবে এবং সামাজিক-রাজনীতিক ক্ষেত্রে তাদের বিপক্ষে অবস্থান নেবে এই ইচ্ছা পোষণই ছিল তাঁর সবচেয়ে বড়

ধৃষ্টতা, তাঁর এহেন আচরণ প্রতাপশালী মালিক উমাইয়ার জন্য ছিল ভীষণ অবমাননাকর। এমন একটি সমাজে থেকেও বেলাল (রা.) নিজের পরিণতি জেনেও সত্যের জন্য জীবন কোরবান করে দিয়েছিলেন। মরুভূমির আগুনঝরা রোদে উত্তপ্ত বালু, কাঁটাগাছ ও জ্বলন্ত অঙ্গারের উপর তাঁকে শুইয়ে রাখা হয়েছে। গলায় রশি বেঁধে ছাগলের মতো দুষ্ট ছেলেপেলেরা তাকে মক্কার অলিতে গলিতে টেনে নিয়ে বেড়িয়েছে। তার সারা দেহ ক্ষতবিক্ষত রক্তাক্ত হয়ে গেছে। আবু জাহেল তাঁকে কখনো উপুড় করে, কখনো চিৎ করে শুইয়ে দিয়ে পিঠের উপর বড় বড় পাথর রেখে দিত। মধ্যাহ্ন সূর্যের পচণ্ড খরতাপে তিনি যখন অস্থির হয়ে পড়তেন, আবু জাহেল বলত, "বেলাল, এখনো মোহাম্মদের ধর্ম ত্যাগ কর্।" কিন্তু তখনো তাঁর পবিত্র মুখ থেকে 'আহাদ', 'আহাদ' অর্থাৎ তওহীদের ঘোষণা ধ্বনিত হতো।

তাঁকে শাস্দিানের ব্যাপারে উমাইয়া ইবনে খালফ ছিল সর্বাধিক উৎসাহী। সে kw¯ ও যন্ত্রণার নিZ¨-bZb Kjv-কৌশল প্রয়োগ করত। নানা রকম পদ্ধতিতে সে তাঁকে কষ্ট দিত। কখনো উটের কাঁচা চামড়ায় তাঁকে ভরে, কখনো লোহার বর্ম পরিয়ে উত্তপ্ত রোদে অভুক্ত অবস্থায় ফেলে রাখতো। একদিন 'বাতহা' উপত্যকায় তাঁর বুকের উপর পাথর চাপিয়ে রাখা হয়েছিল, এমন সময় আবু বকর (রা.) তাঁকে পাঁচ উকিয়া রৌপ্যের বিনিময়ে ক্রয় করে মুক্ত করে দিয়েছিলেন। এরপর তিনি মুসলিম উম্মাহর কর্মপ্রবাহে যোগ দিলেন। তিনি তাঁর ত্যাগ, নিষ্ঠা, আনুগত্য দ্বারা মুসলিম সমাজে একজন সম্মানিত ব্যক্তিতে পরিণত হলেন। তিনি যেমন রসুলাল্লাহর সার্বক্ষণিক সঙ্গী ছিলেন তেমনি আবু বকর (রা.) ও ওমর (রা.) এর যুগেও তিনি খলিফাদ্বয়ের অনুরোধে তাঁদের সঙ্গী হিসাবে ছিলেন। সম্ভ্রান্ত আরব পরিবারে তিনি একাধিক বিয়ে করেছিলেন। আবু বকরের (রা.) কন্যার সঙ্গে রসুলাল্লাহ নিজে তাঁর বিয়ে দিয়েছিলেন। রসুলাল্লাহ যদি বেলালকে (রা.) ভালো না বাসতেন তাহলে পৃথিবীর কোনো মানুষই বেলালকে (রা.) ভালো বাসত কিনা সন্দেহ। হেজরতের পর আব্দাল্লাহ ইবনে আব্দুর রহমান খাসয়ামীর (রা.) সঙ্গে ভ্রাতৃত্ব-

সম্পর্ক স্থাপিত হয়। তিনি ছিলেন আল্লাহর রাস্তায় সদাপ্রস্তুত আসহাবে সুফফার অন্তর্ভুক্ত। এই সাহাবিরা ছিলেন এতই দরিদ্র যা তাদের পোশাক ব্যবহারের বর্ণনা থেকে অনুমান করা যায়। আবু হুরাইরা (রা.) বলেন, আমি সত্তরজন আসহাবে সুফফাকে দেখেছি, যাদের কারো কোনো চাদর ছিল না। কারো হয়তো একটি লুঙ্গি এবং কারো একটি কম্বল ছিল। তাঁরা এটাকে নিজেদের গলায় বেঁধে রাখতেন। কারোরটা হয়তো তার পায়ের গোছার অর্ধাংশ পর্যন্ত পৌঁছতো; কারোরটা হাঁটু পর্যন্ত। লজ্জাস্থান উন্মুক্ত হওয়ার ভয়ে Zviv nvত দিয়ে তা ধরে রাখতেন (বোখারি)।

বেলাল (রা.) প্রধান প্রধান সকল যুদ্ধেই অংশ নেন। বদর যুদ্ধে তিনি উমাইয়া ইবনে খালফকে হত্যা করেন। মক্কা বিজয়ের দিন তিনি রসুলাল্লাহর সঙ্গে কাবার অভ্যন্তরে প্রবেশের সৌভাগ্য লাভ করেন। বেশ কয়েকটি কারণে মানবজাতির ইতিহাসে এ দিনটির বিশেষ মাহাত্ম্য রয়েছে। মক্কা যে রসুলকে একদিন বের করে দিয়েছিল সে মক্কা এই ক্ষণে তাঁর পায়ের তলে। চতুর্দিকে মুসলিম সেনা কাফেরদের ঘেরাও করে আছে। আল্লাহর রসুলের কৃপার উপরে আজ মক্কাবাসীর জীবন। তিনি আজ যাদেরকে জীবন ভিক্ষা দেবেন তারা বাঁচবে, যাদেরকে ঘরে থাকতে দেবেন তারা ঘরে থাকবে, যাদেরকে বাহিরে থাকতে দেবেন তারা বাহিরে থাকবে, রসুলাল্লাহ যাদেরকে আজ লোহিত সাগরে নিক্ষেপ করবেন তারা লোহিত সাগরে নিক্ষিপ্ত হবে। আজকের দিনে মক্কা নগরীতে কারো সাধ্য নেই রসুলাল্লাহর কথাকে অমান্য করে। মক্কায় আজ আল্লাহর সার্বভৌমত্বের নিরংকুশ বিজয়। আজকের এই দিন অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে নির্যাতিত, নিপীড়িত, নিগৃহীত জনতার বিজয়ের দিন, অধর্মের বিরুদ্ধে ধর্মের, অসত্যের বিরুদ্ধে সত্যের, জাহেলিয়াতের বিরুদ্ধে আলোর বিজয়ের দিন। এ দিনেই রসুলাল্লাহ কোরায়েশদের ঘৃণিত ক্রীতদাস বেলাল (রা.)-কে দিয়ে "কাবার উর্ধ্বে মো'মেনের স্থান" এ কথাটিকে বাস্e রূপ দান করেছিলেন। এ পর্যায়ে কাবার উচ্চ মর্যাদা সম্পর্কে কিছু প্রাসঙ্গিক তথ্য জানাতে হচ্ছে।

আল্লাহর ঘর বায়তুল্লাহ শরীফ সর্বপ্রথম আদম (আ.) নির্মাণ করেন বলে ঐতিহাসিকগণ মনে করে থাকেন। পরবর্তীতে এটি ৫ থেকে ১২বার পুনঃনির্মিত হয়। নুহ (আ.) এর প্লাবনের সময় বায়তুল্লাহর প্রাচীর বিনষ্ট হলেও ভিত্তি আগের মতোই থেকে যায়। পরবর্তীতে আল্লাহর হুকুমে একই ভিত্তিভূমিতে এবরাহীম (আ.) তাঁর পুত্র এসমাইল (আ.) সহকারে তা পুনঃনির্মাণ করেন। কাবা শরীফ নির্মাণের সময় এবরাহীম (আ.) কেনান থেকে মক্কায় এসে বসবাস করেন। এরই ফলশ্রুতিতে মক্কায় বসতি গড়ে উঠে। অনেক ঐতিহাসিক এও মনে করেন যে, পৃথিবীতে সর্বপ_g Avjvni নির্দেশে মালায়েকরা কাবাঘর নির্মাণ করেন। কাবাঘরকে লক্ষ্য করে মহান আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয়ই সর্বপ্রথম ঘর যা মানুষের মসজিদ হিসাবে নিরূপিত হয়েছে, তা ওই ঘর যা মক্কাতে অবস্থিত (সুরা আল-Bgivb 96)| Av`g (আ.) ও মা হাওয়ার পৃথিবীতে সাক্ষাৎ হলে তাঁরা উভয়ে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং এবাদতের জন্য একটি মসজিদ আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেন। আল্লাহ সে মতে আরশে অবস্থিত বায়তুল মামুরের আকৃতিতে পবিত্র কাবাঘর স্থাপন করেন (শোয়াব-Dj-ঈমান, হাদিসগ্রন্থ)।

এই কাবার সম্মান রক্ষা করতে গিয়ে ইয়ামেনের বাদশাহ আবরাহার হস্তি বাহিনীকে আল্লাহ মাটির সাথে মিশিয়ে দিয়েছিলেন। যে কাবাকে মুসলিম উম্মাহর হৃৎপিণ্ড বলা যায়, যা সমগ্র মানবজাতির ঐক্যের প্রতিক হিসাবে আল্লাহ নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, যে কাবাকে সামনে রেখে কেয়ামত পর্যন্ত কোটি কোটি মো'মেন মুসলিম সাজদা করেছেন এবং করবেন সেই কাবার সম্মান কী বিরাট তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। A_P Avjvni imj দ্ব্যর্থহীনভাবে বললেন যে, একজন মো'মেনের সম্মান আল্লাহর কাছে কাবারও ঊর্ধ্বে। কিন্তু কেন, কেমন করে একজন মো'মেনের সম্মান কাবারও ঊর্ধ্বে? এটা এক বিরাট প্রশ্ন। এর উত্তর হচ্ছে, মো'মেনই দুনিয়া থেকে অন্যায় অশান্তি অবিচার যুদ্ধ রক্তপাত দূর করে আল্লাহর প্রদত্ত জীবনব্যবস্থা cwZôvi মাধ্যমে মানবজীবনে ন্যায় ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা করে আল্লাহর খেলাফত প্রতিষ্ঠা

করে ইবলিসের চ্যালেঞ্জে আল্লাহকে জয়ী করে। পক্ষান্তরে কাবা একটি প্রতীকি গৃহ যা নিজের সম্মান রক্ষা করতেও সক্ষম নয়, এজন্য সে আল্লাহ এবং আল্লাহর মো'মেন বান্দাদের উপর নির্ভরশীল। এজন্যই মো'মেনের m¤§vb Kাবার উর্ধ্বে। এব্রাহীম (আ.) এর পরবর্তীতে ৩৫০০ বছরে দীনে হানিফ ব্যাপকভাবে বিকৃত হয়েছে, কাবা প্রাঙ্গণে ৩৬০টি কাঠ পাথরের দেব-দেবীর মূর্তি স্থাপিত হয়েছে, এমন কি এব্রাহীম (আ.) এর মূর্তি বানিয়ে সেটিরও পূজা করা হয়েছে, এই দীর্ঘ সময়ে পুরো আরব নোংরামি, পাপাচার, K`hZv Avi Aপবিত্রতায় লিপ্ত হয়ে গিয়েছিল। কাবা কিন্তু এ সময় আল্লাহকে জয়ী রাখতে পারে নি, এমনকি নিজের পবিত্রতাও রক্ষা করতে পারে নি। কারণ এটি সর্বোপরি জড়বস্তু, মর্যাদায় উচ্চ হলেও নিজে কিছু করতে অক্ষম। কিন্তু মহানবী ও তাঁর সঙ্গী মো'মেনরাই আল্লাহর সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করে সেই ৩৬০টি উপাস্যমূর্তি অপসারণ করে কাবার পবিত্রতা ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। কাজেই যার দ্বারা আল্লাহর এ বিজয় প্রাপ্ত হচ্ছে তার সম্মানই অধিক এ কথা বোঝার জন্য সাধারণ জ্ঞানই যথেষ্ট। সুতরাং আল্লাহর কাছে তাঁর সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে মো'মেনের সম্মান ও পবিত্রতা সকলের উর্ধ্বে।

কাবা বিজয়ের দিনে এরই স্বাক্ষর তিনি রাখলেন, মানবজাতির ইতিহাসের স্রোত উল্টো দিকে প্রবাহিত করে দিলেন। ইতিহাস বলে বেলালের (রা.) নাভির উপর থেকে কোনো কাপড় ছিল না, মাথায় পাগড়ির তো প্রশ্নই ওঠে না। শুধু লজ্জাস্থান ঢাকার মতো এক টুকরো কাপড় কোমরে প্যাঁচানো ছিলে। সেই অর্ধ উলঙ্গ বেলালকে (রা.) আল্লাহর রসুল কাবার ছাদে উঠিয়ে দিলেন (আসহাবে রসুলের জীবনকথা-১ম খণ্ড)। তারপর বেলাল (রা.) উচ্চৈঃস্বরে আল্লাহর সার্বভৌমত্বের আযান দিলেন। সেদিন বেলালের (রা.) পায়ের নিচে মহাপবিত্র বায়তুল্লাহ কাবা। আল্লাহর রসুল প্রমাণ করে দিলেন যে মো'মেনের সম্মান কাবার উর্ধ্বে। একটি প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন হচ্ছে- আল্লাহর রসুলের সঙ্গে তো আরো দশ হাজার সাহাবি ছিলেন, তাদের মধ্যে কোরায়েশ সাহাবিরও অভাব ছিল না, তা সত্ত্বেও রসুলাল্লাহ বেলালকে (রা.) কেন কাবার উপরে ওঠালেন।

প্রকৃতপক্ষে জাত্যাভিমানে অন্ধ কোরায়েশদের গালে এটি ছিল এক চপেটাঘাত। যে বেলালকে (রা.) তারা পশুরও অধম মনে করত, আজ সেই বেলাল (রা.) তাদের উদ্দেশে আযান গাইছেন। কথিত আছে, রসুলাল্লাহর পিতামহ আব্দুল মোত্তালেব যিনি ছিলেন এই কাবার সেবায়েত, তিনি তার দীর্ঘ শুভ্র শশ্রুরাশি দিয়ে কাবার ধূলা পরিষ্কার করতেন। এভাবেই কোরায়েশরা কাবাকে ভক্তি-শ্রদ্ধা করত। সেই কাবার উপরে যাকে তারা কিছুদিন আগেও মানুষ হিসাবে গণ্য করত না, আল্লাহর রসুল তাঁকে কাবার ঊর্ধ্বে উঠিকে মানুষের সম্মান, মো'মেনের সম্মান প্রতিষ্ঠা করলেন। মানুষের প্রকৃত সম্মান অনুভব করতে পেরেছিলেন বলেই কবি নজরুল লিখতে পেরেছিলেন,

মূর্খরা সব শোনো,
মানুষ এনেছে গ্রন্থ; - গ্রন্থ আনে নি মানুষ কোনো।
জগতের যত পবিত্র গ্রন্থ ভজনালয়
H GKLwb ক্ষুদ্র দেহের সম পবিত্র নয়।

এ ঘটনা প্রমাণ যে সকল ধর্মগ্রন্থ, কাবাসমেত সকল উপাসনালয় মানুষের কল্যাণের জন্য এসেছে, মানবতার জন্যে এসেছে। তাদের কারো সম্মান মো'মেনের ঊর্ধ্বে নয়। এ ঘটনার দ্বারা আল্লাহর রসুল কোরায়েশদের অহংকার, আরব জাতীয়তাবাদীদের অহংকার মরুভূমির বালুতে মিশিয়ে wদলেন। কিন্তু সেই জাহেলিয়াত রসুলাল্লাহ থাকতেই বার বার কোরায়েশদের মধ্যে মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে চেয়েছে, রসুলাল্লাহ ও প্রকৃত উম্মতে মোহাম্মদীর বিদায়ের পর কোরায়েশদের বংশীয় আভিজাত্যের গরিমা আবার ফিরে এসে ইসলামকে কলঙ্কিত করেছে। এটা মহাসত্য যে, আরবি জোব্বা পরে পারস্য ও রোমান সাম্রাজ্যের আদলে আরবি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য আল্লাহ যেমন তাঁর নবীকে পাঠান নি, তেমনি নবীও আরবি সাম্রাজ্য পরিচালনার জন্য উম্মতে মোহাম্মদী জাতি গড়ে যান নি। অথচ এটাই মুসলিম জাতির পরবর্তী দুঃখজনক ইতিহাস। আজও সেই আরবরাই আল্লাহ-রসুলের নাম আর ইসলামকে বিক্রি করে খাচ্ছে, তারা পশ্চিমা সভ্যতা তথা দাজ্জালের

সঙ্গে আঁতাত করে মুসলিম নামক এই জাতিকে ধ্বংসের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে। আরব রাজা-বাদশাহদের অর্থে পরিচালিত যুদ্ধে লক্ষ লক্ষ মুসলিম দাবিদারকে হত্যা করা হচ্ছে। আর আভিজাত্যের পূজারি আরব রাজা বাদশাহরা কাবার মোতয়াল্লি সেজে প্রতিবছর কাবার গেলাফ পরিবর্তনের অনুষ্ঠান করছে। আল্লাহ কাবাকে পোশাক পরাতে বলেন নি। এটা করুণ উপহাস যে, জজিরাতুল আরবের বহু দেশেই যখন অন্ন-e¯nxb, Avkqnxb মুসলিমদের মিছিল দিন দিন দীর্ঘ হচ্ছে, তাদেরকে আবাসন, খাদ্য-e¯ bv দিয়ে, জীবনের নিরাপত্তা না দিয়ে, তাদের মাতৃভূমি ফিরিয়ে দিতে সচেষ্ট না হয়ে তারা সাড়ম্বরে কাবা শরীফকে পোশাক পরিধান করায়। কারণ কাবা গৃহ, হজ্ব, ওমরাহ ইত্যাদি তাদের জাতীয় ধর্মব্যবসার উপকরণ। তারা গরীব দেশগুলো থেকে দাস-দাসী খরিদ করে নিয়ে মানবেতর জীবনযাপনে বাধ্য করছে, সর্বপ্রকার মানবাধিকার থেকে বঞ্চিত রাখছে, গৃহকর্মীদের উপর যৌন নির্যাতন পর্যন্ত করছে। এই অসভ্যরা আমাদের দেশের মানুষদেরকে বলে মিসকিন। তারা ভুলে গেছে যে, আল্লাহর রসুল ক্রীতদাস বেলালকে (রা.) কাবার উপরে স্থান দিয়েছিলেন।

পরিশেষে আমরা পাঠককে মনে করিয়ে দিতে চাই, আমরা ইতঃপূর্বে যায়েদ সম্পর্কে আলোচনা করেছি। তাঁকেও জোর করে দাস বানানো হয়েছিল, তবে তাঁর সৌভাগ্য হচ্ছে তিনি আম্মা খাদিজার (রা.) মত মহিয়সী নারীর গৃহে স্থান লাভ করেছিলেন। ইসলাম গ্রহণকারী সকল ক্রীতদাসকেই আল্লাহর রসুল হৃদয় দিয়ে ভালোবেসেছিলেন, স্বাধীন মানুষের সমমর্যাদা দান করেছিলেন, মুসলিম উম্মাহর ভাই বানিয়ে সমাজে সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত করেছিলেন। এর থেকে ন্যায়বিচার, এর থেকে সাম্যবাদ, এর থেকে মানবতা পৃথিবীর ইতিহাসে কেউ দেখাতে পারে নি।

এমামুয্‌যামান জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নীর লেখা থেকে

উম্মতে মোহাম্মদীর সংগ্রাম কিসের লক্ষ্যে?

শেষ নবীর আগে যে সব জীবনব্যবস্থা, দীন আল্লাহ পাঠিয়েছেন, সেগুলি মানুষ কেমন করে বিকৃত, অকেজো করে ফেলেছে তা অবশ্যই আল্লাহ জানতেন। তাই এবারও যাতে এই শেষ দীনের ঐ বিকৃতি না হয় সেজন্য আল্লাহ তার কোর'আনে কতকগুলি সতর্কবাণী পরিষ্কারভাবে নিবন্ধভুক্ত করলেন। এই মহা প্রয়োজনীয় ব্যাপারে শুধু যে আল্লাহ মানুষকে সতর্ক করলেন তাই নয়, তার প্রেরিত বিশ্বনবীও যে সব ভাবে পুর্ববর্তী জীবন বিধানগুলি বিকৃত হয়ে গেছে সেই সব প্রতিটি ব্যাপারে তার অনুগামীদের, তার জাতিকে বারবার সতর্ক করে দিলেন। এর আগে ধর্মের বিকৃতি অধ্যায়ে যে সব কারণ লিখে এসেছি GLb Zv GKUv GKUv Kরে লক্ষ্য করুন।

ক) নবীর পৃথিবী থেকে বিদায় নেবার পর অতি ভক্তির প্রাবল্যে তাকে ক্রমশঃ উর্দ্ধে উঠাতে উঠাতে স্বয়ং স্রষ্টার, আল্লাহর আসনে বসিয়ে দেয়া বা স্রষ্টাই নবীর মুর্তিতে স্বশরীরে আবির্ভূত হয়েছিলেন বিশ্বাস ও প্রচার করা। শেষনবীর অনুসারীরাও যেন সে ভুল না করে সেজন্য আল্লাহ পরিষ্কার বলে দিলেন- পূর্ববর্তী নবীদের মতো মোহাম্মদও (দ.) মানুষ (সুরা ইমরান ১৪৪)। তার প্রেরিত রসুলও বারবার একথা এমন জোরালোভাবে বলে গেলেন যে তা তার জাতির হৃদয়ে প্রোথিত হয়ে গেল।

খ) পূর্ববর্তী নবীদের উম্মাহগুলির মতো ধর্ম ও জীবনব্যবস্থাকে অতি বিশ্লেষণ করে ধ্বংস যাতে না করে সে জন্য আল্লাহ সাবধানবাণী উচ্চারণ করলেন- দীন নিয়ে বাড়াবাড়ি কর না (সুরা নেসা ১৭১, সুরা মায়েদা ৭৭)। বিদায় হজ্বেও রসুলাল্লাহ তাঁর উম্মাহকে লক্ষ্য করে ঐ একই কথা বললেন। অর্থাৎ

দীন নিয়ে বাড়াবাড়ি করো না। বিদায় হজ্বে তিনি যে সব বিষয়ে তার উম্মাহ ভুল করে গোমরাহ হয়ে যাবার বিষয়ে তিনি আশংকা ও ভয় করছিলেন সেই বিষয়ে উম্মাহকে শেষবারের মতো সাবধান করে দিচ্ছিলেন।

রসুল আল্লাহর এই বাণীকে ব্যাখ্যা করে তার সাহাবা, সাথীদের বললেন- আমাকে বেশি প্রশ্ন কোর না। তোমাদের পূর্ববর্তী জাতি (উম্মাহ) গুলো তাদের নবীদের বেশি প্রশ্ন করত। তাই নিয়ে মতভেদ, দলাদলি করে ধ্বংস হয়ে গেছে। কাজেই আমি যেটুকু করতে বলি সেটুকুই কর। বেশি করতে গেলে আগের জাতিগুলির মতো ধ্বংস হয়ে যাবে।

গ) পূর্ববর্তী উম্মাহগুলির পতনের আরেকটি কারণ ছিল এই যে, তাদের নবীদের উপর অবতীর্ণ বইগুলি তারা হয় বিকৃত করে ফেলেছিল না হয় যুদ্ধবিগ্রহ বা প্রাকৃতিক কারণে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। এই শেষ বইও যে তিনি নিজে রক্ষা না করলে তার শেষ নবীর অনুসারীরা বিকৃত করে ফেলবে তা তিনি জানতেন- তাই এটার রক্ষার ভার তার নিজের হাতে রাখলেন (সুরা wnRi 9)|

এই শেষ ও বিশ্বনবী কী কঠিন প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়ে কী অবর্ণনীয় দুঃখ ও কষ্ট করে তার উপর আল্লাহর দেয়া দায়িত্ব পালন করলেন তার বর্ণনা এখানে দরকার নেই- কারণ তা ইতিহাস। আমাদের বিষয় ইতিহাসের চেয়েও বহু প্রয়োজনীয়, যা দিয়ে ইতিহাস সৃষ্টি হয় তা। পূর্ববর্তী নবীদের যে কারণে আল্লাহ পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলেন তার এই শেষ নবীকেও সেই একই উদ্দেশ্যে পাঠালেন- অর্থাৎ পৃথিবীতে মানুষের জীবনে শান্তি, Bmjvg প্রতিষ্ঠা করতে। তাঁকে নির্দেশ দিলেন- পৃথিবীতে যত রকম জীবনব্যবস্থা দীন আছে সমস্ত গুলিকে নিষ্ক্রিয়, বাতিল করে এই শেষ জীবনব্যবস্থা মানুষের জীবনে প্রতিষ্ঠা করতে (সুরা তওবা ৩৩, সুরা ফাতাহ ২৮, সুরা সাফ ৯)। কারণ শান্তি একমাত্র পথই আল্লাহর দেয়া ঐ জীবন বিধান। আল্লাহ তার শ্রেষ্ঠ নবীকে ïa নামায, রোযা, হজ্ব, যাকাত ইত্যাদি শেখাতে পাঠান নি, ওগুলো তার সেই উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য যে জাতির দরকার সেই জাতির চরিত্র গঠনের প্রক্রিয়া,

উদ্দেশ্য নয়। উদ্দেশ্য দীনুল কাইয়্যেমা, সেরাতুল মোস্তাকীমকে পৃথিবীময় cwZôv|

GB wekvj `wqZ, mg¯ পৃথিবীময় এই শেষ জীবন বিধান প্রতিষ্ঠা Kiv GK জীবনে অসম্ভব। বিশ্বনবী তাঁর নবীজীবনের তেইশ বছরে সমস্ Avie উপদ্বীপে এই শেষ জীবন বিধান প্রতিষ্ঠা করলেন- ইসলামের শেষ সংস্করণ মানব জীবনের একটি অংশে প্রতিষ্ঠা হলো। কিন্তু তার উপর আল্লাহর দেয়া `wqZ cY bv, Zvi `wqZ mg¯ পৃথিবী, সম্পূর্ণ মানব জাতি। এর আগে কোন নবীi Dci m¤úY gvbeRwZi `wqZ AwcZ nq wb| hZw`b m¤úY মানব জাতির উপর এই শেষ জীবন বিধান জাতীয়ভাবে প্রতিষ্ঠা না হবে ততদিন মানুষ জাতি আজকের মতোই অশান্ি, যুদ্ধবিগ্রহ, অবিচারের মধ্যে ডুবে থাকবে- শান্ি, ইসলাম আসবে না এবং বিশ্বনবীর উপর আল্লাহর দেয়া দায়িত্বও পূর্ণ হবে bv|

আল্লাহর রসুল আংশিকভাবে তার দায়িত্বপূর্ণ করে চলে গেলেন এবং তার বাকী কাজ পূর্ণ করার ভার দিয়ে গেলেন তার সৃষ্ট জাতির উপর, তার উম্মাহর উপর। প্রত্যেক নবী তার উপর দেয়া দায়িত্ব পূর্ণ করেছেন তার অনুসারীদের, তার উম্মাহর সাহায্যে। কোন নবীই একা একা তার কাজ, কর্তব্য সম্পাদন Kiতে পারেন নি। কারণ তাদের প্রত্যেকেরই কাজ জাতি নিয়ে, সমাজ, জনসমষ্টি নিয়ে, ব্যক্তিগত নয়। কেউই পাহাড়ের গুহায়, নির্জনে, বা হুজরায় বসে তাঁর কর্তব্য করেন নি, তা অসম্ভব ছিল। শেষ নবীর বেলাও তার ব্যতিক্রম হয় নি। নবুয়ত পাবার মুহূর্ত থেকে ওফাত পর্যন্ পৃথিবীর ব্যস্Zg মানুষটির জীবন কেটেছে মানুষের মধ্যে, জনকোলাহলে নিরবিচ্ছিন্ন সংগ্রামে, সশস্ত্র সংগ্রামে- এ ইতিহাস অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। নবুয়তের mg¯ RxebUv ewngLx- যে দীন তিনি আল্লাহর কাছে থেকে এনে আমাদের দিলেন সেটার চরিত্রও হলো বহির্মুখী (Extrovert) msMvgx| Avjvni imj Zvi Dci AwcZ `wqZ যে তার উম্মাহর উপর ন্যস্ করে গেলেন তা যে তার উম্মাহ পূর্ণভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিল তার প্রমাণ হলো তার

উম্মাহর পরবর্তী কার্যক্রমের ইতিহাস। কারণ বিশ্বনবীর লোকান্তরের সঙ্গে সঙ্গে তার উম্মাহ তাদের বাড়িঘর, স্ত্রী-cÎ, e¨emvq-evwYR¨ GK K_vq দুনিয়া ত্যাগ করে তাদের প্রাণপ্রিয় নেতার অসমাপ্ত কাজ পূর্ণ করতে দেশ ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে পড়েছিল। সেই অসমাপ্ত কাজ হচ্ছে সমস্ত পৃথিবীতে এমন একটি জীবনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা যেটা মানুষের সমষ্টিগত এবং ব্যক্তিগত জীবনে পূর্ণ শান্তি আনবে। অর্থাৎ এই জাতিটি তাদের নেতা আল্লাহর শেষ নবী যেমন করে মানুষের কল্যাণের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন ঠিক তেমনি করে পৃথিবীর মানুষের কল্যাণের জন্য নিজেদের সব কিছু বিসর্জন দিয়ে দেশ ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল। তাদের নেতা তাদের বলেছিলেন আমাকে অনুসরণ কর, আমার সুন্নাহ পালন কর, যে আমার সুন্নাহ ত্যাগ করবে সে আমার কেউ নয় (হাদিস)। নেতার সুন্নাহ কী? আল্লাহ তাঁর নবীকে নির্দেশ দিচ্ছেন পৃথিবীতে যত জীবন বিধান আছে সে সমস্¸wji Dci তোমার কাছে অবতীর্ণ এই জীবন বিধানকে প্রতিষ্ঠা কর (সুরা তওবা ৩৩, সুরা ফাতাহ ২৮, সুরা সাফ ৯)। আল্লাহর রসুল সারাজীবন ধরে তাই করলেন এবং যাবার সময় তার অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করার ভার দিয়ে গেলেন তার সৃষ্ট RwZUvi Dci| móvi সর্বশ্রেষ্ঠ রসুল যে জাতি সৃষ্টি করলেন সে জাতিও সর্বশ্রেষ্ঠ (সুরা এমরান ১১০), সে জাতি- সে উম্মাহ, তাদের নেতার উপর অর্পিত দায়িত্বপূর্ণ করতে সমস্ত কিছু কোরবান করে নেতার পাশে এসে দাঁড়াল, নিজেদের প্রাণ উৎসর্গ করে দিল।

এই উম্মাহর সহায়তায় শেষ নবী সমস্ত আরবে শেষ জীবন বিধান প্রZôv করে চলে গেলেন। তার সৃষ্ট জাতি কিন্তু ভুলে গেলেন না যে তাদের নেতার দায়িত্ব শেষ হয় নি, তার উপর আল্লাহর দেয়া দায়িত্ব হচ্ছে সমস্ত পৃথিবীতে এই দীন প্রতিষ্ঠা করা। কারণ তিনি ছিলেন সমস্ত মানব জাতির জন্য প্রেরিত এবং সেই দায়িত্ব এসে পড়েছে এবার তাদের উপর। তাই ইতিহাসে দেখি wekbবীর ওফাতের সঙ্গে সঙ্গে তার উম্মাহ পৃথিবীর সমস্ত কিছু ত্যাগ করে আরব থেকে বের হয়ে পড়েছিল। একটা জাতি তাদের দেশত্যাগ

(Migration) করে অন্য স্থানে চলে গেছে, এমন ঘটনা ইতিহাসে আছে। কিন্তু সেগুলোর কারণ দিগ্বিজয়, অন্য জাতির আক্রমণ, দুর্ভিক্ষ, আবহাওয়ার পরিবর্তন হয়ে দেশ বাসের অযোগ্য হয়ে যাওয়া ইত্যাদি। কিন্তু একটা আদর্শ স্থাপন ও প্রতিষ্ঠা করার জন্য একটা গোটা জাতির দেশ থেকে বের হয়ে যাওয়া মানুষের ইতিহাসে আর নেই। আমরা যদি আমাদের মুসলিম জীবনের অর্থ খুঁজে পেতে চাই তবে ইতিহাসের এই নজিরবিহীন ঘটনাকে আমাদের গভীর ভাবে বুঝতে হবে। প্রথম কথা হলো বিশ্বনবxi m½xiv (iv.) Avmnve এই যে অস্ত্র হাতে আরব থেকে বের হয়ে পড়লেন এ কাজ ঠিক হলো কি হলো না? রসুলাল্লাহ জীবনভর যে শিক্ষা দিলেন ঐ কাজটি সে শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গতিপুর্ণ কি না? যদি না হয়ে থাকে তবে পরিষ্কার বলা যায় যে, আল্লাহর সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রসুলের জীবন বৃথা। কারণ তার ওফাতের কয়েক মাসের মধ্যেই তার সৃষ্ট জাতি, উম্মাহ, তার একান্ m½x mnPiiv Zvi wk¶vi বহির্ভূত একটি কাজ আরম্ভ করে দিলেন। শুধু তাই নয়, লক্ষ্য করার বিষয় হলো এই যে, সমগ্র জাতিটা একযোগে এ কাজটা আরম্ভ করে দিলো এবং পাঁচ লক্ষ মানুষের জাতিটির মধ্য থেকে একটি মানুষও এর প্রতিবাদ তো দূরের কথা, সর্ব প্রকারে ঐ কাজে সাহায্য করলেন। বহু হাদিস উল্লেখ করা যায় যা থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, শেষনবী নিশ্চিত ছিলেন যে তার সাহাবা (রা.) তার দেয়া শিক্ষায় সম্পূর্ণভাবে শিক্ষিত হয়েছিলেন, তার শিক্ষার মর্মবাণী তারা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন এবং তাদের নেতার, বিশ্বনবীর প্রকৃত নায়েব অর্থাৎ প্রতিনিধি হবার যোগ্যতা অর্জন করেছিলেন।

এ ব্যাপারে দু'একটি হাদিস উল্লেখ করা অসঙ্গত হবে না। রসুলাল্লাহ বলেছেন- আমার সঙ্গীরা উজ্জ্বল তারকার মতো- তাদের যে কাউকে মানুষ অনুসরণ করতে পারে (হাদিস ওমর বিন খাত্তাব (রা.) থেকে রাযিন মেশকাত)। এর অর্থ হচ্ছে মহানবী স্বয়ং তার সঙ্গীদের ইসjvg Kx, Gi উদ্দেশ্য কী, ঐ উদ্দেশ্য অর্জনের প্রক্রিয়া কী সবই শিক্ষা দিয়েছেন সুতরাং প্রকৃত ইসলাম কী তা ঐ আসহাবদের চেয়ে বেশি কেউ জানতে বুঝতে

পারতে পারে না, তা অসম্ভব। কারণ তারা আল্লাহর রসুলের সঙ্গে সর্বদা থেকে, তার সঙ্গে অবিরত সংগ্রাম করে তার প্রতি সুখ-দুঃখে অংশীদার হয়ে যে প্রকৃত শিক্ষা তার কাছ থেকে লাভ করেছেন সে শিক্ষা পরবর্তীতে কারো পক্ষে সম্ভব নয়। আরেকটি হাদিসে বিশ্বনবী বলেছেন আমার উম্মাহ ভবিষ্যতে তেহাত্তর ভাগে (ফেরকায়) বিভক্ত হয়ে যাবে। এবং ঐ তেহাত্তর ফেরকার মধ্যে একটি ফেরকা জান্নাতী (অর্থাৎ সঠিক ইসলামে থাকবে) আর বাকী বাহাত্তর ফেরকাই আগুনে নিক্ষিপ্ত (না'রি) হবে। ঐ একমাত্র জান্নাতী ফেরকা কোনটা এই প্রশ্নের জবাবে আল্লাহর রসুল বললেন, যাঁর উপর আমি ও আমার mvnwei v AwQ (nw`m- আবদুল্লাহ বিন আমর (রা.) থেকে- wZiwgwh, মেশকাত)। এ ব্যাপারে অগুনতি হাদিস উল্লেখ করা যায় যাতে সংশয়ের কোন অবকাশ থাকে না যে মহানবী জানতেন যে তিনি তার আসহাবদের প্রকৃত দীন শিক্ষা দিতে সক্ষম হয়েছিলেন।

এখন একটা অতি প্রয়োজনীয় প্রশ্ন হচ্ছে এই, যে কাজটা শেষ নবীর উম্মাহ তার ওফাতের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আরম্ভ করে দিল অর্থাৎ অস্ত্র হাতে স্বদেশ থেকে বের হয়ে পড়ল এর অর্থ কী? আবার বলছি এই জীবনব্যবস্থায় অর্থাৎ ইসলামের উদ্দেশ্য ও পদ্ধতির গুরুত্ব নির্দেশনায় এই ঘটনা একটি অতি প্রয়োজনীয় বিষয়। উম্মতে মোহাম্মদীর পতনের মূলে যে কয়েকটি প্রধান কারণ কাজ করেছে তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে এই ঐতিহাসিক ঘটনার মূল্যায়নে পরবর্তী কালের উম্মাহর ব্যর্থতা। ইসলামকে যারা বিকৃতরূপে দেখাতে চান তারা বলেন- GB Awfhvb wQj GKwU mvgvR¨ev`x AvMvmb| একথা সত্যি হলে দুঃখের সঙ্গে বলতে হয় যে, স্রষ্টার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি, মানব জাতির আদর্শ, যাকে আল্লাহ স্বয়ং পৃথিবীর উপর তার রহমত, করুণা বলে বর্ণনা করেছেন তিনি একটি পরদেশলোভী রক্তপিপাসু জাতি সৃষ্টি করে গিয়েছিলেন। এই অভিযোগ যে সত্য নয় তার প্রমাণ হলো এই যে, আলেকজান্ডার, চেঙ্গিস, হালাকু খানের সাম্রাজ্যবাদী বিজয় ছিল ক্ষণস্থায়ী। এগুলোর আয়ু কয়েক বছরের বেশি হতে পারে নি কোথাও। আর মোহাম্মদের (দ.) উম্মাহর

অভিযানের ফলে পৃথিবীর যে অংশটুকুতে ইসলাম প্রতিষ্ঠা হয়েছিল সেটুকুতে আজ চৌদ্দশ' বছর পরও তা মৃতপ্রায় হলেও বেঁচে আছে। ইসলামকে Kwjgwjপ্ত করার চেষ্টায় অন্য যে অভিযোগটি করা হয় তা হচ্ছে, উম্মতে মোহাম্মদীর ঐ সামরিক অভিযানের উদ্দেশ্য ছিল মানুষকে জোর করে ধর্মান্ রিত করা। এ অভিযোগও যে মিথ্যা তার প্রমাণ হলো এই যে, যে বিরাট এলাকায় এই শেষ জীবনব্যবস্থা তারা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সে এলাকা তারা একচ্ছত্রভাবে শাসন করেছেন বহু শতাব্দী ধরে। জোর করে ধর্মান্রিত করলে মরক্কো থেকে বোর্নিও পর্যন্ এই ভূভাগে আজ ইসলাম ছাড়া আর কোন ধর্মের A¯ত্ব থাকতো না। তদানিন্ন পৃথিবীর বোধহয় সবচেয়ে পশ্চাদপদ, সবচেয়ে অশিক্ষিত, সবচেয়ে দরিদ্র এই জাতিটি হঠাৎ করে মরুভূমির গভীর অভ্যন্র থেকে একযোগে বেরিয়ে এসে শক্তিশালী সভ্যজগতের মুখোমুখী হয়ে দাঁড়াল। এ কথা বুঝতে কোন অসুবিধা নেই যে, ঐ উম্মাহ নিশ্চয়ই ঐ কাজটাকে তাদের সর্বশ্রেষ্ঠ, সর্বপ্রথম ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য বলেই বিবেচনা করেছিলেন। তা না হলে রসুলাল্লাহর ওফাতের সঙ্গে সঙ্গে তারা একযোগে ঐ কাজ করতে সব কিছু ত্যাগ করে আরব থেকে বের হয়ে পড়তেন না। বিশ্বনবীর সাহচর্যে থেকে তার কাছ থেকে সরাসরি যারা এই জীবনব্যবস্থার মর্মবাণী, উদ্দেশ্য, প্রক্রিয়া শিক্ষা করেছিলেন তারা কি বোঝেন নি কোন কর্তব্য বড়, কোন কর্তব্য ছোট? কোনটা আগে কোনটা পরে (Priority)? মহানবীর আসহাব যদি তা না বুঝে থাকেন তবে আমরা চৌদ্দশ' বছর পরে তা বোঝার কথা চিন্াও করতে পারি না। তাহলে বিশ্বনবীর উম্মাহর ঐ কাজের প্রকৃত অর্থ কী?

এই মহা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা অর্থাৎ উম্মতে মোহাম্মদীর আরব থেকে বের হয়ে অন্যান্য জাতির সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে যাওয়ার প্রকৃত অর্থ এই যে, রসুলাল্লাহর কাছ থেকে সরাসরি ইসলাম শিক্ষা করার ফলে তারা সঠিকভাবে বুঝেছিলেন ইসলাম কী, এর উদ্দেশ্য কী, ঐ উদ্দেশ্য অর্জন করার প্রক্রিয়া কী, কোনটা অত্যন্ প্রয়োজনীয়, কোনটা কম প্রয়োজনীয়। তারা বুঝেছিলেন

আল্লাহর প্রতি ইবলিসের চ্যালেঞ্জ হচ্ছে সে মানুষকে প্ররোচনা দিয়ে দীন A_ৎ আল্লাহর দেয়া জীবন বিধানকে হয় বিকৃত না হয় অস্বীকার কোরিয়ে মানুষকে দিয়ে বিধান তৈরী কোরিয়ে মানুষকে অশান্তি, AwePvi, h× রক্তপাতের মধ্যে পতিত করাবে। আর সেই অন্যায়, অবিচার আর রক্তপাত থেকে মানুষকে রক্ষা করার জন্য আল্লাহ যে জীবনব্যবস্থা তার নবীর মাধ্যমে পাঠালেন সেটাকে সংগ্রামের মাধ্যমে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে তাদের সর্বপ্রধান ও সর্বপ্রথম কর্তব্য। ঐ শিক্ষাই তাদের নেতা, স্রষ্টার সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি, তার শেষ ও বিশ্বনবী তাদের দিয়ে গিয়েছিলেন, নিজে করে তাদের হাতে কলমে শিখিয়ে গিয়েছিলেন। অর্থাৎ মানব জাতিকে অশান্তি, AwePvi, Ab¨vq, রক্তপাত, যুদ্ধ থেকে বাঁচাবার জন্য পৃথিবীতে শান্তি, Bmjvg, cwZôvi Rb¨, যে জন্য বিশ্বনবীকে আল্লাহ পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলেন, ঐ জাতি নিজেদের সব কিছু কোরবান করে সেই কাজ করতে আরব থেকে বাইরে বেরিয়ে পড়েছিলেন।

এই হলো ঐ জাতির উম্মাহর সমস্ত কিছু কোরবান করে দল বেঁধে আরব থেকে বের হয়ে পড়ার একমাত্র কারণ। এবং ঐ জাতিই হলো সত্যিকার অর্থে উম্মতে মোহাম্মদী- মোহম্মদের (দ.) জাতি। ঐ জাতি তাদের নেতার উপর আল্লাহর অর্পিত দায়িত্ব ও তার ওফাতের পর ঐ বিরাট দায়িত্ব তাদের উপর এসে পড়া সম্বন্ধে এত সজাগ ও সচেতন হয়েছিলেন এবং ঐ দায়িত্ব এমন গভীর ভাবে উপলব্ধি করেছিলেন যে, তাদের নেতা আjvni imj we`vq নেবার মাত্র আট মাসের মধ্যে তারা অস্ত্র হাতে সব কিছু ত্যাগ করে আরব থেকে বের হয়ে পড়েছিলেন। আর ঐ আট মাসও দেরী বোধ হয় হতোনা যদি কয়েকজন মিথ্যা নবী আর মোনাফেকরা মাথাচাড়া দিয়ে না উঠতো, যাদের দমন, শায়েস্তা করতে ঐ আট মাস সময় লেগেছিল। মোট কথা এ ইZnvm অস্বীকার করার কোন উপায় নেই যে, রসুলাল্লাহর ওফাতের সঙ্গে সঙ্গে তার সৃষ্ট জাতিটা অস্ত্র হাতে দেশ থেকে বের হয়ে পড়েছিল। যে জাতি আল্লাহর রসুলের পদতলে বসে তার কাছ থেকে সরাসরি ইসলাম কী তার শিক্ষা লাভ

করেছিল সেই জাতি যদি নেতার চলে যাবার পর সর্বপ্রথম ঐ কাজটি আরম্ভ করে তবে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, ঐ কাজটিকেই তারা উম্মতে মোহাম্মদী হিসাবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং সর্বপ্রধান কাজই ভেবেছিলেন। কারণ তারা উপলব্ধি করেছিলেন যে, এ কাজ অর্থাৎ এ জীবনব্যবস্থা সমগ্র মানব জাতির পূর্ণ জীবনে যতদিন প্রতিষ্ঠিত না হবে ততদিন শেষ রসুল এবং তার উম্মাহর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অর্জন করা হবে না, তাদের কাজ শেষ হবে না। তাই ইতিহাসে দেখি এই উম্মাহ তার নেতার (দ.) আরদ্ধ কাজ করতে পৃথিবীকে তিনটি শর্ত দিয়েছেন। তারা পৃথিবীর যে দিকেই গেছেন সেদিকেই তারা তাদের বিরোধীদের তিনটি শর্ত দিয়েছেন। এ শর্ত তিনটি তারা শিখেছিলেন তাদের নেতা আল্লাহর রসুলের কাছ থেকে। কারণ তিনিও বিরোধীদের ঠিক ঐ তিনটি শর্তই দিতেন। শর্তগুলি হচ্ছেঃ

প্রথমত, আল্লাহর সার্বভৌমত্ব তওহীদ (অর্থাৎ চূড়ান্ত mZ¨, nK) I বিশ্বনবীকে স্বীকার করে নিয়ে শেষ জীবন বিধান গ্রহণ কর। তাহলো তোমরা আমাদের ভাই হয়ে যাবে এবং আমাদের সঙ্গে একত্র হয়ে পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে আমাদের সহযোগী হয়ে যাবে।

দ্বিতীয়ত, তাতে যদি সম্মত না হও তবে রাষ্ট্রশক্তি ও শাসনভার আমাদের হাতে ছেড়ে দাও, আমরা শেষ জীবনব্যবস্থা অনুযায়ী শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করব অর্থাৎ সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠা করব, তোমরা ব্যক্তিগতভাবে যে যার ধর্মে AvQ Zv-ই থাকবে। আমরা বিন্দুমাত্র হস্তক্ষেপ করব না, তোমাদের একজোড়া ছেঁড়া জুতোও নেব না। কিন্তু তোমাদের মধ্যে যারা আমরা শত্রু দ্বারা আক্রান্ত হলে আমাদের পক্ষ হয়ে যুদ্ধ করবেন না (শুধু যুদ্ধক্ষম লোক) তারা মাথা পিছু একটা কর দেবে।

তৃতীয়ত, যদি এটাও স্বীকার না কর তবে আর যুদ্ধ ছাড়া পথ নেই। কারণ এই জীবনব্যবস্থা পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা করতে বিশ্বনবীর উপর স্রষ্টার অর্পিত দায়িত্ব পূর্ণ করে পৃথিবীতে শান্তি, সুবিচার প্রতিষ্ঠা করতে, ইবলিসের চ্যালেঞ্জে আল্লাহকে জয়ী করাতে আমরা পার্থিব সব কিছু বিসর্জন দিয়ে এখন প্রাণ

বিসর্জন দিতে এসেছি। তবে যুদ্ধ করে বিজয়ী হয়ে যদি আমাদের তোমাদের উপর এই জীবনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে হয় তাহলেও তোমাদের ধর্মে হস্ক্ষেপ করবনা, তবে তোমাদের যোদ্ধাদের বন্দী করব। বিশ্বনবীর উম্মাহর এই প্রচেষ্টা- জেহাদ, পৃথিবীতে শান্তি ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার এই সংগ্রামকে বহুভাবে বিকৃত করার চেষ্টা হয়েছে। অমুসলিমরা তো বটেই এমন কি মুসলিম নামধারী কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মোশরেক ও কাফেররাও এই সংগ্রামকে জোর করে মানুষকে ধর্মান্তরিত করার প্রচেষ্টা বলে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন। এ ছাড়াও এক শ্রেণীর বিশ্বাসী মুসলিমও আছেন যারা ইসলামের যুদ্ধকে শুধুমাত্র AvZ¥i¶vgjK (Defensive) বলে মনে করেন। এরা প্রমাণ হিসাবে কোর'আনের সুরা বাকারার ১৯০ নম্বর আয়াত উল্লেখ করেন যেখানে আল্লাহর hদ্ধের অনুমতি দিচ্ছেন শুধু তাদের বিরুদ্ধে যারা মুসলিমদের আক্রমণ করে এবং সুরা বাকারার দু'শ ছাপ্পান্ন নম্বর আয়াত উল্লেখ করেন, সেখানে আল্লাহ বলছেন ধর্মে কোন জবরদস্তি নেই অর্থাৎ শক্তি প্রয়োগ করে কাউকে ধর্মান্তরiZ করা নিষেধ করে দিচ্ছেন। এক কথায় মুসলিমদের শুধু আত্ম-i¶vgjK যুদ্ধেরই অনুমতি দেয়া হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে উপরোক্ত ঐ আদেশগুলি আল্লাহ দিয়েছিলেন ইসলামের অতি প্রথম দিকে যখন এ জীবন-ব্যবস্থায় বিশ্বাসীদের সংখ্যা অতি অল্প, সমস্যা তখন প্রধানত আত্মরক্ষা। যখনই এ অবস্থা কেটে যেয়ে বিশ্বনবী ও তাঁর সাহাবারা যথেষ্ট শক্তিশালী হয়ে উঠলেন তখন আর ঐ আদেশ বা অনুমতি আল্লাহই বদলে দিয়ে নিজেরা অগ্রসর হয়ে বিরোধীদের, অবিশ্বাসীদের আক্রমণ করে পরাজিত করতে আদেশ দিলেন। তখন আদেশ Gj- সশস্ত্র সংগ্রাম কর যতক্ষণ না অন্যায়, অশান্তি (পৃথিবী থেকে) নির্মূল হয়ে সেখানে আল্লাহর দেয়া দীন প্রতিষ্ঠিত হয় (সুরা আনফাল ৩৯)। অর্থাৎ যে কথা আগে বলে এসেছি- পৃথিবীতে cPwjZ mg¯ iKg `xb A_vr Rxeb-ব্যবস্থাকে পরাজিত করে বা শেষ করে দিয়ে একমাত্র আল্লাহর দেয়া জীবনব্যবস্থা বা দীন ইসলাম প্রতিষ্ঠাই আল্লাহর লক্ষ্য এবং বিশ্বনবীকে পাঠাবার উদ্দেশ্যই তাই। আল্লাহ আরো পরিষ্কার করে বলেছেন- মুসলিমদের

বলছেন- তোমাদের কী হোল? তোমরা আল্লাহর রাস্ত়ায় msMÖvg KiQ bv অথচ দুর্বল অক্ষম পুরুষ, নারী আর শিশুরা অত্যাচারিত হয়ে চিৎকার করে বলছে- হে আমাদের প্রতিপালক প্রভু! এই অত্যাচারীদের দেশ থেকে আমাদের বের করে নাও। তোমার কাছ থেকে অভিভাবক নিযুক্ত কর। তোমার কাছ থেকে আমাদের সাহায্যকারী দাও (সুরা নেসা ৭৫)। এখানেও সেই একই কথা, ভুল জীবনব্যবস্থা গ্রহণের অবশ্যম্ভাবী ফল হিসাবে মানুষ যে অন্যায়, অত্যাচার আর অবিচারের যাতাকলে নিষ্পিষ্ট হচ্ছে তা থেকে মানুষকে উদ্ধার করার জন্য আল্লাহ উম্মতে মোহাম্মদীকে আদেশ করছেন সর্বাত্মক সংগ্রাম করতে। আত্মরক্ষমূলক নয়, নিজেরা অগ্রগামী হয়ে সর্বাত্মক সংগ্রামের মাধ্যমে সম¯ পৃথিবীকে এই শেষ জীবন বিধানের মধ্যে নিয়ে আসার এই পরিষ্কার আদেশ থাকা সত্ত্বেও, বিশ্বনবীর জীবনে এর বহু প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও অসংখ্য "ইসলামী চিন্তাবিদেরা" ইসলামের সশস্ত্র সংগ্রামকে শুধু আত্মরক্ষামূলক বলে প্রমাণ করার ব্যর্থ চেষ্টা করেছেন। এমনকি কিছুসংখ্যক আইনজ্ঞ ইসলামের প্রথম দিকে অবতীর্ণ আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধের অনুমতি ও ধর্মে শক্তি প্রয়োগ নাই (সুরা বাকারা ২৫৬), এর উপর ভিত্তি করে অভিমত দিয়েছেন যে, ইসলাম শুধু আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ সমর্থন করে। এই ভুল অভিমত ও আকিদার পেছনে প্রকৃত পক্ষে কাজ করেছে:

ক) ইসলামের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্বন্ধে সঠিক আকিদার অভাব।

খ) দীন বলতে কী বোঝায় সে সম্বন্ধে আকিদার ভুলে অন্যান্য প্রচলিত ধর্মের, বিশেষ করে খ্রিষ্টান ধর্মের ধারণার অর্থাৎ আকিদার অনুকরণ।

গ) হীনম্মন্যতায় আপ্লুত হয়ে পাশ্চাত্যের কাছে কৈফিয়ৎ দেয়া যে, তোমরা আমাদের দোষারোপ কর যে আমরা তলোয়ারের জোরে আমাদের ধর্ম বিস্তার করেছি তা ঠিক নয়- কারণ দেখো আমাদের কোর'আনেই আছে যে, "ধর্মে বলপ্রয়োগ নেই।" এই মেরুদণ্ডহীন কৈফিয়ৎ দানকারীরা ও পাশ্চাত্যের কাছে করজোড়ে ক্ষমাপ্রার্থীরা চিন্তা করে দেখেন নাই যে ঐ কাজ করে তারা উম্মতে মোহাম্মদীর মুজাহিদ, মহানবীর আসহাবদের শুধু অন্যায়কারী আখ্যা দিয়েছেন

তাই নয় তারা এও বুঝিয়েছেন যে, বিশ্বনবী নিজেই কোর'আনের ঐ আয়াত, আদেশগুলি বুঝতে পারেন নি, কিন্তু তারা সঠিকভাবে বুঝেছেন (নাউজুবিল্লাহ)। হীনম্মন্যতা মানুষকে কোথায় নিয়ে যেতে পারে। আল্লাহ মহানবীকে যখন যথেষ্ট শক্তিশালী করলেন তখনই তিনি আরবের বিভিন্ন দিকে সামরিক অভিযান পাঠিয়ে সমস্ আরবকে আল্লাহ প্রদত্ত জীবনব্যবস্থার অধীনে নিয়ে আসলেন, ঐ ইতিহাসকে কেউ অস্বীকার করতে পারবেন না। ঐ সব অভিযানের সেনাপতিদের সবাইকে তিনি নির্দেশ দিয়ে দিতেন সেই তিনটি শর্ত প্রথমে তাদের দিতে। প্রথম ও দ্বিতীয় শর্ত গ্রহণ না করলে যুদ্ধ করে পরাজিত করে তাদের ইসলামের শাসন ব্যবস্থার মধ্যে নিয়ে আসাই ছিল তাঁর (দ.) নির্দেশ। তারপর বিশ্বনবীর ওফাতের পরপরই আবু বকর (রা.) অভ্যন্ রীণ গোলযোগ দমন করার সঙ্গে সঙ্গে ইরাক ও সিরিয়ার দিকে মুসলিম বাহিনী পাঠিয়ে দিলেন, এ ইতিহাসও অস্বীকার করার সাধ্য নেই। তখন পারসিকরা ও বাইজানটাইন রোমানরা ইসলামের বিরুদ্ধে আক্রমণ করার প্রস্তুতি নিচ্ছিল এমন কোন প্রমাণ নেই। প্রকৃতপক্ষে ঐ দুই বিশ্বশক্তি আরবদের কোন তোয়াক্কাই করত না। আরবদের সম্বন্ধে ছিল তাদের অপরিসীম অবজ্ঞা, একথা ইতিহাস। আবু বকরের (রা.) পর বাকী তিন খোলাফায়ে রাশেদুন ও তারও পর ৬০/৭০ বছর পর্যন্ GKUvbv G msMvg চলেছে তাও কারোর অস্বীকার করার পথ নেই। আল্লাহ শুধু আত¥i¶vgjK যুদ্ধের অনুমতি দিয়েছেন যারা বলেন তারা প্রকারান্তরে রসুলাল্লাহ থেকে শুরু করে এই উম্মাহর ৬০/৭০ বছর পর্যন্ mg¯ খলিফাদের (রা.) ও আসহাবদের আল্লাহর আদেশ বুঝতে অসমর্থ বলে প্রমাণ করতে চেষ্টা করেন। তারা খ্রিষ্টানদের কাছে কৈফিয়ৎ দিয়ে কৃতার্থ হতে যেয়ে কত বড় ধৃষ্টতা করেন তা তারা বোঝেন না। ইসলামের প্রাথমিক দুর্বলতার সময়ে শুধু আত্মরক্ষার যুদ্ধের অনুমতি ও পরে অবস্থার পরিবর্তনে নিজেরা উদ্যোগী হয়ে শত্রুকে আক্রমণ করার মতো পরিবর্তন আল্লাহ আরও ব্যাপারে করেছেন। একে আমরা বলতে পারি কোন ব্যাপারে পর্যায়ানুক্রমিক বিকাশ। উদাহরণ হিসাবে

নেয়া যায় মদ খাওয়া (Strong drink), এটা হঠাৎ করে নিষেধ করা হয় নি। প্রথমে নির্দেশ এল মাতাল অবস্থায় সালাতে (নামাযে) যোগ দিও না (সুরা নেসা ৪৩)। এতে সুরা পান অনেকটা কমে গেল। এর বেশ পরে আল্লাহর নির্দেশ এল সুরাপানের মধ্যে ভালও আছে, মন্দও আছে কিন্তু ভালোর চেয়ে ওতে মন্দের ভাগ বেশি (সুরা বাকারা ২১৯)। অত্যন্ মৃদু নিষেধাজ্ঞা, যেন আল্লাহ স্নেহ করে বুঝিয়ে বলছেন। আরও কমে গেল মদ খাওয়া। তারপর এল সরাসরি আদেশ মদ খাবে না (সুরা মায়েদা ৯৩)। এখন যদি ঐ প্রথম নির্দেশ ধরে বসি এবং বলি শুধু মাতাল হয়ে নামায পড়াই নিষেধ তাহলে কেমন হবে?

প্রথম আত্মরক্ষার যুদ্ধের অনুমতি দেবার পর পরবর্তী কালে উপযুক্ত সময়ে আল্লাহ অনেকবার পরিষ্কার আদেশ দিয়েছেন উদ্যোগী হয়ে, অগ্রাগামী হয়ে সামরিকভাবে অন্যান্য জাতির সম্মুখীন হয়ে তাদের প্রথমে এই শেষ ইসলামকে গ্রহণ করতে আমন্ত্রণ করতে। যদি তাতে তারা সম্মত না হয় তবে তাদের শাসনভার মুসলিমদের হাতে ছেড়ে দিতে, যাতে তারা আল্লাহর দেওয়া জীবনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে সর্বরকম অন্যায়, অবিচার, অশান্ি নির্মূল করে মানুষের মাঝে শান্ি ফিরিয়ে আনতে পারেন- কারণ সব কিছুর মূলেই ঐ আসল উদ্দেশ্য- শান্ি, Bmjvg cwZôv Kiv| Avi ZvB cwZ bexi mgq প্রতি ধর্মের আসল নাম ইসলাম, শান্ি। যদি ঐ জাতিগুলো এই দুই শতেi কোন শর্ত গ্রহণ না করে তবে আল্লাহ ও তাঁর রসুলের সরাসরি আদেশ হচ্ছে তাদের আক্রমণ করে পর্যুদস্ করে তাদের শাসনভার মুসলিমদের হাতে তুলে নেয়ার। আল্লাহ ও তাঁর রসুলের ঐ হুকুম পালন করে এই উম্মাহ শত শত আক্রমণাত্মক যুদ্ধ করেছে এটা ইতিহাস। যে পর্যায়ক্রমিক বিকাশের কথা ejwQ GB msগ্রামের ব্যাপারে এখানেই তার শেষ নয়। আল্লাহ তো তাঁর নবীকে দায়িত্ব দিয়েছেন এই শেষ জীবন বিধানকে সংগ্রামের এবং সর্বাত্মক সংগ্রামের মাধ্যমে সমস্ পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা করার। কাজেই প্রথমে আরবের মোশরেকদের পরাভুত করার পর তিনি ঐ ক্রমবিকাশের ধারা ধরেই

পরবর্তীতে আরবের বাইরে আহলে কেতাব অর্থাৎ ইহুদী ও খ্রিষ্টানদেরও বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাদেরও এই জীবনব্যবস্থা, দীনের অধীনে নিয়ে আসার আদেশ দিয়েছেন। তিনি বলছেন- যাদের উপর কেতাব নাজেল হয়েছে (ইহুদী, খ্রিষ্টান ইত্যাদি) তাদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও শেষ বিচারের দিন বিশ্বাস করে না, যা আল্লাহ ও তার রসুল নিষিদ্ধ করেছেন তা নিষিদ্ধ মনে করে না এবং সত্য দীনকে স্বীকার করে না তাদের বিরুদ্ধে সশ্রস্ত্র সংগ্রাম কর যে পর্যন্ bv Zviv ch`¯, পরাজিত হয়ে জিজিয়া কর দেয় (সুরা তওবা ২৯)। এই আয়াতে বা এর আগে পরে কোথাও আল্লাহ এ শর্ত রাখেনি যে ইহুদী খ্রিষ্টানরা আক্রমণ করলে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর। বরং এটা সরাmwi আদেশ মো'মেনদের নিজেদের অগ্রগামী হয়ে তাদের আক্রমণ করে পর্যুদস্ করার জন্য। এই জাতি যতদিন আল্লাহর এই আদেশ পালন করে গেছে নিজেদের সবকিছু কোরবান করে আরব থেকে বহির্গত হয়ে সর্বাত্মক সংগ্রাম করে গেছে ততদিন আল্লাহ তাদের সঙ্গে ছিলেন। কারণ তখন তারা আল্লাহর আদেশও পালন করেছেন, তাদের নবীর সুন্নাহও পালন করেছেন। তাই তারা তাদের চেয়ে বহুগুণ শক্তিশালী বিশ্বশক্তিগুলিকেও যুদ্ধে পরাজিত করে রাষ্ট্র শক্তি অধিকার করে আল্লাহর দীন, জীবনব্যবস্থা কার্যকর করে শান্তি, Bmjvg প্রতিষ্ঠা করেছেন। আল্লাহ এই জাতিকে বলে দিয়েছিলেন- তোমাদের কী হয়েছে যে, যখন তোমাদের বলা nq Avjvni iv¯vq (mevZ¥K msMvg) অভিযানে বের হও, তখন তোমরা যেন মাটির সাথে মিশে যাও; তোমরা কি তাহলে এই দুনিয়াকেই আখেরাতের চেয়ে পছন্দ করছো? কিন্তু এই দুনিয়ার আরাম আখেরাতের তুলনায় অতি সামান্য। তোমরা যদি (জেহাদের) অভিযানে বের না হও তবে তোমাদের কঠিন শাস্তি দেব এবং তোমাদের বদলে অন্য জাতিকে মনোনীত করব। তোমরা তার (আল্লাহর) কোনও ক্ষতি করতে পারবে না (কারণ) আল্লাহ সর্বশক্তিধর (সুরা তওবা ৩৮-39)।

আল্লাহ যে মিথ্যা ভয় দেখান নি তার প্রমাণ ইতিহাস। আল্লাহ ও তাঁর রসুলের অর্পিত দায়িত্ব জেহাদ ছেড়ে দিয়ে ফতোয়াবাজী ও আত্মা ঘষামাRvq e¨¯—

nevi kw¯ হলো এই যে, এই জাতিকে ইহুদী খ্রিষ্টান জাতিগুলির দাসে পরিণত করে দেয়া হলো। অভিযানে বের না হবার অর্থাৎ জেহাদ ছেড়ে দেবার শাস্তি আল্লাহ বলছেন কঠিন শাস্তি ও অন্য জাতিকে মনোনীত করা অর্থাৎ তাদের গোলাম করে দেয়া। ঐ কঠিন শাস্তিUv ïa GB `wbqvq bq H `wbqiতে, আখেরাতেও। দুনিয়ার শাস্তি Ab¨ RwZi `vmZ KZLwb হৃদয়বিদারক তা ইতিহাস পড়ে দেখুন। যারা এই দীনের প্রকৃত আকিদা স্বয়ং আল্লাহর রসুলের কাছে থেকে শিক্ষা করেছিলেন তাদের একজন, আবু বকর (রা.) জাতিকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন- হে মুসলিম জাতি! তোমরা কখনও জেহাদ ছেড়ো না, জেহাদ ছাড়লে আল্লাহ তোমাদের অপমান অপদস্থ না করে ছাড়বেন না। এই জাতির ইতিহাস আবু বকরের (রা.) কথার সত্যতার সাক্ষী। আজকের এই 'মুসলিম' জাতির আকিদা আবু বকরের (রা.) আকিদার ঠিক বিপরীত আকিদা। জেহাদ, সশস্ত্র সংগ্রাম এই জাতির আকিদা থেকে ধুয়ে মুছে বাদ দেয়া হয়েছে। এটা আর বর্তমানের উম্মতে মোহাম্মদীর দাবিদার জাতির আকিদা নয়। ইসলামের জেহাদ, সশস্ত্র সংগ্রাম আত্মরক্ষামুলক নয়, কিন্তু জেহাদ ছেড়ে দেবার পর থেকে হাজার বছরেরও বেশি সময় ধরে অবিশ্রান্ত মিথ্যা প্রচারের ফলে আজ এই জাতির আকিদা ও ঈমানের মধ্যে এই মিথ্যা স্থান করে নিয়েছে। আল্লাহ কোর'আনে জেহা` সম্বন্ধে কী বলেছেন, কতবার বলেছেন তাঁর রসুল সশস্ত্র সংগ্রাম সম্বন্ধে কী বলেছেন (এবং দশ বছরের কম সময়ে আটাত্তরটি সশস্ত্র যুদ্ধ পরিচালনা করেছেন) এবং সর্বোপরি তার আসহাব প্রকৃত উম্মতে মোহাম্মদীর শত বৎসরের নিরবিচ্ছিন্ন সশস্ত্র সংগ্রামের ইতিহাস পড়ার পরও কোন মানুষ msMvgwenxb Bmjvg wPšÍ করতে পারে একথা ভাবতেও অসম্ভব মনে হয়। ইংরাজীতে brain wash বলে একটা কথা আছে অর্থাৎ মগজ ধোলাই। জেহাদ সম্বন্ধে এই মগজ ধোলাই অত্যন্ত সফলতার সাথে করা হয়েছে। অবশ্য এজন্য তারা সময় পেয়েছেন প্রচুর, প্রায় তেরশ' বছর।

বিশ্বনবীর মক্কা জীবনে সশস্ত্র যুদ্ধের কথা ওঠে না। কারণ দু'একশ' লোক একটা জাতির বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ মানে আত্মহত্যা। কিন্তু তার মানে এ নয় যে অস্ত্র ধারণ নীতি ছিল না বা নীতি বিরুদ্ধ ছিল। হেরা গুহায় এই দীন অবতীর্ণ হবার মুহূর্ত থেকেই সশস্ত্র সংগ্রাম এর প্রধানতম নীতি (আকিদা) ছিল। নীতি প্রয়োগ করা হয় নি কারণ তখনও শক্তি সঞ্চয় করা হয় নি। মদিনায় wnRi তের সঙ্গে সঙ্গেই যেটুকু শক্তি সঞ্চয় হলো ঐটুকু নিয়েই আল্লাহর রসুল সশস্ত্র অশ্বারোহীর দল শত্রুর উদ্দেশ্যে পাঠাতে শুরু করেছিলেন। অর্থাৎ দেখা যায় মদীনায় হিজরতের সঙ্গে সঙ্গে নীতি প্রয়োগ আরম্ভ করা হলো। যারা এই জাতির ইতিহাস ভালো করে পড়েন নি এবং আত্মরক্ষার যুদ্ধের মিথ্যা প্রচারের শিকার হয়েছেন তাদের ধারণা বদরের যুদ্ধই ইসলামের প্রথম যুদ্ধ। তারা হয়তো জানেন না যে, বদরের যুদ্ধের আগেই মহানবীর মোট সাতটি সশস্ত্র অভিযান শত্রুর বিরুদ্ধে প্রেরণ করেছিলেন। একেবারে প্রথম অভিযানটি উবায়দা বিন হারেসের (রা.) অধীন ৬০ থেকে ৮০ জন অশ্বারোহী, উষ্ট্রারোহীর দলকে ওয়াদ্দান নামক স্থানে পাঠানো হয়। সেখানে সা'দ বিন আবু ওয়াক্কাস (রা.) কোরায়েশদের লক্ষ্য করে প্রথম তীর ছোড়েন (সিরাত imjvjvn- ইবনে ইসহাক)। এখানে ভাববার কথা আছে। মক্কায় মুসলিম মো'মেনদের উপর একতরফা অত্যাচার ছিল, মো'মেনদের প্রতিরোধের শক্তি ছিল না। মদিনায় হিজরতের সঙ্গে সঙ্গেই যেটুকু শক্তি সঞ্চয় হলো এটুকু নিয়েই আল্লাহর রসুল সশস্ত্র অশ্বারোহীর দল শত্রুর উদ্দেশ্যে পাঠাতে শুরু করেছিলেন। এখন যদি দেখা যায় মদীনায় হিজরতের পর মো'মেনদের সাথে মোশরেকদের প্রথম সাক্ষাতেই সা'দ (রা.) আক্রমনের অপেক্ষা না করেই প্রথম তাদের লক্ষ্য করে তীর নিক্ষেপ করেন তবে অবশ্যই বলতে হবে যে আক্রান্ত bা হলে আক্রমণ করব না এ নীতি নিশ্চয়ই মুসলিমদের ছিল না। তাছাড়া নীতি আত্মরক্ষামূলক হলে মহানবী অশ্বারোহীদের প্রথম আক্রমণ নিষেধ করে দিতেন এবং সা'দ (রা.) আল্লাহর রসুলের নির্দেশ অমান্য করে বিনা প্ররোচনায় কখনও প্রথম তীর ছুঁড়তেন না।

এই প্রথম দল প্রেরণের সঙ্গে সঙ্গেই বিশ্বনবী আরও একটি সশস্ত্র অশ্বারোহী দল পাঠান। এ দলে অশ্বারোহী, উষ্ট্রারোহীর সংখ্যা ছিল ত্রিশ জন এবং এর নেতৃত্ব দেন মহাবীর হামযা বিন আবদুল মুত্তালিব (রা.)। এই দলের সাথে আবু জাহেলের নেতৃত্বে তিনশ' অশ্বারোহীর একটি দলের সাক্ষাৎ হয় সমুদ্র তীরবর্তী এক স্থানে। ইবনে ইসহাক লিখছেন মাজীদ বিন আমর নামে অন্য গোত্রের একটি শান্তিপ্রিয় লোক মাঝে পড়ে মধ্যস্থতা না করলে সংঘাত বেঁধে যেতো (সিরাত রসুলাল্লাহ- ইবনে ইসহাক। অনুবাদ- অ এঁরষধঁসব পৃঃ ২৮৩)। লক্ষ্য করুন মুসলিমরা ত্রিশ জন এবং মোশরেকরা তিনশ' অর্থাৎ শত্রু দশগুণ বেশী। নীতি আগ্রাসী হলেও ঐ অবস্থায় সুবুদ্ধির কাজ ছিল সংঘাত এড়িয়ে যাওয়া। কিন্তু মাজীদ মধ্যস্থতা না করলে মৃত্যুভয়হীন দুঃসাহসী ঐ ত্রিশ জনই তিনশ' শত্রুকে আক্রমণ করে বসতেন। আল্লাহ ও তার রসুলের সামরিক নীতি আত্মরক্ষামূলক হলে মহাসম্মানিত সাহাবা হামযা (রা.) সেটার অসম্মান করে আক্রমণ করতেন কি? এর পর মহানবী স্বয়ং কোরাইশদের বিরুদ্ধে বুয়াত ও উশায়রায় দুইটি অভিযানে নেতৃত্ব দেন। এছাড়া উশায়রার অভিযান থেকে ফেরার পরই তিনি মদীনায় উট লুণ্ঠণকারী কুয়য বিন জাবেরের পশ্চাদ্ধাবন করে সাফাওয়ান উপত্যকা পর্যন্ hwb| Gici Avjvni রসুল আবদুল্লাহ বিন জাহাশ (রা.) কে আটজন উষ্ট্ররোহীর দলের নেতৃত্ব দিয়ে মক্কা ও তায়েফের মধ্যবর্তী নাখলা নামক স্থানে পাঠান। এইখানে তারা মক্কার কোরাইশদের একটি কাফেলার দেখা পান। দিনটি ছিল রজব মাসের শেষ দিন। এখানে বলে নেয়া দরকার যে আরবদের মধ্যে চারটি মাস হারাম বা অলংঘনীয় মনে করা হতো। এই কয়েকমাস সর্বপ্রকার যুদ্ধ, মারামারি কঠোরভাবে নিষিদ্ধ ছিল। মহা শত্রুকেও হাতে পেলে কেউ তাকে আঘাত করত না। জাহাশ এবং তার সাথীরা (রা.) সমস্যায় পড়ে গেলেন। কী করা যায় এখন? আক্রমণ করলে নিষিদ্ধ মাস লংঘন করা হয়। আবার না করলে কাফেলাটা হাত ছাড়া হয়ে যায়। সাহাবারা (রা.) নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে আক্রমণ করাই স্থির করলেন। সাহাবারা তখন মাত্র ছয় জন, কারণ উট

হারিয়ে যাওয়ায় দু'জন উট খুঁজতে পেছনে পড়ে গিয়েছিলেন। ঐ ছয় জনের আক্রমণেই মোশরেকদের কাফেলার একজন তীরের আঘাতে নিহত হলো, দুইজন আত্মসমর্পণ করল আর বাকিরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পালিয়ে গেল। কাফেলার মালপত্র ও ঐ দু'জন বন্দী নিয়ে সাহাবারা মদীনায় ফিরে এলেন। নিষিদ্ধ মাসে যুদ্ধ ও মানুষ হত্যা করা হয়েছে বলে বিশ্বনবী দ্বিধান্বিত হয়ে পড়লেন। বন্দী ও গনিমতের মাল গ্রহণ না করে অমীমাংসিত অবস্থায় রেখে দিলেন আল্লাহর নির্দেশের অপেক্ষায়। অচিরেই আল্লাহর নির্দেশ এসে গেল। আল্লাহ তাঁর নবীকে জানালেন- তারা তোমাকে নিষিদ্ধ মাসে যুদ্ধের ব্যাপারে প্রশ্ন করে। ঐ মাসে যুদ্ধ (অবশ্যই) একটি গুরুতর বিষয়। কিন্তু মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে বিরত রাখা, তাকে অস্বীকার করা, পবিত্র মসজিদে (মানুষের গমনাগমন) বাধা দেওয়া এবং সেখান থেকে সেখানকার লোকজন বহিষ্কার করা, আল্লাহর কাছে তার চেয়েও গুরুতর বিষয় (সুরা বাকারা ২১৭)।

এই পরিষ্কার নির্দেশ আসার পর মহানবী বন্দী ও গনিমতের মাল h_vixwZ গ্রহণ করলেন। যারা ইসলামের যুদ্ধকে আত্মরক্ষামূলক বলে বলতে চান অর্থাৎ যাদের সম্বন্ধে আল্লাহ বলেছেন- তোমাদের কী হয়েছে যে, যখন তোমাদের ejv nq Avjvni iv¯ায় অভিযানে বের হও, তখন তোমরা যেন মাটির সাথে মিশে যাও (সুরা তওবা ৩৮), তারা এই ঘটনাকে, তাদের পক্ষে যুক্তি হিসাবে দাঁড় করাবার চেষ্টা করেন। গোঁজামিল দেবার চেষ্টায় তারা বলেন- GB ঘটনায় অর্থাৎ সাহাবারা (রা.) অগ্রগামী হয়ে কাফেলা আক্রমণ করায় বিশ্বনবী ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন।

প্রথম কথা হলো তারা অসত্য বলেন, তিনি ক্রুদ্ধ হন নি। বলেছিলেন আমি তো তোমাদের নিষিদ্ধ মাসে যুদ্ধ করতে আদেশ করিনি (সিরাত রসুলাল্লাহ- ইবনে ইসহাক, অনুবাদ- A Guillaume পৃঃ ২৮৭)। দ্বিতীয় হলো আল্লাহর রসুল এখানে যুদ্ধ করা সম্বন্ধে বলছেন না, বলছেন শুধু নিষিদ্ধ মাস লংঘন Kivi K_v| Aর্থাৎ যুদ্ধ করেছো ঠিকই করেছো, নিষিদ্ধ মাসে কেন করলে? তারপর আল্লাহ যখন এ ব্যাপার তার নির্দেশ দিলেন সেখানেও যুদ্ধ করে

কাফেলা আক্রমণ করে সাহাবারা ভুল করেছেন কিনা সে সম্বন্ধে আল্লাহ কোন কথা বলছেন না। কারণ প্রশ্নই তা নয়, বলছেন তারা প্রশ্ন করছে "নিষিদ্ধ মাসে যুদ্ধ সম্বন্ধে" তারপর আল্লাহ তো সম্পূর্ণ পরিষ্কারই করে দিলেন যে-

ক) আক্রমণাত্মক যুদ্ধ তো ঠিক আছেই। এমন কি

খ) নিষিদ্ধ মাসেও আক্রমণাত্মক যুদ্ধ ঠিক আছে।

অথচ আশ্চর্যের ব্যাপার এই ঘটনাকে আক্রমণাত্মক যুদ্ধের বিপক্ষে প্রমাণ হিসাবে দাঁড় করাবার চেষ্টা করা হয়। আকিদার কী সাংঘাতিক বিকৃতি।

নিজের আসহাব যাঁদের সম্বন্ধে মহানবী বলেছেন, তাঁরা প্রত্যেকে এক একটি নক্ষত্রের মতো, মানুষ তাঁদের যে কাউকে অনুসরণ করতে পারে, সেই আসহাব যাঁরা আল্লাহর রসুলের পদতলে বসে ইসলাম কী, এর উদ্দেশ্য ও j¶¨ Kx, Gi mvgwiK bxwZ Kx- এসব শিক্ষা করেছিলেন তাঁরাই ঠিক, নাকি কয়েকশ' বছর পর যখন ইসলাম বিকৃত, বিপরীত হয়ে পরিণামে শত্রুর গোলামে পরিণত, তখনকার মানুষের অভিমত ঠিক? সাহাবাদের ইতিহাস কী? সাহাবাদের তর্কাতীত ইতিহাস এই যে, যতদিন তাদের প্রাণপ্রিয় নেতা আল্লাহর রসুল তাঁদের মধ্যে ছিলেন ততদিন তাঁরা তার সঙ্গে থেকে অবিশ্রান্ত ভাবে সংগ্রাম করে গেছেন। তারপর যখন তিনি তাদের মধ্য থেকে চলে গেলেন তখন তারা ঐ সংগ্রাম এক মুহূর্তের জন্যও না থামিয়ে পার্থিব সব কিছু বিসর্জন দিয়ে অস্ত্র হাতে সদলবলে আরব থেকে বের হয়ে যেয়ে তদানিন্তb পৃথিবীর দুইটি মহাশক্তিকে (Super power) এক যোগে আক্রমণ করে তাদের পরাজিত করলেন। তারপর তাদের একটা অংশ আরব উপদ্বীপ থেকে বের হয়ে উত্তর আফ্রিকা আক্রমণ করে একের পর এক যুদ্ধে বিজয়ী হতে হতে সমস্ত উত্তর আফ্রিকা জয় করে আটলান্টিক মহাসাগরের উপকূলে পৌঁছে গেলেন। খলিফা ওমরের (রা.) অনুমতি নিয়ে চার হাজার মুসলিম সৈন্য নিয়ে আমর বিন আ'স (রা.) যখন মিশর আক্রমণ করেছিলেন তখন মিশরীয়রা মুসলিম জাতিকে আক্রমণ করার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন এমন কথা আজ পর্যন্ত কোন ইতিহাসবিদ প্রমাণসহ লিখতে পারেন নি। তারপর মুসলিম বাহিনী

আটলান্টিক মহাসাগরের কূল পর্যন্ত পৌঁছতে যে mg¯ জাতিগুলিকে সামরিকভাবে পরাজিত করেছিল তাদের মধ্যে বারবার, নুবীয়ান ইত্যাদি জাতিগুলি তখন পর্যন্ত ইসলাম বলে একটি নতুন দীন বা মুসলিম বলে একটি নতুন জাতির নাম পর্যন্ত শুনে নি, মুসলমানদের আক্রমণ করার কথা চিন্ত করা দূরে থাক। উত্তর আফ্রিকা সম্পূর্ণ দখল করে সেখানে আল্লাহর সত্য দীন প্রতিষ্ঠা করার পর এই উম্মতে মোহাম্মদী যখন ভূমধ্যসাগর পার হয়ে স্পেন আক্রমণ করল তখন স্পেনীয়রা সিংহাসন নিয়ে রাজনৈতিক গোলামালে ব্যস্ত। ভূমধ্যসাগর পার হয়ে এসে আরব, ইরাক, সিরিয়া ও সমগ্র উত্তর আফ্রিকার শাসক উম্মতে মোহাম্মদীকে আক্রমণ করার কথা তাদের স্বপ্নেরও বাইরে।

এতো গেল এই জাতির একটি বাহুর কথা। অন্য বাহুর ইতিহাসও ঐ একই। শত্রুর কোন প্ররোচনা ছাড়াই ঐ বাহু যুদ্ধের পর যুদ্ধে ইসলাম বিরোধী, শান্তি webóKvix, Aত্যাচারী, জালেমদের পরাজিত করে অতি অল্প সময়ের মধ্যে চীন সীমান্ত পর্যন্ত পৌঁছে গেল। এদের মধ্যে অধিকাংশ কখনও ইসলামের, মুসলিমের নামও শোনে নি। যারা ইসলামের জেহাদ, কেতাল, সশস্ত্র সংগ্রামের নীতিকে শুধু আত্মরক্ষমূলক বলে প্রচার করেন তারা হয় এই জাতির ইতিহাসই পড়েন নি, অর্থাৎ নিদারুণ AÁZv, Avi bv nq ciwRZ, অপমানিত, ধূলিসাৎ গোলাম জাতি যে হীনম্মন্যতার রোগে ভুগে তারা সেই রোগে ভুগছেন। দশ হাজার আসহাব মুজাহিদ নিয়ে স্বয়ং রসুলাল্লাহ (দ.) মক্কা যখন অধিকারের জন্য রওনা হলেন তখন মক্কার অধিবাসীদের মুসলিম বাহিনীকে আক্রমণ তো দূরের কথা, কোন প্রতিরোধ পর্যন্ত গড়ে তোলার শক্তি wQj bv- যে কারণে মক্কা বিনা যুদ্ধে জয় হয়েছিল- G K_v BwZnvm। আক্রমণাত্মক যুদ্ধ যদি আল্লাহর আদেশের পরিপন্থী হয়ে থাকে রসুলাল্লাহ (দ.) আল্লাহর আদেশ ভঙ্গ করেছিলেন? (নাউজুবিল্লাহ) আসল কথা হচ্ছে- আল্লাহ বিশ্বনবীকে (দ.) পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন এই জন্য যে তিনি যেb পৃথিবীতে প্রচলিত সব রকম (পূর্ববর্তী বিকৃত ধর্ম ও মানুষের তৈরি জীবনব্যবস্থা) দীন অর্থাৎ জীবন-ব্যবস্থাগুলি অকেজো, নিষ্ক্রিয়, বিলুপ্ত করে

দিয়ে এই শেষ ইসলামকে সমগ্র পৃথিবীময় প্রতিষ্ঠা করে মানবজীবন থেকে সর্বরকম অন্যায়, অবিচার, যুদ্ধ, রক্তপাত, ক্ষুধা, দারিদ্র্য ইত্যাদি দূর করে b¨vq, mwePvi অর্থাৎ শান্তি প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে। অর্থাৎ আল্লাহ শেষনবীকে (দ.) তার জীবনের সমস্ত কর্মকাণ্ডের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। যে কেউ মহানবীর (দ.) জীবনী পড়লেই দেখতে পাবেন তাঁর সমস্তUv cwieÎ জীবন ঐ একটি কাজে ব্যয় হয়েছে, আল্লাহর নির্দিষ্ট করে দেয়া লক্ষ্য মানবজীবনে শান্তি cwZôvi জেহাদে। জেহাদ শব্দের অর্থ হলো কোনো লক্ষ্য অর্জনের জন্য পূর্ণভাবে চেষ্টা করা (Struggle) সর্বতোভাবে, অক্লান্তভাবে চেষ্টা করা। আর অস্ত্র হাতে যুদ্ধ করা হলো কেতাল, অর্থাৎ সশস্ত্র সংগ্রাম। তাহলে কেতাল, সশস্ত্র সংগ্রাম হলো জেহাদের একটা অংশ। সামগ্রিকভাবে GB Rxeb-ব্যবস্থাকে সমস্ত পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াস, সংগ্রামে সব রকমের চেষ্টাই অন্তর্ভুক্ত। প্রথমে যুক্তি দিয়ে, বুঝিয়ে, লিখে, হাতে-কলমে দেখিয়ে এবং কোনো কিছুতেই কাজ না হলে সশস্ত্র সংগ্রাম অর্থাৎ কেতালের মাধ্যমে। এখানে একটি কথা অতি অবশ্যই মনে রাখতে হবে, ব্যক্তি বা দলগত পর্যায়ে কেতাল নেই। কেতাল বা সশস্ত্র যুদ্ধ হচ্ছে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে। একটা জাতি যদি তওহীদের উপর একতাবদ্ধ হয়ে রাষ্ট্র গঠন করে তখন ঐ রাষ্ট্রের নিরাপত্তা, শৃঙ্খলা বিধান ইত্যাদির প্রয়োজনে যুদ্ধ। মানুষ তার অভ্যস্ত বিশ্বাসে এত যুক্তিহীন যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ফেতনা ফাসাদ দূর করে শান্তি আনয়নের জন্য শেষ পর্যন্ত হাতে অস্ত্র নিতে হয়েছে। বিশ্বনবীকেও (`.), Zvi আসহাবদেরও ঐ একই কাজ করতে হয়েছে। তাই কিছুদিনের মধ্যেই জেহাদ (প্রচেষ্টা) ও কেতাল (সশস্ত্র যুদ্ধ) একার্থবোধক হয়ে গিয়েছিল। মহানবীর সমগ্র নব্যুয়তি জীবন ২৩ বছরের মধ্যে মক্কার ১৩ বছর তিনি শুধু আল্লাহর সার্বভৌমত্বের দিকে মানুষকে ডাক দিয়েছেন। এই সময় তিনি অস্ত্র হাতে নেন wb, msNvZ-সংঘর্ষ করেন নি। এমনকি তাঁকে চরম নির্যাতন করা হয়েছিল। তবুও তিনি প্রত্যাঘাত করেন নি। তারপর মদীনার মানুষ যখন তাঁর তওহীদের ডাক গ্রহণ করল, তখন তিনি হেজরত করে সেখানে যেয়ে রাষ্ট্র

গঠন করলেন। যেই রাষ্ট্র গঠন করলেন তখনই নীতি বদলে গেল। কারণ কোনো রাষ্ট্র কোনোদিন ব্যক্তি বা দলের নীতিতে টিকে থাকতে পারে না। তখন তাঁর প্রয়োজন হবে অস্ত্রের, সৈনিকের, যুদ্ধের প্রশিক্ষণের। আল্লাহর রসুলও তাই করলেন– হাতে অস্ত্র নিলেন এবং তখন থেকে তাঁর পবিত্র জীবনের বাকিটার সমস্টাই কাটল যুদ্ধ করে। অর্থাৎ তওহীদ ভিত্তিক এই সত্যদীন প্রচার ও প্রতিষ্ঠায় ব্যক্তি গোষ্ঠী বা দলগতভাবে কোনো কেতাল অর্থাৎ সশস্ত্র যুদ্ধ নেই, আছে শুধু তওহীদের, আল্লাহর সার্বভৌমত্বের আহ্বান, বালাগ দেয়া। ঠিক তেমনি রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে আছে সশস্ত্র যুদ্ধ। রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে অস্ত্র, যুদ্ধ ইত্যাদি যদি আইন সম্মত না হয় তবে পৃথিবীর সব দেশের সামরিক বাহিনীই বে-আইনী, সন্ত্রাসী। কোর'আন ও হাদীসে যে cRnv` I কেতালের কথা আছে তা রাষ্ট্রগত।

তাই কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠী বা দল যদি দীন প্রতিষ্ঠার জন্য অস্ত্র হাতে নেয় তবে সেটা হবে মারাত্মক ভুল। তাদের কাজ হবে মানুষকে যুক্তি দিয়ে কোর'আন-হাদিস দেখিয়ে, বই লিখে, বক্তৃতা করে অর্থাৎ সর্বপ্রকারে মানুষকে এ কথা বোঝানো যে পৃথিবীতে অন্যায়, অবিচার, নির্যাতন, শোষণ, ক্রন্দন, রক্তপাত, যুদ্ধহীন একটি সমাজে নিরাপত্তা ও ন্যায় বিচারের মধ্যে অর্থাৎ নিরঙ্কুশ শান্তিতে বাস করতে হলে একমাত্র পথ যিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন তাঁর দেয়া জীবন বিধান মোতাবেক আমাদের জীবন পরিচালনা করা। সাধারণ জ্ঞানেই বোঝা যায় যে, যিনি যে জিনিস তৈরি করেছেন তাঁর চেয়ে আর কে বেশি জানবে যে জিনিসটি কিভাবে চালালে সেটা ঠিকমত, ভালোভাবে চলবে। আল্লাহ সুরা মুলকের ১৪ নং আয়াতে বলেছেন– যে সৃষ্টি করেছে তার চেয়ে বেশি জান? (তুমি সৃষ্ট হয়ে?) এ যুক্তির কোনো জবাব আছে? কিন্তু আমরা মো'মেন মুসলিম হবার দাবিদার হয়েও দাজ্জালের (ইহুদি খ্রিষ্টান বস্তুবাদী সভ্যতা) নির্দেশে আল্লাহর দেয়া দীন, জীবন-ব্যবস্থা থেকে শুধুমাত্র ব্যক্তিগত অংশটুকু ছাড়া সমষ্টিগত (যেটাই প্রধান) অংশটুকু বাদ দিয়ে সেখানে নিজেরা weavb, AvBb-কানুন, নিয়মনীতি নির্ধারণ করে সেই মোতাবেক আমাদের

সমষ্টিগত জীবন পরিচালিত করছি। ফল কি হয়েছে? শিক্ষা দাক্ষায়, বিজ্ঞানে, প্রযুক্তিতে মানব ইতিহাসের চূড়ান্ত স্থানে উপস্থিত হয়েও আজ পৃথিবী অশান্তি, অন্যায়, অত্যাচার, অবিচার আর মানুষে মানুষে সংঘর্ষ ও রক্তপাতে অস্থির। তাহলে প্রমাণ হয়ে যাচ্ছে যে মানুষ তার জীবন পরিচালনার জন্য যে ব্যবস্থা তৈরি করে নিয়েছে তা তাকে শান্তি ও নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ হয়েছে। কাজেই মানুষকেই বোঝাতে হবে যে এ পথ ত্যাগ করে মানুষের সার্বভৌমত্বকে ত্যাগ করে আল্লাহর রসুল যা শিখিয়েছেন সেই আল্লাহর সার্বভৌমত্বে ফিরে যেতে হবে, সেই সার্বভৌমত্বকে গ্রহণ করে তাঁর দেয়া দীন, জীবন-ব্যবস্থাকে গ্রহণ করে আমাদের জীবনে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এই কাজ কি জোর করে করাবার কাজ? এটাতো সাধারণ জ্ঞানেই বোঝা যায় যে জোর করে, শক্তি প্রয়োগ করে মানুষকে কোনো কিছু বিশ্বাস করানো অসম্ভব।

মানুষকে এই জীবন-ব্যবস্থায় আসতে, তা না আসলেও তাদের উপর এই নতুন শাসন ব্যবস্থা স্থাপন করতে অধিকাংশ মানুষ রাজী হবে না, শেষ পর্যন্ত শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে তা করতে হবে তা স্রষ্টা জানেন, কারণ এই মানব জাতি তিনিই সৃষ্টি করেছেন। তাই এই জীবন-ব্যবস্থায় কেতাল অর্থাৎ সশস্ত্র সংগ্রামের উপর এত গুরুত্ব অর্পিত হয়েছে। সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মান মুজাহিদ ও শহীদদের জন্য রাখা হয়েছে। আমার মনে হয় এই দীনকে মানব জীবনে প্রতিষ্ঠার প্রয়াসের সামরিক ভূমিকা সবচেয়ে সঠিকভাবে পেশ করেছেন আবু যর (রা.)। তিনি বলছেন- Avjvni iv¯ায় জেহাদ ইসলামের বিশেষ কর্তব্য। এই জেহাদের মাধ্যমে মুসলিমরা লোকদের গলায় শিকল দিয়ে আনে। অতঃপর ঐ লোকগণই স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করে নেয় (হাদিস- বোখারি)। এই হাদীসে আবু যর (রা.) তিন শর্তের দ্বিতীয় ও তৃতীয় শর্তের অবস্থার কথা বোঝাচ্ছেন। উভয় শর্তেই অন্যান্য ধর্মের সব মানুষ ব্যক্তিগতভাবে যার যার ধর্মেই থাকতে পারবে, কিন্তু জাতীয়, রাষ্ট্রীয়, আইন হবে শেষ জীবনব্যবস্থা অনুযায়ী সুতরাং তারা ঘনিষ্ঠভাবে মুসলিমদের সংস্পর্শে আসবে, ইসলামকে ঘনিষ্ঠভাবে জানতে পারবে এবং স্বচক্ষে দেখবে কেমন করে এই নতুন Rxeb-

বিধান সব অন্যায়, অবিচার, অশান্তি দূর করে পরিপূর্ণ শান্তি I mwePvi মানুষের মধ্যে প্রতিষ্ঠা করল। তখন তারা নিজে থেকেই এই দীনে প্রবেশ করবে। যদি মুজাহিদরা অস্ত্র হাতে তাদের সম্মুখীন না হতেন, যদি যুদ্ধ করে রাষ্ট্রীয় শক্তি অধিকার না করতেন তবে ঐ সুযোগ তারা পেত না, প্রচারণার wkকার হয়ে চিরদিনই তারা এই নতুন জীবন-বিধানকে অস্বীকার করতে থাকতো।

তা হলে ইসলামের সামরিক নীতি আত্মরক্ষামূলক (Defensive) bv AvµgYvZ¥K (Offensive) এ প্রশ্নের উত্তরে আমরা অনায়াসে বলতে cwi- আক্রমণাত্মক। কিন্তু আজ আক্রমণাত্মক বলতে যে রাজ্য জয়ের, সাম্রাজ্য বিজয়ের অর্থ বোঝায় সে অর্থে নয়। ইসলামের আক্রমণাত্মক নীতি Av`k we¯—ারের, যে আদর্শ পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা হলে মানব জাতির মধ্যে থেকে অন্যায়, অবিচার, অশান্তি, রক্তপাত বন্ধ হবে, শান্তি (ইসলাম) স্থাপিত হবে। কোনো দেশের একটা অংশ যদি সে দেশের সরকারকে অগ্রাহ্য করে সেই অংশে অন্যায়, অত্যাচার, যুলুম শুরু করে এবং সে জন্য দেশের সরকার যদি পুলিশ বা সৈন্যবাহিনী পাঠিয়ে সেখানে দুষ্কৃতিকারীদের আক্রমণ করে, তাদের পরাজিত করে সেখানে আবার আইন-শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা করে তবে তাকে যদি আক্রমণাত্মক যুদ্ধ বলা যায়, তবে ইসলামের সামরিক নীতিও সেই দৃষ্টিতে আক্রমণাত্মক। আল্লাহর পরিষ্কার ভাষায় বলছেন- তাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম করতে থাক যে পর্যন্ত না অশান্তি, অন্যায়, শেষ হয়ে আল্লাহর `xb (Rxeb-ব্যবস্থা) প্রতিষ্ঠিত হয় (সুরা আনফাল ৩৯)। এর চেয়ে স্পষ্টভাবে আর আল্লাহ কী বলবেন? এবং এই জন্যই তিনি একবার নয়, কয়েকবার তার শেষনবীকে (দ.) বলেছেন- তিনিই (আল্লাহ) তাঁর রসুলকে সwVK c_ I সত্যদীন দিয়ে (পৃথিবীতে) পাঠিয়েছেন এই জন্য যে, তিনি (রসুল) যেন Ab¨vb¨ mg¯— দীনকে পরাভূত করে একে প্রতিষ্ঠিত করেন (সুরা তওবা ৩৩, সুরা ফাতাহ ২৮, সুরা সাফ ৯)। এই বিশাল দায়িত্বকে পূর্ণভাবে উপলব্ধি করেছিলেন বলেই বিশ্বনবী (দ.) বলেছেন- আমি আদেশ পেয়েছি (আল্লাহর)

পৃথিবীর মানুষের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম চালিয়ে যেতে যে পর্যন্ bv Zviv সাক্ষ্য দেয় যে আল্লাহ ছাড়া হুকুমদাতা (এলাহ) নেই এবং আমি মোহাম্মদ আল্লাহর রসুল এবং সালাত প্রতিষ্ঠা করে ও যাকাত দেয় (হাদিস- Ave`jvn এবনে ওমর (রা.) থেকে বোখারি)। এবং আল্লাহর ঐ বহুবার পুনরাবৃত্তি করা আদেশ যাকে জোর গুরুত্ব দেবার জন্য তিনি নিজে ঐ কথার সাক্ষী হয়েছেন [আমিই এ কথার সাক্ষী হিসাবে যথেষ্ট - miv dvZvn 280] Ges imjvjvni উপরোক্ত হাদিস দিয়ে তার সমর্থন, এ দু'টোর আসল অর্থ যে উম্মতে মোহাম্মদী হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করেছিলেন তার অকাট্য প্রমাণ এই যে, ঐ D¤§vn wekbexi (`.) ওফাতের সঙ্গে সঙ্গে তাদের পার্থিব সব কিছু কোরবান করে তাদের নেতার উপর আল্লাহর দেয়া দায়িত্বপূর্ণ করতে তাদের দেশ থেকে বের হয়ে পড়েছিলেন। রসুলাল্লাহর (দ.) প্রকৃত সুন্নাহ পালন করেছিলেন।

আল্লাহ যে তাঁর এক লাখ চব্বিশ হাজার, মতান্তরে দুই লাখ চব্বিশ হাজার নবী রসুল (আ.) পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন তার উদ্দেশ্য কী? একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষকে এমন একটা জীবন-বিধান, দীন দেয়া যেটা অনুসরণ করে মানুষের জীবন পরিচালিত করলে মানুষ অন্যায়, অবিচার, অশান্ি, l রক্তপাতহীন, প্রগতিশীল একটা জীবনে বাস করতে পারে। এর প্রধান শর্ত হলো আল্লাহকে একমাত্র জীবন-বিধাতা বলে স্বীকার করে নেওয়া, একমাত্র প্রভু স্বীকার করা, (তওহীদ)। কারণ তা না করলে তার দেয়া জীবন বিধানকে GKgvÎ Rxeb-বিধান বলে স্বীকার করার প্রশ্ন আসে না। দ্বিতীয়ত, যার মাধ্যমে আল্লাহ ঐ বিধান পাঠালেন তাকে প্রেরিত রসুল বলে স্বীকার করা, স্বভাবতই। ঐ নবী রসুলদের জীবনের একমাত্র কর্তব্য ছিল, একমাত্র j¶¨ ছিল যার যার জাতি, কওমের জীবনে ঐ দীন, জীবন-weavb cwZôv Kiv Ges তারা আজীবন ঐ প্রচেষ্টা, সংগ্রাম চালিয়ে গেছেন। তাদের জাতি, জনগোষ্ঠী থেকে যারা ঐ সব নবী রসুলদের (আ.) উপর বিশ্বাস এনে তাদের মাধ্যমে AeZxY Rxeb-ব্যবস্থাকে স্বীকার করেছেন তাদের উপর অবশ্য কর্তব্য হয়ে

গেছে তাদের যার যার নবীকে সর্বতোভাবে সাহায্য করা, যে পর্যন্ না তাদের নবীর উপর আল্লাহর অর্পিত দায়িত্ব পূর্ণ করা হয়। শেষ নবীর (দ.) আগে সব নবীদের উপর জীবন-বিধান আল্লাহ পাঠিয়েছিলেন শুধু তাদের যার যার জাতি, কওম ও জনগোষ্ঠীর জন্য এবং ঐ নবীদের উপর বিশ্বাসীরা তাদের hvi hvi bexi সঙ্গে এক হয়ে যেয়ে তাদের সর্বস্ব দিয়ে সাহায্য করেছেন যাতে তাদের সমস্ জাতি বা জনগোষ্ঠীই তাদের নবীর দীন গ্রহণ করে।

পূর্ববর্তী অন্যান্য নবীদের মতো মুসাও (আ.) এসেছিলেন সীমিত দায়িত্ব নিয়ে। শুধুমাত্র বনি ইসরাইলকে মিশর থেকে উদ্ধার ও তাদের নতুন জীবন-বিধান (সেই পুরানো সনাতন দীনল কাইয়্যেমাহ) দিতে। আর মোহাম্মদ (দ.) কে আল্লাহ পাঠালেন সমস্ পৃথিবী, সমগ্র মানবজাতিকে এই জীবন-ব্যবস্থার অধীনে নিয়ে আসার দায়িত্ব দিয়ে। এ বিশাল দায়িত্ব যে এক জীবনে পালন করার প্রশ্নই আসে না তা যিনি এ দায়িত্ব অর্পণ করেছেন তিনিও জানেন, আর যার উপর অর্পণ করেছেন তিনিও জানেন। তারা এও জানেন যে, পূর্ববর্তী নবীদের উম্মাহগুলির মতো শেষ নবীর (দ.) উম্মাহর উপরও তাদের নবীর (দ.) দায়িত্ব অর্পিত হবে এবং হয়েছে। ঐ উম্মাহ যে তাদের ঐ দায়িত্ব পূর্ণভাবে উপলব্ধি করেছিলেন এবং তা তাদের আকিদাভুক্ত হয়ে গিয়েছিল তার প্রমাণ তাদের আমল, কাজ, যা ইতিহাস। এ ছাড়া তাদের আরব থেকে বের হয়ে সশস্ত্র সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ার আর কোনো ব্যাখ্যা হতে পারে না। কারণ আগেই বলে এসেছি, এ ছাড়া যদি রাজ্য জয়, সাম্রাজ্য স্থাপন তাদের উদ্দেশ্য হয়ে থাকে তবে স্বীকার করতে হবে যে, মানব জাতির মুকুটমনি, বিশ্বনবী (দ.) তার সারা জীবন সাধনা করে, অপরিসীম দুঃখ, কষ্ট, AZ¨vPvi সহ্য করে একটি পররাজ্য লোভী রক্তপিপাসু জাতি সৃষ্টি করে গিয়েছিলেন (নাউযুবিল্লাহ)। আর না হলে স্বীকার করতে হয় যে তারা তলোয়ারের জোরে পৃথিবীর মানুষকে ধর্মান্রিত করতে নিজেদের সর্বস্ব ত্যাগ করে দেশ থেকে বের হয়ে পড়েছিলেন- অর্থাৎ আল্লাহ যে ধর্মে বল প্রয়োগ নিষিদ্ধ করে wদয়েছেন (সুরা বাকারা ২৫৬), তা তারা বুঝেন নি বা বুঝলেও তার তোয়াক্কা

করেন নি (নাউযুবিল্লাহ)। এর কোনোটাই নয়। মোহাম্মদের (দ.) উম্মাহ, উম্মতে মোহাম্মদী তাদের নবী তাদের মধ্য হতে চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে নবীর সুন্নাহ পালন করে মানুষ জাতিকে এই জীবনব্যবস্থার মধ্যে নিয়ে আসতে সব Z¨াগ করে বের হয়ে গেল, তাদের নবীর (দ.) প্রকৃত সুন্নাহ পালন করল। তাদের নবী বলেছিলেন- যে আমার সুন্নাহ ত্যাগ করল সে আমার কেউ নয় (হাদিস)। এই কথা বলে তিনি তার ঐ সুন্নাহ বুঝিয়েছিলেন বলেই ইতিহাসে দেখি তারা এমন কাজ করলেন যা আপাতদৃষ্টিতে বুদ্ধিমানের কাজ বলে মনে nq bv| KviY ejwQ- বিশ্বনবীর (দ.) ওফাতের সঙ্গে সঙ্গে আরবের বিভিন্ন জায়াগায় এই শেষ ইসলামের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান আরম্ভ, তার উপর আবার কয়েকজন মিথ্যা নব্যুয়তের দাবিদার। এই বিরুদ্ধ শক্তি যে অত্য¯ ce j wQj এবং নতুন ইসলামী রাষ্ট্রের অবস্থা যে কতখানি নাজুক ও আশংকাজনক হয়ে দাঁড়িয়েছিল তার প্রমাণ ইয়ামামার যুদ্ধসহ অন্যান্য যুদ্ধগুলির প্রচণ্ডতা। যে কোনো বিচক্ষণ লোকের দৃষ্টিতে মনে হবে যে ঐ মহাবিপদ কাটিয়ে ওঠার পর ঐ সদ্যজাত ছোট্ট রাষ্ট্রের নেতাদের উচিত ছিল সময় ব্যয় করা, জাতির ভিত্তিও নিরাপত্তা আরও সুদৃঢ় করার জন্য। পৃথিবীর দু'টি বিশ্বশক্তির মুখোমুখী হবার আগে উচিৎ ছিল নিজেদের অবস্থান আরও দৃঢ় করা, আরও প্রশিক্ষণ নেওয়া, অস্ত্রশস্ত্র, রসদের যথেষ্ট বন্দোব¯ করা। কিন্তু ইতিহাস দেখি বিদ্রোহ দমন করে মদীনাতে ফিরে আসার আগেই সেনাপতি খালেদ বিন ওয়ালিদের (রা.) কাছে আবু বকরের (রা.) হুকুম গেল ওখান থেকেই পারস্য সাম্রাজ্যের দিকে অগ্রসর হয়ে তাদের সামনে সেই তিন শর্ত পেশ করার এবং সেই সামান্য সংখ্যক যুদ্ধক্লা¯ সৈন্য নিয়েই খালেদ (রা.) রওনা হয়ে গেলেন। অবশ্যই তার সামনে লক্ষ্য পারস্য সাম্রাজ্য আক্রমণ করা, কারণ প্রথম বা দ্বিতীয় শর্ত মেনে নেবার সম্ভাবনা শূন্যের কোঠায়, কারণ পারস্য সাম্রাজ্য তখন দুই বিশ্ব শক্তির অন্যতম। যারা ইসলামের সামরিক নীতি শুধুমাত্র আত্মরক্ষামূলক বলে চালাতে চান তাদের জ্ঞাতার্থে জানাচ্ছি যে, এই সময়

পারস্য শক্তি ইসলামকে আক্রমণ করতে আসেই নাই এমন কি আক্রমণের কোনো প্রস্তুতিও নিচ্ছিল বলে ইতিহাসে কোনো প্রমাণ নেই।

আসল কারণ তা নয়। আসল কারণগুলো হলো নেতা (দ.) তাদের মধ্য থেকে চলে যাবার পর নেতার সংগ্রাম যেন একটুক্ষণের জন্যও বন্ধ না হয়, না থামে, এমনি ছিল তাদের মনের অবস্থা, আকিদা। নেতার অসমাপ্ত কাজকে সমাপ্তির পথে অগ্রসর করতে, নিজেদের উম্মতে মোহম্মদী প্রমাণ করতে তাদের দেরি সহ্য হয় নি। ঐ বিশাল কাজের জন্য যে নিজেদের প্রস্তুত করে নিতে হবে এ কথা সাধারণ জ্ঞানে বুঝেও অতটুকু তর তাদের সয়নি। কারণ তারা ছিলেন সত্যিকার উম্মতে মোহাম্মদী, মোহাম্মদের (দ.) নিজের হাতে গড়া জাতি, যাদের তিনি নিজে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন ইসলামের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য কি এবং তার প্রক্রিয়া কি। তাই এরপর ইতিহাসে দেখি ঐ সদ্য প্রসূত জাতি, যার bvix-পুরুষ, বৃদ্ধ-শিশু মিলিয়ে পাঁচ লাখও সংখ্যায় হবে না, UvKv bvB, cqmv নাই, প্রাকৃতিক সম্পদ নাই, কিছুই নাই, প্রায় নিরস্ত্র, তবুও তাদের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য দেশ থেকে বের হয়ে যেয়ে তদানীন্তন পৃথিবীর দুই বৃহৎ শক্তি- যাদের আমরা বলি পরাশক্তি (Super power) তাদের অপরিমীত সম্পদ, অসংখ্য লোকবল, উন্নত প্রযুক্তি এবং বিরাট সুসজ্জিত, সুশিক্ষিত সামwiK বাহিনীগুলির সম্মুখীন হয়ে দাঁড়ালো। সামরিক দৃষ্টিকোণ থেকে এ যেন ছিল এক আত্মহত্যার মতো। যে মুজাহিদরা আরব থেকে বের হয়ে ঐ বিশ্ব শক্তিগুলির সামনে দাঁড়িয়ে তাদের নবীর সুন্নাহ অনুযায়ী তিন শর্ত দিয়েছিলেন শুধু তাদের আত্মহত্যাই নয়, তাদের ঐ নতুন জাতিটিরও আত্মহত্যা। কারণ hw` তারা ঐ অসম যুদ্ধে হেরে যেতেন তবে তাদের ঐ দুঃসাহসের, nVKwiZvi kw¯ দিতে ঐ বিশ্ব শক্তিদু'টো আরবের ভেতরে ঢুকে ঐ নতুন রাষ্ট্রটাকে ধ্বংস করে দিতে পারতো এবং তাহলে আজ ইসলাম বলে কোনো দীন, মুসলিম বলে কোনো জাতি থাকতো না। এসব সত্ত্বেও ইতিহাস হলো এই যে, ঐ বিশ্ব শক্তি দু'টি উম্মতে মোহাম্মদীর তিন শর্তের মধ্যে শেষ শর্তটিই বেছে নিয়েছিল এবং ফলে নিজেরা টুকরো টুকরো হয়ে ধ্বংস হয়ে

গিয়েছিল এবং মাত্র ৬০/৭০ বছরের মধ্যে পশ্চিমে মরক্কোতে, আটলান্টিক মহাসাগরের উপকূল থেকে পুর্বে চীনের সীমান্ত আর উত্তরে কাস্পিয়ান সাগর থেকে দক্ষিণে ভারত মহাসাগর পর্যন্ত we i√U এলাকায় এই শেষ জীবনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ফলে এই অঞ্চলের মানুষের জীবনে নেমে আসে এক অনাবিল শান্তি, ন্যায় ও সুবিচার। আপাতদৃষ্টিতে এই মহা বিজয় কি করে সম্ভব এ এক প্রশ্ন। এর উত্তর হলো, যেহেতু ঐ উম্মাহ, জাতি আল্লাহর শেষ নবীর (দ.) অসমাপ্ত কাজ পূর্ণ করতে জীবনের সব কিছু ত্যাগ করে বের হয়ে পড়েছে কাজেই আল্লাহ স্বয়ং ঐ উম্মাহর সঙ্গে থেকে তাদের সাহায্য করেছিলেন, আর আল্লাহ যাদের সাহায্যকারী, অভিভাবক তাদের পরাজিত করে কোন শক্তি? ঐ উম্মাহও জানতেন আল্লাহ যে কারণে পৃথিবীতে তার নবীদের বিশেষ করে তার শেষ নবীকে (দ.) পাঠিয়েছিলেন- A_√r me√Z!K সংগ্রামের মাধ্যমে পৃথিবীতে আল্লাহর দেয়া দীন প্রতিষ্ঠা, তাই করতে তারা অগ্রসর হয়েছেন কাজেই তাদের সাহায্য করতে আল্লাহ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ (সুরা বাকারা ২৫৬)। আল্লাহর সাহায্য সম্পর্কে কতখানি নিশ্চিত হলে কোনো মানুষ [আবু বকর (রা.)], খালেদ বিন ওয়ালিদ (রা.) কে মাত্র আঠার হাজার রণক্লান্ত সৈন্য নিয়ে বিশ্বশক্তি পারসিক সাম্রাজ্য আক্রমণ করতে আদেশ দেন এবং অন্য আরেক জন [ওমর (রা.)] আমর ইবনুল আ'সকে (রা.) মাত্র চার হাজার মুজাহিদ নিয়ে পূর্বে রোমান সাম্রাজ্যের অধীন মিশর আক্রমণের আদেশ দিতে পারেন। আবু বকর (রা.) ও ওমর (রা.) দু'জনেই যে ভুল করেন নি, আল্লাহ যে সত্যই তাদের সর্বতোভাবে সাহায্য করেছিলেন তার প্রমাণ পরবর্তী ইতিহাস। ঐ উম্মাহ ৬০/৭০ বছর পর্যন্ত সংখ্যায় তাদের চেয়ে দ্বিগুণ, তিনগুণ এমনকি কোনো কোনো যুদ্ধে পাঁচ, ছয়গুণ বেশি শত্রুর সঙ্গে লড়েছেন কিন্তু কোনো গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধে পরাজিত হন নি।

আল্লাহর শেষ বই এই কোর'আনে ও তার শেষ নবীর (দ.) Rxebx I Z√i হাদিসগুলি যারা এমন কি ভাসা ভাসা ভাবেও পড়েছেন তারাও লক্ষ্য না করে পারবেন না যে, এই শেষ জীবন-ব্যবস্থার অনুসারীদের মধ্যে সর্বোচ্চ পুরস্কার

ও সর্বোচ্চ সম্মান রাখা হয়েছে অন্যায়, অবিচারের বিরুদ্ধে সংগ্রামে প্রাণ উৎসর্গকারীদের (শহীদ) জন্য। সবার কাজের বিচার হবে, তাদের হবে না, প্রথম রক্তবিন্দু মাটিতে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদের সমস্ cvc, mg¯ ¸Yvn আল্লাহ মুছে ফেলে তাদের সঙ্গে সঙ্গে জান্নাতে দাখেল করে দেবেন। এ পুরস্কার আর কাউকে দেবার প্রতিশ্রুতি দেন নি। শুধু তাই নয়, আল্লাহ আমাদের বলছেন- তোমরা তাদের মৃত পর্যন্ বলবে না (সুরা বাকারা ১৫৪, miv আলে ইমরান ১৬৯)। তারা শহীদ হউন, কিন্তু আমাদের চোখে তো অন্ত তারা অন্যের মতোই মারা গেলেন। তবু আমাদের মুখ দিয়েও বলার অধিকার নেই যে তারা মরে গেছেন। উম্মতে মোহাম্মদীর, মো'মেনের, মুসলিমের সর্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার ও সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মান। কতখানি স্নেহের চোখে দেখলে আল্লাহ এ সম্মান দিতে পারেন। সশস্ত্র সংগ্রামে, যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ উৎসর্গকারীকে সর্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার ও সম্মান দেয়ার প্রকৃত অর্থ কি? এর অর্থ হচ্ছে, এই জাতির উম্মাহর জন্য আল্লাহ লক্ষ্য স্থির করে দিয়েছেন। আর তা হচ্ছে সমস্ পৃথিবীতে শেষ নবীর (দ.) মাধ্যমে প্রেরিত শেষ জীবন-weavb প্রতিষ্ঠা করে সমস্ gvbe RwZi Rvbনে ন্যায় ও শান্তি Avbqb Kiv| Avjvn খুব ভাল করেই তার সৃষ্ট মানুষকে জানেন। তিনি জানেন যে, পূববর্তী বিকৃত ধর্মগুলিকে ও মানুষের নিজেদের তৈরি ব্যবস্থাগুলিকে মানুষ এমন অন্ধভাবে আঁকড়ে ধরে আছে যে, সবিনয়ে আহ্বান করলেই তারা তা ছেড়ে সঠিক পথে আসবে না। লক্ষ যুক্তি প্রমাণ তবলীগ কোনো কাজে আসবে না। তারা বাধা দেবে, সর্বতোভাবে দেবে এবং সশস্ত্রভাবে দেবে এবং সেই সশস্ত্র বাধাকে ভেঙ্গে এই দীনকে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। অন্য কথায় পৃথিবীতে প্রচলিত সব রকম ভুল ও অন্যায় ব্যবস্থাকে পরাভূত করে মানুষের জীবনে শান্তি cwZôvi চেষ্টায় যারা নিজেদের প্রাণ উৎসর্গ করলেন তারা হলেন শহীদ। একদিকে ইবলিসের চ্যালেঞ্জে আল্লাহকে জয়ী করার জন্য, অন্যদিকে পৃথিবীর মানুষের কল্যাণের জন্য পার্থিব সব কিছু এবং শেষ পর্যন্ নিজেদের প্রাণটুকুও কোরবানী করে দেওয়ার চেয়ে বড় কাজ আর কি হতে পারে? তাই এর

পুরস্কার ও সম্মান আল্লাহর কাছে সবচেয়ে বড়। এই জন্য এই দীনে এর mvgwরক দিকটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং আল্লাহ ও তার রসুল (দ.) এই দিকটাকেই সবচেয়ে প্রাধান্য ও জোর দিয়েছেন। সামরিক দিক এই জাতিকে কতখানি প্রভাবিত করেছিল, সমস্ত জাতিটার চরিত্র কতখানি পরিবর্তিত করে ফেলেছিল তার একটু আভাস দিচ্ছি। আগে পারসিকরা বিশ্বাস কোরত যে, একজন পারসিক সৈন্য দশজন আরবের সমান। তারা অবজ্ঞা ভরে আরবদের ডাকতো ভিক্ষুকের জাত বলে।

তারপর সব মিলিয়ে মাত্র তেইশ বছরের সাধনায় বিশ্বনবী (দ.) ঐ আরবকেই রূপান্তরিত করলেন একটি জাতিতে, যে জাতি ঐ পারসিকদের যুদ্ধক্ষেত্রে তুলোর মতে উড়িয়ে দিলো। দেখা গেল তখন একটা মুসলিম মুজাহিদ দশটা পারসিক সৈন্যের সমান। অর্থাৎ একদম উল্টো। তফাৎটা লক্ষ্য কোরুন, এক পুরুষেরও তফাৎ নয়, মাত্র কয়েকটা বছর, এবং সেই মানুষগুলিই যারা নিজেরাই স্বীকার করতেন যে একজন পারসিক সৈন্য দশজন আরবের সমান, তারাই যখন ইসলাম গ্রহণ করে সেই পারসিকদের মুখোমুখী হয়ে দাঁড়ালেন তখন দেখা গেল, এবার তারাই একজন, দশজন পারসিক সৈন্যের সমান। এই তফাৎ কিসে আনল? নিঃসন্দেহে ইসলাম। অর্থাৎ এই জীবন-ব্যবস্থা, এই দীন একজন মানুষকে দুর্ধর্ষ যোদ্ধায় পরিণত করে, একটি জাতিকে যুদ্ধক্ষেত্রে অপরাজেয় করে দেয়। যদি তা না করে তবে সেটা আর বিশ্বনবীর (দ.) শেখানো ইসলাম নয়, তা বর্তমানের বিকৃত, প্রাণহীন, তথvKw_Z, বিপরীতমুখী ইসলাম। যেটা ধর্মব্যবসায়ীদের হাতে বন্দী হয়ে স্থবির হয়ে গেছে। ইসলামকে জাতীয় ও ব্যক্তিগত জীবনে প্রতিষ্ঠা করলে নিজে থেকেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে একটি জাতি দুর্ধর্ষ যোদ্ধায় পরিণত হতে বাধ্য, এমনি করেই Avjøvn GB Rxeb-ব্যবস্থাটা তৈরি করেছেন এবং কাজেই এর শ্রেষ্ঠ পুরস্কার ও m¤§ান যোদ্ধাদের জন্য রেখেছেন। কারণ পরম জ্ঞানী আল্লাহ জানেন যে, যতই প্রচার, তবলীগ করা হোক শেষ পর্যন্ত ঐ সংগ্রাম ছাড়া এ দীনকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা করানো যাবে না। যারা ইসলামের কেতাল অর্থাৎ সশস্ত্র

সংগ্রামকে শুধু আত্মরক্ষামূলক বলে মনে করেন তাদের জ্ঞাতার্থে নিবেদন এই যে, তাই যদি হতো তবে মহানবীর (দ.) আসহাব তার ওফাতের পর দল বেঁধে আরব থেকে অস্ত্র হাতে বের হয়ে পৃথিবীকে শাসন করার ক্ষমতা তাদের হাতে ছেড়ে দেবার আহ্বান করতেন না, আরবে বসেই তারা মহা উৎসাহে বর্তমানের মুসলিমদের মতো নামায, রোযা, হজ্ব, যাকাত ইত্যাদি করতে থাকতেন। এবং তাহলে আজ যারা একে শুধু আত্মরক্ষার যুদ্ধ বলেন তারা নামাবলী গায়ে দিয়ে মুর্তিপূজা করতেন, কিম্বা গলায় ক্রশ ঝুলিয়ে গির্জায় যেতেন, আর না হলে বুদ্ধ মুর্তির সামনে চোখ বুজে বসে বুদ্ধং শরণং গচ্ছামী জপতেন।

কিন্তু কথা আছে। আহ্বান করে, বুঝিয়ে মানুষকে এই জীবন-বিধানের আওতায় আনার চেষ্টায় বিফল হয়ে অস্ত্র ধরা এবং মানুষকে অস্ত্রের জোরে ধর্মান্‌iZ Ki\- এই দু'য়ের মধ্যে সূক্ষ্ম অথচ বিরাট এক পার্থক্য আছে। আল্লাহর রসুল (দ.) তার জীবনেই ঐ পার্থক্যকে পরিষ্কারভাবে তার সাহাবাদের অর্থাৎ উম্মতে মোহাম্মদীকে বুঝিয়ে দিয়ে গেছেন এবং ঐ উম্মাহ পরবর্তীকালে তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করে গেছেন। পার্থক্যটা হচ্ছ GB: একদিকে যেমন আল্লাহ বিশ্বনবীকে (দ.) জানিয়ে দিলেন যে তাকে তিনি পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন এই জন্য যে তিনি (নবী) পৃথিবীর সমস্ত iKg Rxeb-ব্যবস্থাকে নিষ্ক্রিয়, অকেজো করে দিয়ে এই ব্যবস্থা, শেষ ইসলামকে পৃথিবীময় প্রতিষ্ঠা করেন (সুরা ফাতাহ ২৮, আত তওবা ৩৩, আস সাফ্ ৯)। ঐ সঙ্গে \Zনি উম্মতে মোহাম্মদীকে আদেশ করেছেন সশস্ত্র সংগ্রাম করে এই দীন mg¯ পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা করে সমস্ত অশান্তি, অন্যায়, রক্তপাত নিশ্চিহ্ন করে পৃথিবীতে শান্তির রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে (সুরা আনফাল ৩৯)। তার (দ.) নিজের প্রতি আল্লাহর ঐ আদেশ এবং মুসলিম উম্মাহর প্রতি আল্লাহর আদেশকে একত্র করলে যা হয় রসুলাল্লাহ (দ.) তা আমাদের জানিয়ে দিচ্ছেন। বলছেন- আমি আদিষ্ট হয়েছি (আল্লাহ কর্তৃক) সশস্ত্র সংগ্রাম চালিয়ে যেতে, যে পর্যন্ত না পৃথিবীর মানুষ আল্লাহকে একমাত্র প্রভু ও আমাকে তার

প্রেরিত বলে স্বীকার করে নেয়, সালাত প্রতিষ্ঠা করে ও যাকাত দেয় (হাদিস- আবদুল্লাহ এবনে ওমর (রা.) থেকে বোখারি, মেশকাত)। এক কথায় জেহাদ কার্যতঃ মুসলিম জাতির জন্য অবশ্য কর্তব্য, ফরদ হয়ে গেল।

এখানে জেহাদ বলতে আমি সশস্ত্র সংগ্রাম, কেতালকে বোঝাচ্ছি। কারণ নিজ AvZ¥i, ¥ici, K-প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে জেহাদ থেকে শুরু করে কথা বলে, যুক্তি দিয়ে, লিখে মানুষকে ইসলামের দিকে আহ্বান করার জেহাদতো আছেই, আমি উপরোক্ত ব্যাপারে সশস্ত্র সংগ্রামের কথা বলছি এই জন্য যে, কোর'আনের যে আয়াত ও বিশ্বনবীর (দ.) যে হাদীসের উদ্ধৃতি দিলাম, উভয়টাকেই আল্লাহ ও তার রসুল (দ.) জেহাদ শব্দ ব্যবহার করেন নি, করেছেন কেতাল শব্দ ব্যবহার, যার অর্থ সশস্ত্র সংগ্রাম, যুদ্ধ। অন্য দিকে তেমনি আল্লাহ নির্দেশ দিচ্ছেন, "জোর করে কাউকে ধর্মান্তরিত করবে না" (সুরা বাকারা ২৫৬)। আল্লাহ তার নবীকে (দ.) ও তার উম্মাহকে আদেশ দিচ্ছেন সশস্ত্র সংগ্রাম করে সমস্ত পৃথিবীর মানুষকে এই শেষ ইসলামের মধ্যে নিয়ে এসে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য, আবার বলছেন কাউকে জোর করে ধর্মান্ত¥iZ করবে না- Aপাতদৃষ্টিতে এ অসামঞ্জস্যপূর্ণ আদেশকে শেষ নবী (দ.) পরিষ্কার করে দিয়েছেন অনেক বার। যখনই তিনি তার মুজাহিদদের কোনো শত্রুর বিরুদ্ধে পাঠিয়েছেন, প্রত্যেকবার তিনি তাদের নির্দেশ দিয়ে দিয়েছেন যে প্রত্যেক সংঘর্ষের আগে বিরোধীদের তিনটি শর্ত দেবে। যে শর্তগুলি এর আগে উল্লেখ করে এসেছি। উদ্দেশ্য অতি পরিষ্কার। এ দীন আমাদের সমস্ত পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা করতেই হবে, তা না হলে পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে না। এই কাজ করতেই আল্লাহ তার নবীকে (দ.) পাঠিয়েছেন। এই করতেই আমরা পার্থিব সর্ব কিছু কোরবান করে এখন প্রাণটাও কোরবান করতে তোমাদের সামনে দাঁড়িয়েছি। কিন্তু কাউকে জোর করে ধর্মান্ত¥iZ Kiv আমাদের উদ্দেশ্য নয়। উদ্দেশ্য রাষ্ট্রীয়, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা হবে এই শেষ ইসলামের ব্যবস্থা অনুযায়ী। কিন্তু যাদের ইচ্ছা তারা ব্যক্তিগতভাবে তাদের পূর্ববর্তী বিকৃত দীনকে ধরে রাখতে পারে, আমাদের আপত্তি নেই।

সর্বাত্মক সংগ্রাম করে প্রয়োজনে যুদ্ধ করে জাতীয় জীবনে শান্‌ি cÖZôv । ব্যক্তিকে তার সম্পূর্ণ স্বাধীন ইচ্ছার উপর ছেড়ে দেয়া- এই হলো দীন বিস্‌ তারের "জেহাদ" ও "ধর্মে শক্তি প্রয়োগ নেই"- এর সীমারেখা ও পার্থক্য। এই সীমারেখা সম্বন্ধে উম্মতে মোহাম্মদীর ধারণা অর্থাৎ আকিদা কত পরিষ্কার ছিল তা আমরা দেখি খলিফা ওমরের (রা.) কাজে। পবিত্র জেরুসালেম শহর মুজাহিদ বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করার পর খলিফা ওমর বিন খাত্তাব (রা.) ঘুরে ঘুরে শহরের দর্শনীয় বস্তুগুলি দেখার সময় যখন খ্রিষ্টানদের একটি অতি প্রসিদ্ধ গির্জা দেখছিলেন তখন নামাযের সময় হওয়ায় তিনি গির্জার বাইরে যেতে চাইলেন। জেরুজালেম তখন সবেমাত্র মুসলিমদের অধিকারে এসেছে, তখনও কোন মসজিদ তৈরিই হয় নি, কাজেই নামায খোলা ময়দানেই পড়তে হতো। জেরুসালেমের প্রধান ধর্মাধ্যক্ষ বিশপ সোফ্রোনিয়াস ওমরকে (রা.) অনুরোধ করলেন ঐ গির্জার মধ্যেই তার সঙ্গী-সাথীদের নিয়ে নামায পড়তে। ভদ্রভাবে ঐ অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করে ওমর (রা.) গির্জার বাইরে যেয়ে নামায পড়লেন। কারণ কি বললেন তা লক্ষ্য কোরুন। বললেন- আমি যদি ঐ গির্জার মধ্যে নামায পড়তাম তবে ভবিষ্যতে মুসলিমরা সম্ভবতঃ একে মসজিদে পরিণত করে ফেলতো। একদিকে ইসলামকে পৃথিবীময় প্রতিষ্ঠিত করতে সর্বস্ব পণ করে দেশ থেকে বেরিয়ে সুদূর জেরুসালেমে যেয়ে সেখানে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ইসলাম প্রতিষ্ঠা, অন্যদিকে খ্রিষ্টানদের গির্জা যেন কোনো অজুহাতে মুসলিমরা মসজিদে পরিণত না করে সে জন্য অমন সাবধানতা। এই হলো "ধর্মে বল প্রয়োগ নেই" এবং 'সশস্ত্র সংগ্রাম করো যে পর্যন্‌ না পৃথিবী থেকে সমস্‌ অন্যায়, রক্তপাত, অশান্‌ি শেষ হয়ে না যায়' এর প্রকৃত অর্থ। ঐ অর্থ এবং তফাৎ বিশ্বনবীর (দ.) আসহাব এবং উম্মতে মোহাম্মদী সঠিকভাবে বুঝেছিলেন বলেই তারা সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে পৃথিবীর যে বিরাট অংশে দীন ইসলাম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সেখানে ইসলামিক, রাজনৈতিক, আর্থ-সামাজিক ও আইন প্রশাসন ব্যবস্থা চালু করলেও কাউকে বল প্রয়োগে কিম্বা প্রলোভন দেখিয়েও ধর্মান্‌রিত করেন নি। করলে ঐ বিরাট

ভূখণ্ডে আজ একটাও অমুসলিম থাকতে পারত না। বরং অন্যান্য ধর্মের মন্দির, গির্জা সীনাগগের রক্ষা ও নিরাপত্তার ভার ছিল মুসলিমদের হাতে। অমুসলিমদের ধর্মীয় স্বাধীনতাসহ সব রকমের অধিকারকে রক্ষা করতে ইসলামী রাষ্ট্র ও মুসলিম প্রশাসন কত দূর গেছে তার হাজারো ঘটনা ইতিহাস হয়ে আছে, যা পড়লে হতবাক হয়ে যেতে হয়। এমন ঘটনা দিয়ে এই উম্মাহর ইতিহাস ভরপুর যেখানে তারা একটি অমুসলিম জাতির সামরিক প্রতিরোধ চূর্ণ করে তাদের ইসলামী আইন ও শাসনের অধীনে এনেছে, তারপর অল্পদিনের মধ্যেই এই নতুন জীবন-ব্যবস্থার ফলে সুবিচার, শান্ত I নিরাপত্তা দেখে অভিভূত হয়ে দলে দলে অমুসলিম স্বেচ্ছায় ইসলামে প্রবেশ করেছে, ফলে মুসলিমরা সংখ্যাগরিষ্ঠে পরিণত হয়েছে। সশস্ত্র সংগ্রাম করে তাদের ইসলামের জীবন-ব্যবস্থার অধীনে না আনলে লক্ষ যুক্তি-তর্কে ও তবলিগে এটা ঘটতে পারতো না। তাই আবু যর (রা.) বলেছিলেন- Avjvni i\¯ায় জেহাদ ইসলামে এক বিশেষ কর্তব্য। এই জেহাদের মাধ্যমে মুসলিমরা লোকদের গলায় শিকল দিয়ে নিয়ে আসেন; অতঃপর ঐ লোকগণই স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করে নেয়।

মানব জাতির নিখুত আদর্শ, স্রষ্টার শ্রেষ্ঠ রসুলের (দ.) অনুসারী এই মহাজাতির এই যে চরম আত্মত্যাগ এর একমাত্র কারণ সমস্ত পৃথিবীতে শান্তি, ইসলাম স্থাপন, ইবলিসের যে চ্যালেঞ্জ আল্লাহ গহণ করেছেন তাতে আল্লাহকে জয়ী করা। আল্লাহর জন্য ও মানুষের কল্যাণের জন্য উভয় দিক থেকেই এর চেয়ে বড়, এর চেয়ে মহান কাজ, মহান আমল আর সম্ভব নয়। তাই সর্বজ্ঞানী সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারক স্রষ্টা এই সর্বত্যাগী সংগ্রামীদের জন্য রেখেছেন তার সর্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার- বিনা বিচারে দেহান্তরের সঙ্গে সঙ্গে সবো\Ëg জান্নাত আর রেখেছেন এ উম্মাহর সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মান- তাদের মৃত পর্যন্ত ejvi উপর নিষেধাজ্ঞা। অথচ সভ্যতার দাবিদার পাশ্চাত্যের বুদ্ধিবাদী এবং শিক্ষিতরা এই মহান ব্রতকে সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন, তলোয়ারের জোরে ধর্মান্তর করা বলে অভিহিত করেছেন। শুধু তাই নয় তাদের শিক্ষায় শিক্ষিত

প্রাচ্যের, এমন কি এই জাতির অন্তর্ভুক্ত অনেক বুদ্ধিজীবীও তাদের প্রভুদের সুরে সুর মিলিয়েছেন। তবে সবাই নয়। এ দীনের, জীবনব্যবস্থার বিরোধী পাশ্চাত্যের পণ্ডিতদের প্রত্যেকেই যে অন্ধ তা নয়। কেউ কেউ আছেন ও ছিলেন যারা সত্য আংশিকভাবে হলেও দেখতে পেয়েছেন এবং স্বীকার করেছেন। যেমন De Lacy O Leary লিখেQb, ÔBwZnvmB GK_v পরিষ্কার করে দেখায় যে, ইতিহাসবেত্তারা যত কিছু পুনরাবৃত্তি করেছেন তার মধ্যে পৃথিবীতে দ্রুত ধাবমান ধর্মান্ধ গোঁড়া মুসলিম তলোয়ারের জোরে অন্য জাতিগুলির উপর ইসলাম চাপিয়ে দিচ্ছে, এই উপকথা অত্যন্ত উদ্ভট কল্পনা ও nvm¨Ki wg_¨vi Ab¨Zg (Islam at the cross Roads – D Lacy O Leary)। এখানে লক্ষ্য কোরুন লেখক, পুনরাবৃত্তি শব্দটা ব্যবহার করেছেন অর্থাৎ এই উদ্ভট কল্পনা ও হাস্যকর মিথ্যাটি যে তথাকথিত ইতিহাসবেত্তারা বারবার উল্লেখ করেছেন, লিখেছেন সে সম্বন্ধে তিনি সচেতন।

এ গেল তলোয়ারের জোরে ইসলাম চাপিয়ে দেয়ার ব্যাপার। তারপর কেন এ সংগ্রাম এ সম্বন্ধে ইতিহাসবেত্তা Lothrop লিখেছেন- "যে পুরাতন প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও পুরুষানুক্রমিক রক্তাক্ত বিবাদের দরুন ও আত্মকলহে তাদের শক্তি নিঃশেষ হোচ্ছিল তা ভুলে যেয়ে এবং নতুন বিশ্বাসের আগুনে উজ্জ্বল ঐক্যে দৃঢ় সংঘবদ্ধ হয়ে আরবরা তাদের মরুভূমি থেকে বানের ঢলের মত নির্গত হলো- GK Ges mZ¨ Avjvni Rb¨ cথিবী জয় করতে।" তারপর এ `xb Rxeb-বিধান যে কোনো জাতি বা গোত্র বা ঐ ধরনের কোনো কিছুর মধ্যে সীমিত থাকার জন্য নয়, এ দীনকে অধ্যয়ন করার পর এ কথাও অনুধাবন করতে পেরেছেন অনেকেই। যেমন বিশ্বনবী (দ.) সম্বন্ধে লিখতে চেয়ে Joseph J. Nunan লিখেছেনঃ His creed.... necessarily connotes the existance of Universal empire. A_vr Zvi (মোহাম্মদ) ধর্ম অবশ্যই একটি বিশ্ব সাম্রাজ্যের অর্থ বহন করে (Islam and European Civilization – Joseped J. Nunan)|

মনে রাখতে হবে যে খ্রিষ্টান ঘঁহধহ এ কথা মহানবী (দ.) বা ইসলামের প্রশংসায় বলছেন না, বলছেন নিন্দা করে। অ_vr wek mvgvR¨ cwZôvi gZ নিন্দনীয় কাজ হচ্ছে মোহাম্মদের (দ.) এবং তার ধর্মের। এটা যে ঘঁহধহ এর দৃষ্টিতে সাম্রাজ্যবাদ তার কারণ পৃথিবীময় একটা আদর্শ, একটি সংবিধান প্রতিষ্ঠা তাদের আকিদায় (ঈড়হপবঢ়ঃ) এ আসে না। আমার বক্তব্য হচ্ছে, ঐ সব খ্রিষ্টান চিন্তাবিদরা যে সত্য এই দীনে দেখতে পেয়েছেন অর্থাৎ-

ক) তলোয়ারের জোরে মানুষকে এ দীন গ্রহণ করতে বাধ্য করা হয় নি।

খ) এই উম্মাহ একটি আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করেছে এবং

M) H Av`kwU mg¯ পৃথিবীর মানব জাতির জন্য। এই সত্য আজ এই RwZi mg¯ রকম কাজ, চিন্তা এবং আকিদার বাইরে। ওগুলো কোনোটার মধ্যেই আজ এই জাতি নেই। আছে হাস্যকর খুটিনাটির মধ্যে জড়িয়ে, স্থবির হয়ে মাকড়সার জালে আবদ্ধ মাছির মত। দীনের প্রকৃত উদ্দেশ্য বিশ্বনবীর (দ.) ও তার আসহাবদের (রা.) প্রকৃত সুন্নাহ থেকে যে তারা লক্ষ কোটি মাইল দূরে সে বোধ পর্যন্ত হারিয়ে গেছে।

আমরা ইতিহাসে পাই, এই প্রকৃত উম্মতে মোহাম্মদী, মো'মেন ও মুসলিম উম্মাহ শেষ নবীর (দ.) ওফাতের পর থেকে তার আরব্ধ কাজ চালিয়ে গেল এবং পৃথিবীর এক বিরাট এলাকা তাদের অধীনে এল, মানব জাতির একটা উল্লেখযোগ্য অংশকে শেষ জীবনব্যবস্থার সুফল উপহার দিলো। এ বিজয়কে অমুসলিম ইতিহাসবেত্তারা সাম্রাজ্যবাদী বিজয় এবং মুসলিম শাসনাধীন Gj াকাকে ইসলামী সাম্রাজ্য বলে অভিহিত করেছেন, এমনকি নিজস্ব স্বত্তাহীন মুসলিম ইতিহাসবেত্তারাও তাদের নকল করে একে "মুসলিম সাম্রাজ্য, ইসলামী সাম্রাজ্য" ইত্যাদি বলে আখ্যা দিয়েছেন। তারা বোঝেন নি যে সামরিক শক্তিবলে দখল করলেও ওটা 'সাম্রাজ্য' ছিল না, ছিল একটা আদর্শ cwZôvi msMvg| mvgাজ্যবাদ যে শোষণ ও অন্যায় করে, ওটা ছিল তার ঠিক উল্টো, শোষণ ও অন্যায় বন্ধ করে ন্যায় ও শান্তি প্রতিষ্ঠা। ইতিহাসকে সত্যান্বেষী মন দিয়ে পড়লে ঐ ইতিহাসবেত্তারা দেখতে পেতেন যে যারা

আল্লাহর দেয়া দীন, জীবন-ব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠা করতে সশস্ত্র বাধা দেয় নি তাদের কোনো সম্পদ মুসলিম বাহিনী হস্গত করে নি, তাদের কোনো শোষণ করে নি। প্রত্যেক মুসলিমের উপর যে কর ধরা হতো অমুসলিমের উপরও সেই কর ধরা হতো। জাতির নিরাপত্তার জন্য প্রতিটি মুসলিমের জন্য অস্ত্রধারণ বাধ্যতামূলক, অর্থাৎ ফরদ। কিন্তু অমুসলিমদের জন্য অস্ত্রধারণ বাধ্যতামূলক ছিল না, ছিল ঐচ্ছিক। তবে যারা ভূখণ্ড শত্রু দ্বারা আক্রান্ হলে অস্ত্র ধরতে রাজি ছিল না তাদের রক্ষার জন্য তাদের উপর একটা সামান্য অতিরিক্ত কর ধরা হতো। তাও দুর্বল, বৃদ্ধ, স্ত্রীলোক, শিশু এমন কি রোগাক্রান্ লোকদের বাদ দিয়ে শুধু যুদ্ধক্ষম, কিন্তু অস্ত্র করতে রাজি নয়, - এমন লোকদের উপর ঐ কর ধরা হতো- যার নাম জিজিয়া। যে শ্রেণিটি ইসলামকে একটি নির্যাতনমূলক ধর্ম বলে দেখাতে চায় তারা এই জিজিয়াকে 'বিধর্মী নির্যাতন' বলে প্রচার করে থাকে। কিন্তু তারা প্রচলিত রাষ্ট্রব্যবস্থার দিকে তাকিয়ে দেখেন না যে সকল রাষ্ট্রেই এখনও সামরিক বাহিনী লালন-পালন করা হয় ঐ রাষ্ট্রের সমস্ জনগণের দেওয়া করের টাকায়। জাতীয় রাজস্বের সিংহভাগই এদের পেছনে ব্যয় করা হয়। কেন? এই জন্য যে, এই সেনাবাহিনী দেশকে, দেশের নাগরিকদেরকে বহিঃশত্রুর হাত থেকে রক্ষা করবে। অর্থাৎ এটা স্বীকৃত যে একটি জাতির মধ্যে যারা সৈন্য বাহিনীতে ভর্তি হবেন, তাদের লালন-cvjb, fiY-পোষণের জন্য জাতির অন্য সদস্য বা নাগরিকরা কর দেবেন। অমুসলিমদের মধ্যে যারা আক্রান্ হলে মুসলিমদের সাথে নিজেদের রক্ষার জন্য অস্ত্র ধরতে রাজি ছিল তাদের উপর ঐ জিজিয়া ধরা হতো না। এর চেয়ে ন্যায্য নীতি আর কি হতে পারে? এই আদর্শ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামকে যারা সাম্রাজ্যবাদ বলে নাম দিয়েছে তারাই অস্ত্রের বলে mg¯ প্রাচ্য অধিকার করে কয়েকশ বছর ধরে তাকে নিঃশেষে শোষণ করেছে, Zv AvR BwZnvm|

এইখানে একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ও উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করছি। ইসলামের এই যে উদ্দেশ্য পুরণের নীতি- অর্থাৎ পার্থিব জীবনের সব কিছু

Avjvni iv¯ায় কোরবান করে দিয়ে শেষে প্রাণটুকু পর্যন্ত তাকে নিবেদন করে সশস্ত্র সংগ্রাম করে জয়ী হয়ে বিজিত জাতির অন্যায় জুলুমের আইন ও শাসন ব্যবস্থা ফেলে দিয়ে সেখানে আল্লাহর দেয়া জীবনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা, অথচ বিজিত জাতির মানুষগুলির ব্যক্তিগত জীবনে যে কোনো ধর্ম পালন করার পূর্ণ ¯vaxbZv `vb- এই নীতি নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে যে, ইসলাম অনেক বেশি অগ্রাধিকার দেয় জাতীয় জীবনকে, আইনকে, শাসনতন্ত্রকে, ব্যক্তি জীবনকে নয়। ইসলামের উদ্দেশ্য হলো জাতীয় জীবনে আল্লাহর দেয়া আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করা, যেটা করা হলে সামাজিক ও জাতীয় জীবনে ন্যায়বিচার, শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে। ব্যক্তি যদি তার ব্যক্তিগত জীবনে ভুল পথ আঁকড়িয়ে থাকে তবে সে তার ফল ভোগ করবে ঐ ব্যক্তিগত ভাবে, জাতীয় জীবনে নয়। RvZxq জীবন যদি ভুল আইন কানুনের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে তবে ব্যক্তি জীবন সৎ কাজের উপর থাকলেও তা স্থায়ী হবে না। বৃহত্তর জাতীয় জীবনের চাপে ও প্রভাবে তা বিলীন হয়ে যাবে। যেমন বর্তমান পৃথিবীতে লক্ষ কোটি মানুষ অতি নিষ্ঠার সাথে ধর্মকর্ম, সৎ কাজ, করলেও পৃথিবী অন্যায়, অবিচারে, রক্তপাতে পূর্ণ হয়ে আছে এবং প্রতিদিন ঐসব অতি দ্রুত হারে বাড়ছে, যেকোন পরিসংখ্যানই একথা বলে দেবে। ব্যক্তিগত ভাবে সাধু হয়ে থাকা ও জাতীয় জীবনকে ভুল আইন কানুন ইত্যাদির হাতে ছেড়ে দেওয়ার ফলে মানব জাতি আজ শুধু প্রচণ্ড অশান্তিতেই ভুগছে না, প্রলয়ংকরী আণবিক যুদ্ধে ধ্বংস হয়ে যাওয়ার মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। সর্বাত্মক সংগ্রাম (জেহাদ ও কেতাল) করে অন্য জাতিগুলির রাষ্ট্র ব্যবস্থা অধিকার করে সেখানে আল্লাহর দেয়া শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেও ব্যক্তি ধর্মজীবনকে তার স্বাধীন ইচ্ছার উপর ছেড়ে দেয়া, শুধু ছেড়ে দেয়া নয়, তাদের ধর্মগুলিকে রক্ষা করার দায়িত্ব সরকারিভাবে গ্রহণ করা প্রমাণ করে যে, দীন ইসলামের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে জাতীয়, রাষ্ট্রীয়, ব্যক্তিগত নয়। তা না হলে যুদ্ধে জয়ী হয়ে তারা পরাজিত জতিগুলিকে তাদের ধর্ম ত্যাগ করে শেষ ইসলামকে গ্রহণ করতে বাধ্য করতেন এবং তা করলে আল্লাহর নির্দেশ ‘ধর্মে কোনো জবরদস্তি নেই’ অমান্য

করা হতো এবং শত্রুদের "তলোয়ারের জোরে মুসলিমরা ধর্মান্তরিত করেছে" এ অপবাদ সত্য হতো।

সংক্ষেপে বললে বলতে হয় রসুলাল্লাহর (দ.) আসহাবরা (রা.) অর্থাৎ উম্মতে মোহাম্মদী হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করেছিলেন যে, তাদের অস্তিত্বের অর্থই হলো তাদের নেতা বিশ্বনবী মোহাম্মদের (দ.) সুন্নাহ অনুসরণ করা, অর্থাৎ তিনি সারা জীবনভর যে কাজটি করেছেন সেই কাজ চালিয়ে যাওয়া। সে কাজটি হচ্ছে, যেহেতু তিনি (দ.) সমস্ত পৃথিবীর জন্য প্রেরিত হয়েছেন কাজেই পৃথিবীময় এই শেষ ইসলাম প্রতিষ্ঠা করার সংগ্রাম করা। সে সংগ্রাম মানুষকে বুঝিয়ে, কথা বলে, লিখে এবং সংগ্রাম করে, সর্বতোভাবে। মহানবীর (দ.) জীবিতকালে তারা তাদের পার্থিব যা কিছু ছিল সব দিয়ে এবং শেষে প্রাণটুকু দিয়ে তাকে তার দায়িত্ব পুরণে সাহায্য করেছেন, তার প্রতি কাজে, প্রতি প্রচেষ্টায় তার সাথে থেকে তাকে আপ্রাণ সাহায্য করেছেন। তার প্রতিটি সুখ-দুঃখের তারা অংশীদার হয়েছেন। তারপর যখন তিনি তাদের মাঝ থেকে চলে গেলেন তখন তারা তাদের নেতার কাজে যেন কোনো বিরতি না হয় সেজন্য সেই সংগ্রাম পূর্ণভাবে চালু রাখলেন। সেই কাজের বিরাটত্ব, সংকট, বিপদ তাদের এক মুহূর্তের জন্য দ্বিধাগ্রস্থ করতে পারল না। কারণ তারা তাদের নেতার (দ.) পবিত্র মুখে শুনেছিলেন এই বলতে যে, যে আমার সুন্নাহ ত্যাগ করবে সে আমাদের কেউ নয় (হাদিস)। তারা বুঝেছিলেন 'তাঁর (দ.) ev তাদের কেউ নয়' অর্থ উম্মতে মোহাম্মদীই নয় এবং তাঁর সুন্নাহ হলো পৃথিবীতে এই জীবনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম। বিশ্বনবীর (দ.) আসহাব তাদের নিজেদের উম্মতে মোহাম্মদী হবার অর্থ কী বুঝেছিলেন এবং ঐ উম্মাহ কিসের প্রভাবে একটা অবজ্ঞাত, উপেক্ষিত জাতি থেকে এক রাতে বিশ্বজয়ী শক্তিতে রূপান্তরিত হয়েছিলেন তা দেখাতে ইতিহাস থেকে দু'একটা ঘটনা পেশ KiwQ|

উম্মতে মোহাম্মদীর মুজাহিদ বাহিনী শেষ ইসলাম পৃথিবীর বুকে প্রতিষ্ঠা করতে করতে আফ্রিকা মহাদেশের পশ্চিম উপকূলে যখন যেয়ে পৌঁছলেন

তখন তারা দেখলেন তাদের সম্মুখে মহাসমুদ্র, আর সামনে এগোবার পথ নেই। তখন নেতার (দ.) ও উম্মাহর উদ্দেশ্য সাধনে নিবেদিত প্রাণ সেনাপতি উকবা বিন না'ফে আটলান্টিক মহাসমুদ্রে তার ঘোড়া নামিয়ে দিলেন এবং যতদূর পর্যন্ ঘোড়ার পায়ের নীচে মাটি পাওয়া গেল ততদূর এগিয়ে গেলেন এবং তারপর আসমানের দিকে দু'হাত তুলে বললেন- Bqv Avjvn! GB মহাসমুদ্র বাধা না দিলে আমরা তোমার রাস্তায় আরও সম্মুখে অগ্রসর হতাম। আরও দেখুন পশ্চিমদিকে মুজাহিদ বাহিনীর সেনাপতি আমর (রা.) মিশরের আর্চ বিশপের কাছে যে প্রতিনিধি দল পাঠালেন তার দলপতি নিগ্রো উবায়দা (রা.) আর্চ বিশপকে কী বললেন। একজন নিগ্রোর সাথে ঘৃণাভরে আর্চ বিশপ প্রথমে কথাই বলতে চান নি। পরে যেহেতু সেনাপতি আমর (রা.) ঐ নিগ্রোকেই দলপতি করে পাঠিয়েছেন কাজেই বাধ্য হয়ে তার সাথে কথা বলতে হলো। উবায়দা (রা.) আর্চ বিশপকে বললেন, "আমাদের বাহিনীতে আমার মত এক হাজার কালো লোক আছে। আমরা শত শত্রু বাহিনীর সাথে একসাথে যুদ্ধ করতে তৈরি আছি। আমরা বেঁচেই আQ ïa Avjvni iv¯vq যুদ্ধ করার জন্য। আমরা ধন দৌলতের কোনো পরোয়া করি না। আমাদের শুধু পেটের ক্ষুধা মেটানো আর পরার কাপড়ের বেশি আর কিছুই চাই না। এই পৃথিবীর জীবনের আমাদের কাছে কোনো দাম নেই। এর পরের জীবনই আমাদের কাছে সব।" এ ঘটনা ইসলামের ইতিহাসে তো আছেই hviv আমাদের কোনো কিছুই ভালো দেখেন না তাদের ইতিহাসবেত্তারাও এই ঘটনাকে সত্য বলে গ্রহণ করেছেন। উম্মতে মোহাম্মদীর অবিশ্বাস্য বিজয়ের মূলে ছিল ইসলামের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ঐ আকিদা, ঐ দৃষ্টিভঙ্গি, এবং ঐ আকিদাই তাদের পরিণত করেছিল এক দুর্ধর্ষ যোদ্ধা, অপরাজেয় জাতিতে, যাদের নাম শুনলে অত্যাচারী জালেমদের আত্মা পর্যন্ কেঁপে উঠত। বিশ্বনবীর (দ.) উম্মাহ এবং প্রতিনিধি হিসাবে সর্বাত্মক সংগ্রামের মাধ্যমে mg¯ পৃথিবীতে এই শেষ ইসলামকে মানুষের রাজনৈতিক অর্থনৈতিক, প্রশাসনিক ও আইনগত জীবনে প্রতিষ্ঠা করে মানব জাতির মধ্যে শান্তি

(ইসলাম) প্রতিষ্ঠাই হচ্ছে শেষ ইসলামের সর্বপ্রavb I mec_g j¶¨ Ges রসুলাল্লাহর (দ.) প্রকৃত সুন্নাহ, এ কথা আশা করি উপস্থাপিত করতে পেরেছি।

কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক বাস্বতা হলো, আজ সেই প্রচণ্ড গতিশীল, আকাশের মত উদার, সমুদ্রের মত বিশাল, সহজ-সরল ইসলাম ধর্মব্যবসায়ী আলেম মোল্লাদের খপ্পড়ে পড়ে সেটা আজ মসজিদ, মাদ্রাসা আর LvbKvi Pvi দেয়ালের মধ্যে বন্দী এবং দাড়ি, টুপি, জোব্বা ইত্যাদিতে আবদ্ধ হয়ে স্থবির, অন্র্মুখী, বিকৃত ও মরা। আর এই বিকৃত ইসলামটাকেই তারা বিক্রি করে খাচ্ছে। মানুষের জাতীয় ও সামাজিক জীবনে যেখানে শান্তি নেই, সেখানে তারা কী করে চোখ কান বন্ধ করে নামায, রোযা, জিকির-আসকারে gk¸j থাকে তা বুঝে আসে না।

চে'র মতো সেজেছেন তার ভক্ত একটি মেয়ে

এমামুয্যামান জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নীর লেখা থেকে

উদ্দেশ্যচ্যুত সমাজতন্ত্রী ও উদ্দেশ্যচ্যুত উম্মতে মোহাম্মদী

উদ্দেশ্য যদি ভুল হয় তাহলে কোন কিছুরই আর দাম থাকে না। ধরুন, ১০ জন লোক একটা উদ্দেশ্য নিয়ে রওয়ানা হলো, অর্ধেক পথ গিয়ে যদি ১০ জনের উদ্দেশ্য ভুলিয়ে দেওয়া যায় তাহলে কী হবে, একেকজন একেক কাজ করতে থাকবে, শেষ গন্তব্যস্থলে কেউই যেতে পারবে না। কাজেই ইসলামে এই জন্য সকল পণ্ডিতগণ একমত যে আকিদা ভুল হলে ঈমানের কোন দাম নেই। এই আকিদাই হলো (Comprehensive concept) mvgwMK ধারণা। পৃথিবীতে উদ্দেশ্যহীন বা আকিদাহীন কোন কিছুই নেই। যা কিছু আকিদাহীন তাই অর্থহীন। সুতরাং কোন জাতি, গোষ্ঠী, দল বা আন্দোলনও উদ্দেশ্যহীন হতে পারে না।

আজ যদি কোন কমিউনিস্টকে প্রশ্ন করা যায় যে, তোমরা পৃথিবীময় সংগ্রাম করছ, বহু কোরবানি করেছ, কমিউনিজমকে পৃথিবাতে প্রতিষ্ঠা করার জন্য সশস্ত্র সংগ্রাম করছ, এসব কেন করছ? ঐ কমিউনিস্ট অবশ্যই জবাব দেবেন যে, পৃথিবীতে যে সুদভিত্তিক পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা চালু আছে সেটার পরিণাম হচ্ছে অর্থনৈতিক অবিচার, শোষণ, অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্ট। কাজেই সেটাকে ভেঙ্গে সেখানে কমিউনিজম চালু করলে সম্পদ সুষ্ঠু বণ্টন হবে, মানুষ খেয়ে পরে বাঁচবে এবং মানুষের ঐ কল্যাণের জন্য পৃথিবীময় কমিউনিস্টরা নিজেদের সব কিছু উৎসর্গ করে সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছেন- অর্থাৎ মানুষের কল্যাণের জন্য তারা নিজেদের উৎসর্গ করেছেন।

ঠিক ঐ কারণেই অর্থাৎ মানব জাতির বৃহত্তর কল্যাণের জন্য বিশ্বনবীর (দ.) সৃষ্ট জাতি পার্থিব সব কিছ ত্যাগ করে সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলো। শুধু তফাৎ এই যে, কমিউনিস্টরা যে ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে সংগ্রাম করছে তা

মানুষের তৈরি যা শান্তি, ইসলাম আনতে পারবে না, আরও অশান্তি সৃষ্টি হবে। Zvi ev¯—v প্রমাণ আমরা ইতোমধ্যেই দেখেছি। কমিউনিজমের পতন হয়ে গেছে প্রায় দুই যুগ হতে চলল।

Avi বিশ্বনবীর (দ.) জাতি, উম্মাহ যে ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে সংগ্রাম করেছিলেন সে ব্যবস্থা হলো স্বয়ং স্রষ্টার তৈরী ব্যবস্থা, দ্বিতীয় তফাৎ হলো মানুষের তৈরী বলে কমিউনিজম মানুষের শুধু অর্থনৈতিক মুক্তির একটা ব্যবস্থা তৈরী করেছে। মানুষের জীবনের অন্যান্য দিক সম্বন্ধে ওটার কোন বক্তব্য নেই। কিন্তু মানুষ শুধু দেহ নয় আত্মাও, শুধু জড় নয় আধ্যাত্মিকও। পক্ষান্তরে আল্লাহ যে জীবনব্যবস্থা দিয়েছেন তা মানুষের দেহের ও আত্মার প্রয়োজনের নিখুঁত সংমিশ্রণ। আল্লাহ বলেন, 'এমনইভাবে আমি তোমাদেরকে একটি মধ্যপন্থী বা ভারসাম্যযুক্ত জাতি হিসাবে সৃষ্টি করেছি (সুরা বাকারা ১৪৩)। এখানে আল্লাহ শব্দ ব্যবহার করেছেন ওয়াসাতা যার অর্থ fvimvg¨h³ (Balanced), মধ্যপন্থী। এই ভারসাম্যযুক্ত জীবনব্যবস্থাকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা করে মানব জাতির মধ্যে শান্তি, Bmjvg Avbqb KivB হচ্ছে একমাত্র উদ্দেশ্য, যে জন্য আল্লাহ তার শ্রেষ্ঠ ও শেষ নবীকে (দ.) পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। যে কাজ এক জীবনে সমাপ্ত করা অসম্ভব, সে কাজের ভিত্তি তিনি স্থাপন করলেন সর্বাত্মক ও বহুমুখী সংগ্রামের মাধ্যমে সমগ্র আরব উপদ্বীপকে এই শেষ জীবন বিধানের অধীনে এনে। এই সময়ের মধ্যে অর্থাৎ তার জীবিত কালের সংগ্রামের মাধ্যমে তিনি তাঁর সৃষ্ট জাতিকে হাতে কলমে শিখিয়ে গেলেন ইসলামের উদ্দেশ্য (সমস্ত পৃথিবীতে এই জীবন বিধান cwZôv করে মানব জাতির মধ্যে শান্তি, ইসলাম, স্থাপন করা) ও প্রক্রিয়া (সালাত, সওম, হজ্ব , যাকাত ইত্যাদি)। এবং তার সৃষ্ট জাতিকে গভীরভাবে উপলব্ধি কোরিয়ে গেলেন যে তার অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করার দায়িত্ব তার (দ.) পরে তাদের উপর সম্পূর্ণভাবে অর্পিত হবে। যারা এ দায়িত্ব পালন করবে না তারা Aar তার জাতিভুক্ত থাকবে না।

আজকে সারা পৃথিবীতে ১৬০ কোটি মানুষ আছে যারা নিজেদেরকে উম্মতে মোহাম্মদী বলে মনেপ্রাণে বিশ্বাস করেন কিন্তু তারা জানেন না উম্মতে মোহাম্মদী হিসাবে কী তাদের দায়িত্ব। তাদের বিশ্বাস নামায রোজা করাই তাদের একমাত্র কাজ। আরও ভালো উম্মতে মোহাম্মদী হতে নামায রোযা ইত্যাদি উপাসনাগুলিই আরও বেশি বেশি করতে হবে। তারা ভুলেই গেছেন তাদের সৃষ্টিই হয়েছে আল্লাহর দেওয়া সত্য জীবনব্যবস্থা পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম করার উদ্দেশ্যে। তা না করে এই জাতি পশ্চিমা বস্তুবাদী 'সভ্যতা' অর্থাৎ দাজ্জালের দেওয়া বিভিন্ন মতবাদ, জীবনব্যবস্থা যেমন গণতন্ত্র, সাম্যবাদ, একনায়কতন্ত্র ইত্যাদি মেনে নিয়ে আর নামায রোযা করে জীবন কাটিয়ে দিচ্ছেন। তারা জানেনও না যে তারা আর রসুলের জাতিভুক্ত নেই, মো'মেন মুসলিমও নেই। আল্লাহর দৃষ্টিতে তারা কেবল কাফের মোশরেক Ges Awfkß A_vr gvjvDb|

কার্লমার্কস, কমিউনিজম বলে একটি জীবনব্যবস্থা সৃষ্টি করেছেন। এটাও একটা দীন এবং অবশ্যই এই আশা নিয়ে যে তার অনুসারীরা একে সমস্ পৃথিবীময় প্রতিষ্ঠা করবে এবং তা করতে সর্বরকম সংগ্রাম করবে। তার অনুসারীরা তা করেছেও। অর্থনৈতিক অবিচার, অন্যায়কে শেষ করে সুবিচার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে তারা অসীম ত্যাগ, সাধনা, সংগ্রাম, সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে cথিবীর এক বিরাট অংশে তাদের আদর্শ প্রতিষ্ঠা করেছে। আজ বা ভবিষ্যতে যদি কমিউনিস্টরা তাদের উদ্দেশ্য ভুলে যেয়ে কার্ল মার্কসের ব্যক্তিগত অভ্যাসগুলিকে অনুকরণ করতে থাকে তবে মার্কস কি তাদের অনুসারী কমিউনিস্ট স্বীকার করবেন? এই প্রশ্নটাই করেছিলাম একজন উৎসর্গকৃত প্রাণ যুবক কমিউনিস্ট কর্মীকে। বলেছিলাম 'আচ্ছা বলতো! ভবিষ্যতে কখনো মার্কস কবর থেকে উঠে এসে যদি দেখেন যে, তোমরা কমিউনিজমকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম ত্যাগ করেছে। শুধু তাই নয়, যে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা ধ্বংস করার জন্য তিনি সংগ্রাম শুরু করেছিলেন সেই পুঁজিবাদকে তোমরা গ্রহণ করেছ, তোমাদের সংবিধান বাদ দিয়ে জাতীয় জীবনে পাশ্চত্যের

ধনতান্ত্রিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছ, কিন্তু ব্যক্তি জীবনে তোমরা কমিউনিজম বিশ্বাসী, তোমরা মার্কসের মতো চুল দাড়ি রাখ, তার মতো হ্যাট পরো, তার মতো কাপড় পরো, মার্কস যে কাতে ঘুমাতেন তোমরাও সেই কাতে শোও, যেভাবে দাঁত মাজতেন সেইভাবে মাজ, হাতে কাস্ে nvZড়ী মার্কা ব্যাজ পরো, সুর করে দ্যাস ক্যাপিটাল পড় এবং কে কত সুন্দর সুর করে তা পড়তে পারে তার প্রতিযোগিতা করে পুরস্কার দাও এবং এসব করে সত্যি বিশ্বাস কর যে তোমরা অতি উৎকৃষ্ট কমিউনিস্ট এবং মার্কসের বিশ্বস্থ অনুসারী- তবে মার্কস কি করবেন? কমিউনিস্ট কর্মীটি অবাক বিস্ময়ে কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থেকে বললো, তা কী করে সম্ভব? আমাদের কমিউনিস্ট বলেই স্বীকার করবেন না। আমরা যদি পুঁজিবাদী গণতন্ত্রই গ্রহণ করি তবে আমরা আর কমিউনিস্ট রইলাম কি করে? বললাম, ধরে নাও না তাই করলে, করলে মার্কস কি করবেন? একটু চিন্া করে সে বললো, আমাদের কমিউনিস্ট বলেই স্বীকার করবেন না। 'আমাদের গায়ে থুথু দেবেন'। অনুরূপ অবস্থায় মহানবী (দ.) কি করবেন তা আমাদের কষ্ট করে অনুমান করতে হবে না। কারণ সে কথা তিনি (দ.) আমাদের আগেই বলে দিয়েছেন। হাশরের দিন আল্লাহর রসুল (দ.) সবার আগে হাউসে কাওসারে পৌঁছে যাবেন, তারপর তার উম্মতের মানুষ তার সামনে দিয়ে যেতে থাকবে আর তিনি (দ.) তাদের কাওসারের পানি পান করাতে থাকবেন, যে পানি পান করলে মানুষ আর কখনও তৃষ্ণার্ত হয় না। এর মধ্যে এমন একদল মানুষ আসবে যারা কাওসারের পানি পান করতে অগ্রসর হলেও রসুলাল্লাহ (দ.) ও তাদের মধ্যে এক প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করা হবে। তখন তিনি বলবেন, এরাতো আমার লোক অর্থাৎ আমার উম্মত। তখন বলা হবে অর্থাৎ আল্লাহ বলবেন, আপনি জানেন না আপনার পর আপনার উম্মাহর ঐসব লোক আপনি যে দীন রেখে এসেছিলেন তার মধ্যে কি কি বেদা'ত করেছে। এই কথা শুনে ব্যাপারটা বুঝে wekbex (`.) H mg¯ লোকদের বলবেন, দূর হও! দূর হও! যারা আমার ci দীনে বেদা'ত করেছ। আল্লাহ রসুলের (দ.) মাধ্যমে যে দীন, জীবনব্যবস্থা

মানব জাতিকে দিয়েছেন তা পরিপূর্ণ, তাতে কোন কিছু নতুন সংযোজন হলো বেদা'ত। এই বেদা'তকে, সংযোজনকে মহানবী (দ.) শেরক বলেছেন, কারণ এটা করা মানে আল্লাহর সার্বভৌমত্বকে অস্বীকার করা, এবং প্রকারান্তরে বj¥ যে আল্লাহর দীন পূর্ণ নয়। শুধু নতুন সংযোজনই যদি শেরক হয়, যে শেরক আল্লাহ প্রতিজ্ঞা করেছেন মাফ করবেন না বলে, তবে শুধু সংযোজন নয়, দীনের সর্বপ্রধান অর্থাৎ জাতীয় ভাগটিকে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, আইন-কানুন, দণ্ডবিধি ইত্যাদি বর্জন করে সেখানে পাশ্চাত্যের মানুষের তৈরী ব্যবস্থা জীবনে প্রয়োগ করে রসুলের (দ.) ব্যক্তিগত সুন্নাহগুলি পালন করে যারা নিজেদের উম্মতে মোহাম্মদী বলে মনে করে আত্মপ্রবঞ্চনায় ডুবে আছেন তাদের কী অবস্থা হবে?

আল্লাহ যখন নবীকে (দ.) বেদা'তকারীদের পানি পান করাতে বাধা দেবেন তখন বোঝা গেল তারা আর নবীর (দ.) উম্মত নয়। যদিও আপাতদৃষ্টিতে তারা অবশ্যই তার উম্মত ছিলো, নইলে মহানবী (দ.) প্রথমে একথা কেন বোলবেন যে, ওরাতো আমার লোক, অর্থাৎ আমার উম্মত। ঐ লোকগুলি আজকের "উম্মতে মোহাম্মদী"। দৃশ্যতঃ এত উৎকৃষ্ট উম্মতে মোহাম্মদী যে আল্লাহর সর্বশ্রেষ্ঠ রসুল পর্যন্ত প্রায় ধোঁকায় পতিত হবেন। আল্লাহ বাধা না দিলে তো কাওসারের পানি পান করিয়েই দিতেন। কাপড়ে চোপড়ে, চলাফেরায়, কথাবার্তায়, খাওয়া দাওয়ায়, শোয়ায় তারা উৎকৃষ্ট সুন্নাহ পালনকারী কিন্তু আসলে বেদা'ত ও শেরকে নিমজ্জিত। যাত্রাদলের কাঠের বন্দুক দেখতে একদম বন্দুক, কিন্তু তা থেকে গুলি বের হয় না। এরা নিজেদের ফাঁকি দিচ্ছেন, অন্যকে ফাঁকি দিচ্ছেন এবং কেয়ামতে আর একটু হলেই একেবারে স্বয়ং নবী করীম (দ.) কেই ফাঁকি দিয়ে ফেলেছিলেন আর কি! এই উম্মাহর একমাত্র সাফায়াতকারী তিনি। তিনি যদি আমাদেরকে তাঁর উম্মাহ বলে স্বীকার না করেন, দূর হও! দূর হও! বলে তাড়িয়ে দেন, তবে জাহান্নাম ছাড়া আমাদের আর কোন জায়গা নেই।

Gg\g্যযামান জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নীর লেখা থেকে

অন্ধ বিশ্বাস নয়, যুক্তিই ঈমানের ভিত্তি

এই দীনের প্রায় সকল আলেম একমত যে, আকিদা সহীহ না হলে ঈমানের কোনো দাম নেই। সেই মহা গুরুত্বপূর্ণ আকিদা বিষয়টি কী তা ভালো করে বুঝে নেওয়া অতীব জরুরি। বর্তমানে ঈমান ও আকিদা একই বিষয় বলে ধরা হয়, আসলে তা ঠিক নয়। ঈমান শব্দের অর্থ বিশ্বাস। আর আকিদা শব্দের অর্থ হলো কোনো বিষয় সম্বন্ধে সঠিক ও সম্যক ধারণা (Comprehensive concept)। কোনো জিনিস কী উদ্দেশ্যে তৈরি করা হয়েছে তা সঠিকভাবে জানার নামই হলো আকিদা অর্থাৎ ঐ জিনিস সম্পর্কে আকিদা সহীহ হওয়া। h\দ কোনো জিনিসের উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানা ভুল হয় তাহলে ঐ জিনিসের উপর করা যাবতীয় কাজও ভুল হয়ে যাবে। যেমন একটা গাড়িকে বানানোর উদ্দেশ্য হলো আপনাকে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে আনা নেওয়া করা। ঐ উদ্দেশ্য পূরণার্থে অর্থাৎ সহজ করার লক্ষ্যে, আরামদায়ক করার লক্ষ্যে এর ভেতরে বসার জন্য চামড়ার নরম গদি বসানো হয়। গান শোনার জন্য ক্যাসেট প্লেয়ার বা সঙ্গীতের ব্যবস্থা করা হয়। গরম বা ঘাম থেকে বাঁচার জন্য শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র বসানো হয়। এসব ব্যবস্থা দেখে যদি কেউ মনে করে এটা একটা বাড়ি এবং এটাকে বানানো হয়েছে বসবাস করার জন্য, তাহলে ঐ গাড়ি সম্পর্কে তার আকিদা ভুল হয়ে গেল। সুতরাং সেই ব্যক্তি যেহেতু এর আসল উদ্দেশ্য জানে না, সেহেতু সে এই গাড়ি চড়ে একস্থান থেকে অন্যস্থানে যাবে না, সুতরাং তার গাড়িটি অর্থহীন হয়ে যাবে যদি তা পৃথিবীর সবচাইতে দামি গাড়িও হয়। সুতরাং আমাদের ভালো করে জানা দরকার যে, আল্লাহ আমাদের কেন সৃষ্টি করেছেন, মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য কী, নবী রসুল প্রেরণের উদ্দেশ্য কী, কেতাব প্রেরণের উদ্দেশ্য কী, জাতি গঠনের উদ্দেশ্য কী,

সালাহ্, সওম, হজ্ব, যাকাহ্, ইত্যাদি দেওয়ার উদ্দেশ্য কী? এসব বিষয়ের সঠিক উদ্দেশ্য জানা না থাকলে আমল করেও কোনো ফল পাওয়া যাবে না।

রসুলাল্লাহর পৃথিবীতে আগমনের উদ্দেশ্যঃ

আল্লাহ্ পবিত্র কোর'আনের অন্ত তিন স্থানে বলেছেন, "হেদায়াহ ও সত্যদীন দিয়ে আমি আপন রসুল প্রেরণ করেছি, তিনি যেন এটাকে (হেদায়াহ ও সত্যদীনকে) অন্যান্য সমস্ দীনের উপর বিজয়ী করেন (সুরা-dvZvn: 28, miv-md: 9, miv-তওবাঃ ৩৩)। এই আয়াতে পরিষ্কার দুটি বিষয় দেখা যায়। প্রথমটি হলো হেদায়াহ ও সত্যদীন আর দ্বিতীয়টি হলো অন্যান্য সমস্ দীনের উপর এই হেদায়াহ ও সত্যদীনকে প্রতিষ্ঠা করা। তাহলে একথা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, আমাদের মহানবীর উপর নাজেল করলেন হেদায়াহ ও সত্যদীন এবং তাঁকে দায়িত্ব দিলেন এটাকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য। এই কাজ করার জন্য নীতি হিসাবে দিলেন সর্বাত্মক সংগ্রামেi| Avjvni imj ZvB বলেছেন- আমি আদিষ্ট হয়েছি মানবজাতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম (কেতাল) চালিয়ে যেতে যে পর্যন্ bv mg¯ মানুষ আল্লাহকে একমাত্র এলাহ এবং আমাকে তাঁর রসুল বলে মেনে নেয় (হাদিস- আবদাল্লাহ্ বিন ওমর (রাঃ) থেকে- বোখারী, মেশকাত)। যতদিন এই প্রত্যক্ষ দুনিয়ায় তিনি ছিলেন এক দেহ এক প্রাণ হয়ে তিনি এবং তাঁর সঙ্গীরা সংগ্রাম চালিয়ে গেছেন। এই কঠিন সংগ্রামের মাধ্যমে তিনি এবং তাঁর সঙ্গীরা তদানীন্ন আরবের এক বিরাট এলাকা আল্লাহর হুকুমের অধীনে নিয়ে আসলেন। তারপর তিনি প্রভুর ডাকে সাড়া দিয়ে চলে গেলেন, তবে যাওয়ার আগে তার বাকি কাজ অর্থাৎ সর্বাত্মক মংগ্রামের মাধ্যমে বাকি দুনিয়াতে দীনুল হক প্রতিষ্ঠা করার ভার দিয়ে গেলেন তার সৃষ্ট জাতির উপর, তার উম্মাহর উপর। বিশ্বনবীর লোকান্তরের সঙ্গে সঙ্গে তার উম্মাহ তাদের বাড়িঘর, স্ত্রী-cÎ, e¨emvq-evwYR¨ GK K_vq `wbqv ত্যাগ করে তাদের প্রাণপ্রিয় নেতার অসমাপ্ত কাজ পূর্ণ করতে দেশ ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে পড়েছিল। মাত্র দশ বছরের মধ্যে তদানীন্b `wU wekkw³ রোমান এবং পারসিক সাম্রাজ্য উম্মতে মোহাম্মদীর সামনে তুলোর মতো উড়ে

গেল এবং অর্ধ-পৃথিবীতে আল্লাহর সত্যদীন প্রতিষ্ঠা হলো। ৬০/৭০ বছর পর দুর্ভাগ্যজনকভাবে পরবর্তী উম্মাহ তাদের আকিদা ভুলে গেল। ভুলে গেল কেন তাদের তৈরি করা হলো। তাদের তৈরি করা হয়েছিল কঠোর অধ্যবসায় অক্লান্ত পরিশ্রম এবং সংগ্রামের মাধ্যমে সমস্ত দুনিয়াতে আল্লাহর সত্যদীন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মানবজীবন থেকে অন্যায়, অশান্তি, h×, i³cvZ, ¶av, দারিদ্র্য ইত্যাদি দূর করে এক অনাবিল শান্তি cwZôv Kivi Rb¨|

এই দীনের সকল বিকৃতির মূল কারণ হলো আকিদার বিকৃতিঃ

ইসলামের আকিদা যখন বিকৃত হতে আরম্ভ করে, তখন থেকে একটা একটা করে প্রতিটি বিষয়েই বিকৃতি ও ভ্রান্তি প্রবেশ করতে থাকে। আকিদার বিকৃতির অন্যতম ফল হিসাবে দেখা দেয় অন্ধ বিশ্বাস। বর্তমানে ইসলামের শত্রুরা যে সমস্ত কারণে ইসলামের বিরুদ্ধে অপপ্রচার করে থাকে, AÜwekvm তার মধ্যে একটি। তাদের এই মনোভাবের পেছনে প্রকৃত ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞানতা বহুলাংশেই দায়ী। আকিদা বিকৃত হয়ে গিয়েছিল বলেই সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বপ্রধান দায়িত্ব ও কর্তব্য ত্যাগ করেছিল। অর্থাৎ মহানবী (দ.) ও তাঁর সাক্ষাত অনুসারী আবু যার (রা.) বলেছিলেন, "জেহাদ হচ্ছে এই জাতির সবচেয়ে বড় দায়িত্ব, সবচেয়ে বড় কর্তব্য।" আর আবু বকর (রা.) খলিফা নির্বাচিত হয়ে তাঁর প্রথম ভাষণেই বলেছিলেন, "হে মুসলিম জাতি, তোমরা কখনও জেহাদ ত্যাগ করো না। জাতি জেহাদ ত্যাগ করলে আল্লাহ তাকে অপমান, অপদস্থ না করে ছাড়েন না।" ঐ আকিদা বিকৃত না হলে তো আর জেহাদ ত্যাগই করা হতো না। তাই বলা যায়, আকিদার বিকৃতিই সংগ্রাম ত্যাগ করার কারণ। ঐ আকিদা বিকৃত হয়ে এই আকিদা স্থান করে নিল যে নামায, রোযা, হজ্ব, যাকাত ও অন্যান্য নানা রকম 'ধর্ম পালন' করলেই ভালো মুসলিম হওয়া যায় ও আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করা যায় এবং আল্লাহর রসুলের (`.) KZ¸wj e¨w³MZ Afyাস নকল করা হলেই তার সুন্নাহ পালন করা হয়। এই বিকৃতির অবশ্যম্ভাবী ফল এই হলো যে- কেমন করে ঐ 'ধর্মকর্ম' পালন করলে তা নিখুঁত হয় তা নিয়ে গবেষণা, চুলচেরা বিচার। ঐ বিচারের

ফলে স্বভাবতঃই নানা অভিমত ও নানা সিদ্ধান্ত; ঐ সব সিদ্ধান্তেi Dci wfwË করে এই জাতির বিভিন্ন মাজহাবে, ফেরকায় বিভক্তি ও শত্রুর হাতে পরাজয় ও ঘৃণ্য দাসত্ব, আবু বকরের (রা.) সাবধানবাণীর সত্যায়ন। চিন্তা করলে দেখা যায় আবু বকরের (রা.) ঐ সাবধান বাণীর মর্মার্থ আরও গভীর ছিল। কারণ এই দীনে যে হাজার রকম বিকৃতি আজ পর্যন্ত এসেছে সবগুলোর মূলে ঐ সংগ্রাম ত্যাগ। স্বভাবতই, কারণ যে কোনো জিনিসেরই মূল লক্ষ্য, উদ্দেশ্য হারিয়ে গেলে বাকি যা থাকে তা অর্থহীন, বিকৃত হয়ে যায়। এ দীনেরও তাই হয়েছে এবং ঐ সর্বাবিধ বিকৃতির একটি হচ্ছে, অন্ধ বিশ্বাস।

ইসলামে অন্ধ বিশ্বাসের কোনো স্থান নেই:

আল্লাহর কোর'আন যিনি ভাসাভাসা ভাবেও একবার পড়ে গেছেন তিনিও লক্ষ্য না করে পারবেন না যে- চিন্তা-ভাবনা, যুক্তির উপর আল্লাহ কত গুরুত্ব দিয়েছেন। "তোমরা কি দেখো না? তোমরা কি চিন্তা করো না?" এমন কথা কোর'আনে এতবার আছে যে সেগুলোর উদ্ধৃতি কোনো প্রয়োজন করে না। এখানে শুধু দু'একটির কথা বলছি এর গুরুত্ব অনুধাবনের জন্য। চিন্তা-fvebv, KviY I hw³i Dci Avjvn AZLiনি গুরুত্ব দেওয়া থেকেই প্রমাণ হয়ে যায় যে এই দীনে অন্ধ বিশ্বাসের কোনো স্থান নেই। তারপরও তিনি সরাসরি বলছেন-"যে বিষয়ে তোমাদের জ্ঞান নেই (অর্থাৎ বোঝ না) তা গ্রহণ ও অনুসরণ করো না। নিশ্চয়ই তোমাদের শোনার, দেখার ও উপলব্ধির প্রত্যেকটিকে প্রশ্ন করা হবে (কেয়ামতের দিনে) (সুরা বfb BmivBj 36)|Ó কোর'আনের এ আয়াতের কোনো ব্যাখ্যা প্রয়োজন করে না। অতি সহজ ভাষায় আল্লাহ বলছেন জ্ঞান, যুক্তি-বিচার না করে কোনো কিছুই গ্রহণ না করতে। অন্য বিষয় তো কথাই নেই, সেই মহান স্রষ্টা তার নিজের অস্তিত্ব সম্বন্ধেও কোর'আনে বহুবার বহু যুক্তি দেখিয়েছেন। অথচ তাঁর নিজের অস্তিত্বসম্পর্কে বলার কোনো প্রয়োজন ছিল না, কারণ আল্লাহ কারও ঈমানের মুখাপেক্ষী নন। তারপরও তিনি তাঁর একত্ব, তিনি যে এক, তার কোনো অংশীদার, সমকক্ষ নেই, অর্থাৎ একেবারে তার ওয়াহদানিয়াত (একত্ব) ও

উলুহিয়াত (সার্বভৌমত্ব) সম্পর্কেই যুক্তি তুলে ধরেছেন। বলছেন- “বল (হে মোহাম্মদ), মোশরেকরা যেমন বলে তেমনি যদি (তিনি ছাড়া) আরও সার্বভৌমত্বের অধিকারী (এলাহ) থাকত তবে তারা তাঁর সিংহাসনে (আরশে) পৌঁছতে চেষ্টা কোরত (সুরা বনি ইসরাইল ৪২)। আবার বলছেন- ÒAvjvn কোনো সন্দান জন্ম দেন নি; এবং তার সাথে আর অন্য কোনো সার্বভৌম (এলাহ) নেই, যদি থাকত তবে প্রত্যেকে যে যেটুকু সৃষ্টি করছে সে সেইটুকুর পৃষ্ঠপোষকতা করত এবং অবশ্যই কতগুলি (এলাহ-সার্বভৌম হুকুমদাতা) Ab¨ KZK¸wji (Gjvn) Dci cvavb¨ we¯ার করত (সুরা মো’মেনুন ৯১)।” এমনি আরও বহু আয়াত উল্লেখ করা যায় যেগুলিতে আল্লাহ মানুষের জ্ঞান, বিবেক, যুক্তির, চিন্দার প্রাধান্য দিয়েছেন, সব কিছুতেই ঐগুলি ব্যবহার করতে বলেছেন, চোখ-কান বুঁজে কোনো কিছুই অনুসরণ করতে নিষেধ করেছেন। আল্লাহ যেমন একেবারে তার নিজের অস্তিত্ব ও একত্বের ব্যাপারেও যুক্তি উপস্থাপিত করেছেন, (একটু পেছনেই যা উল্লেখ করে এলাম) তেমনি তার রসুল (দ.) তার ঈমান অর্থাৎ বিশ্বাসের ব্যাপারেও বলছেন- ÔAvgvi ঈমানের ভিত্তি ও শেকড় হলো যুক্তি।’ এছাড়া কোর’আনময় আল্লাহ তাঁর সার্বভৌমত্বের সম্পর্কে যুক্তি উত্থাপন করে গেছেন এবং বলেছেন এবং কারও সাধ্য থাকলে তা খণ্ডানোর আহ্বান (Challenge)। তিনি যে দীন মানবজাতিকে দান করেছেন তা গ্রহণ করে নিতে তিনি মানবজাতিকে জোর না করে তিনি তার দীনের শ্রেষ্ঠত্ব যুক্তিসহকারে উপস্থাপন করেছেন এবং তা মেনে নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। প্রশ্ন করেছেন, “যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনি কি জানেন না? তিনি সূক্ষ্মতম বিষয়ও জানেন” (সুরা মূলক ১৪)।

ইসলামে অন্ধ বিশ্বাস কোনোভাবেই স্বীকৃত নয়। ইসলামের অপর নাম দীনুল ফেতরাত বা প্রাকৃতিক দীন যা স্বাভাবিককের উপর, যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। অন্ধ বিশ্বাস তো দূরের কথা আল্লাহ ও রসুলের (দ.) প্রেমে ও শ্রদ্ধায় আপ্লুত হয়েও যে যুক্তিকে ত্যাগ করা যাবে না, তা তাঁর উম্মাহকে শিখিয়ে গেছেন gvbeজাতির সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষক মোহাম্মদ (দ.)। একটি মাত্র শিক্ষা এখানে

উপস্থাপন করছি। ওহোদের যুদ্ধ শুরু হওয়ার সময় তাঁর তলোয়ার উঁচু করে ধরে বিশ্বনবী (দ.) বললেন- "যে এর হক আদায় করতে পারবে সে এটা নাও।" ওমর বিন খাত্তাব (রা.) লাফিয়ে সামনে এসে হাত বাড়িয়ে বললেন- ÒBqv imjvjvn (`.)! Aমাকে দিন, আমি এর হক আদায় করব।" মহানবী (দ.) তাকে তলোয়ার না দিয়ে অন্যদিকে ঘুরে আবার বললেন- "যে এর হক আদায় করতে পারবে সে নাও।" এবার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহাবা যুবায়ের বিন আল আওয়াম (রা.) লাফিয়ে এসে হাত বাড়ালেন- ÒAvwg Gi nK Av`vq করব।" আল্লাহর রসুল (দ.) তাকেও তলোয়ার না দিয়ে অন্যদিকে ঘুরে আবার ঐ কথা বললেন, এবার আনসারদের মধ্যে থেকে আবু দোজানা (রা.) বিশ্বনবী (দ.) সামনে এসে প্রশ্ন করলেন- "হে আল্লাহর রসুল! এই তলোয়ারের হক আদায়ের অর্থ কি?" রসুলাল্লাহ জবাব দিলেন- ÒGB তলোয়ারের হক হচ্ছে এই যে এটা দিয়ে শত্রুর সঙ্গে এমন প্রচণ্ডভাবে h× করা যে এটা দুমড়ে, ভেঙ্গে চুরে যাবে।" আবু দোজানা (রা.) বললেন- 'আমায় দিন, আমি এর হক আদায় করব।" বিশ্বনবী (দ.) আবু দোজানা (রা.) হাতে তাঁর তলোয়ার উঠিয়ে দিলেন (হাদিস ও সিরাতে রসুলাল্লাহ- মোহাম্মাদ বিন এসহাক)। একটা অপূর্ব দৃষ্টান্ত- শিক্ষা যে, অন্ধবিশ্বাস ও আবেগের চেয়ে ধীর মস্তিষ্ক, যুক্তির স্থান কত ঊর্ধ্বে। ওমর (রা.) ও যুবায়ের (রা.) এসেছিলেন আবেগে, স্বয়ং নবীর (দ.) হাত থেকে তাঁরই তলোয়ার! কত বড় সম্মান, কত বড় বরকত ও সৌভাগ্য। ঠিক কথা। কিন্তু আবেগের চেয়ে বড় হলো যুক্তি, জ্ঞান। তারা আবেগে ও ভালোবাসায় জিজ্ঞাসা করতে ভুলে গেলেন যে মহানবী (দ.) যে হক আদায় করার শর্ত দিচ্ছেন, সেই হকটা কী? আবু দোজানার (রা.) আবেগ ও ভালোবাসা কম ছিল না। কিন্তু তিনি আবেগে যুক্তিহীন হয়ে যান নি, প্রশ্ন করেছেন- কী ঐ তলোয়ারের হক? হকটা কী তা না জানলে কেমন করে তিনি তা আদায় করবেন? বিশ্বনবী (দ.) যা চাচ্ছিলেন আবু দোজানা (রা.) তাই করলেন। যুক্তিসঙ্গত প্রশ্ন করলেন এবং তাকেই তাঁর তলোয়ার দিয়ে সম্মানিত করলেন। এখানে লক্ষ্য করার বিষয়

হচ্ছে যুক্তিকে প্রাধান্য না দেওয়ায় মহানবী (দ.) প্রত্যাখ্যান করলেন কাদের? একজন তাঁর শ্বশুর এবং ভবিষ্যৎ খলিফা, অন্যজন শ্রেষ্ঠ সাহাবাদের অন্যতম, এবং দু'জনেই আশারায়ে মোবাশশারাহর অন্তর্ভুক্ত, অন্যদিকে আবু দোজানা এসব কিছুই নন, একজন সাধারণ আনসার। তবু যুক্তিকে প্রাধান্য দেয়ায় ঐ মহা সম্মানিত সাহাবাদের বাদ দিয়ে তাকেই সম্মানিত করলেন। প্রশ্ন হচ্ছে- আবু দোজানার (রা.) আবেগ, বিশ্বনবীর (দ.) প্রতি তার ভালোবাসা কি ওমর (রা.) বা যুবায়েরের (রা.) চেয়ে Kg wQj? bv, Kg wQj bv, Zvi cgvY বিশ্বনবীর (দ.) দেয়া তলোয়ারের হক তিনি কেমন করে আদায় করেছিলেন তা ইতিহাস থেকে পাওয়া যায়।

আকলের বেশি কেউ কোনো পুরস্কার পাবে নাঃ

ইবনে ওমর (রা.) বর্ণনা করেছেন- আল্লাহর রসুল (দ.) বললেন- 'কোন মানুষ নামায, রোযা, হজ্ব, যাকাত, ওমরা (ইবনে ওমর (রা.) উল্লেখ করছেন যে ঐগুলি তিনি একে একে এমন বলতে লাগলেন যে, মনে হলো কোনো সওয়াবের কথাই তিনি (দ.) বাদ রাখবেন না) ইত্যাদি সবই করল, কিন্তু কেয়ামতের দিন তার আকলের বেশি তাকে পুরস্কার দেয়া হবে না (ইবনে ওমর (রা.) থেকে- আহমদ, মেশকাত)। রসুলাল্লাহ (দ.) শব্দ e¨envi করেছেন আকল, যে শব্দটাকে আমরা বাংলায় ব্যবহার কোরি 'আক্কেল' বলে, অর্থাৎ মানুষের বুদ্ধি, সাধারণজ্ঞান, যুক্তি ইত্যাদি, আবু দোজানা (রা.) যেটা ব্যবহার করে নবীকে (দ.) প্রশ্ন করেছিলেন তলোয়ারের কী হক? অর্থাৎ বিচারের দিনে মানুষের সওয়াবই শুধু আল্লাহ দেখবেন না, দেখবেন ঐ se কাজ বুঝে করেছে, নাকি গরু-বকরীর মতো না বুঝে করে গেছে, এবং সেই মতো পুরস্কার দেবেন, কিম্বা দেবেন না। অর্থাৎ কারণ ও উদ্দেশ্য না বুঝে বে-আক্কেলের মতো নামায, রোযা, হজ্ব, যাকাত, ইত্যাদি সব রকম সওয়াবের কাজ শুধু সওয়াবের আশায় করে গেলে কোনো পুরস্কার দেওয়া হবে না। এই nvদিসটাকে সহজ বাংলায় উপস্থাপন করলে এই রকম দাঁড়ায়- 'বিচারের দিনে পাক্কা নামাযীকে আল্লাহ প্রশ্ন করবেন- নামায কায়েম করেছিলে? মানুষটি

জবাব দেবে-হ্যাঁ আল্লাহ! আমি সারা জীবন নামায পড়েছি। আল্লাহ বলবেন- ভাল! কেন পড়েছিলে? লোকটি জবাব দেবে- তুমি প্রভু। তোমার আদেশ, এই তো যথেষ্ট, তুমি হুকুম করেছ তাই পড়েছি। আল্লাহ বলবেন- Awg ûKg ঠিকই করেছি। কিন্তু কেন করেছি তা কি বুঝেছ? তোমার নামাযের আমার কি দরকার ছিল? আমি কি তোমার নামাযের মুখাপেক্ষী ছিলাম বা আছি? কী উদ্দেশ্যে তোমাকে নামায পড়তে হুকুম দিয়েছিলাম তা বুঝে কি নামায পড়েছিলে?" তখন যদি ঐ লোক জবাব দেয়- না। তাতো বুঝি নি, তবে মহানবীর (দ.) কথা মোতাবেক তার ভাগ্যে নামাযের কোনো পুরস্কার জুটবে bv|

নামাযের মতো আজ হজ্ব সম্বন্ধেও এই জাতির আকিদা বিকৃত হয়ে গেছে। এই বিকৃত আকিদায় হজ্ব আজ সম্পূর্ণরূপে একটি আধ্যাত্মিক ব্যাপার, আল্লাহর সান্নিধ্য অর্জন করার পথ। আজকের দিনের একজন হাজীকে আল্লাহ যদি হাশরের দিনে প্রশ্ন করেন যে, "তুমি কেন হজ্ব করেছ?" তিনি নিশ্চয় জবাব দেবেন, "তোমার সান্নিধ্য লাভের জন্য হে আল্লাহ।" তখন আল্লাহ যদি পাল্টা প্রশ্ন করেন, "আমি তো সর্বত্র ছিলাম এবং আছি, সৃষ্টির প্রতি অণু-পরামাণুতে আমি আছি, তবে আমাকে ডাকতে, আমার সান্নিধ্যের জন্য এত কষ্ট করে দূরে যেতে হবে কেন? আমার নিজের আত্মা তোমার দেহের মধ্যেই ছিল, আমি তো প্রতিটি মানুষের মধ্যেই বর্তমান ছিলাম, শুধু তাই নয়, আমি বলেই দিয়েছিলাম যে-নিশ্চয়ই আমি তোমাদের অতি সন্নিকটে, আরও বলেছিলাম, 'আমি (মানুষের) গলার রগের চেয়েও সন্নিকটে। তাহলে আমার সান্নিধ্য পেতে এত দূরে এত কষ্ট করে যেতে হবে কেন?" যদি ঐ হাজী বলেন যে, "আমি হজ্বে গিয়েছি, কারণ ওখানে বায়তুল্লাহ শরীফ, তোমার ঘর"। তখন আল্লাহ বলবেন, "ঘরের মালিকই যখন সঙ্গে আছেন তখন বহু দূরে তাঁর পাথরের ঘরে যাবার কী প্রয়োজন আছে? আর আসল হজ্ব cZv আরাফাতের ময়দানে, আমার ঘর কাবায় নয়। আমার ঘর দেখানোই যদি উদ্দেশ্য হয়ে থাকে তবে কাবাকে হজ্বের আসল কেন্দ্র না করে কাবা থেকে

অনেক দূরে এক খোলা মাঠকে কেন্দ্র করলাম কেন? আর যদি আমি আরাফাতের ময়দানেই বসেও থাকি, সেখানে যেয়ে আমার সামনে তোমাদের উপস্থিত হবার জন্য বছরের একটা নির্দিষ্ট সময় নির্ধারিত করে দিলাম কেন? যে কেউ যখন খুশি আরাফাতের মাঠে গিয়ে 'লাব্বায়েক' বলে হাজিরা দিলেই তো হয়ে যেত। তা না করে আমি আদেশ দিয়েছি বছরের একটা বিশেষ মাসে, একটা বিশেষ তারিখে আমার সামনে হাজির হবার। কেন? একা একা যেয়ে আমাকে ভালোভাবে ডাকা যvq, bwK m¤úY AcwiwPZ RvqMvq, অপরিচিত পরিবেশে, লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রচণ্ড ভিড়ের ধাক্কাধাক্কির মধ্যে দাঁড়িয়ে ভালোভাবে, মন নিবিষ্ট করে ডাকা যায়? কী উদ্দেশ্যে তোমাকে হজ্ব করতে হুকুম দিয়েছিলাম তা বুঝে কি হজ্ব করেছিলে?" তখন যদি ঐ লোক জবাব দেয়- না। তাতো বুঝি নি, তবে মহানবীর (দ.) কথা মোতাবেক তার ভাগ্যে হজ্বেরও কোনো পুরস্কার জুটবে না।

নামায এবং হজ্বের মতো অন্যান্য সব পুণ্য-সওয়াবের কাজের সম্বন্ধেও ঐ একই কথা। আর যে মানুষ আল্লাহর প্রশ্নের জবাবে বলবে- n¨v Avjvn, Awg বুঝেই নামায পড়েছি। তোমার রসুলকে (দ.) তুমি দুনিয়ায় পাঠিয়েছিলে mg¯ মানব জাতির উপর তোমার দেয়া জীবন-ব্যবস্থা, দীনকে সংগ্রামের মাধ্যমে জয়ী করে পৃথিবী থেকে সব রকম অন্যায়, শোষণ, অবিচার, যুদ্ধ ও রক্তপাত দূর করে শান্তি (ইসলাম) প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব দিয়ে। তাঁর একার পক্ষে এবং এক জীবনে এ কাজ সম্ভব ছিল না। তাঁর প্রয়োজন ছিল একটা জাতির, একটা উম্মাহর, যে জাতির সাহায্যে এবং সহায়তায় তিনি তাঁর উপর দেয়া দায়িত্ব পালন করতে পারেন এবং তিনি তোমার কাছে প্রত্যাবর্তনের পর যে উম্মাহ তাঁর সংগ্রাম চালিয়ে যেতে সক্ষম হয়, যে পর্যন্ত bv Zvi `wqZcY nq এবং ইবলিস তোমাকে দুনিয়ায় মানবজাতির মধ্যে ফাসাদ আর রক্তপাতের যে চ্যালেঞ্জ দিয়েছিল, তাতে তুমি জয়ী হও। আমার সৌভাগ্যক্রমে, তোমার অসীম দয়ায়, আমি সেই উম্মাহর অন্তর্ভুক্ত ছিলাম। তোমার আদেশ নামাযের উদ্দেশ্য ছিল আমার সেই রকম চরিত্র সৃষ্টি করা, সেই রকম আনুগত্য, শৃঙ্খলা

শিক্ষা করা যে চরিত্র ও শৃঙ্খলা হলে আমি তোমার নবীর (দ.) দায়িত্ব সম্পাদনে তাঁর সাহায্যকারী হয়ে সংগ্রাম করতে পারি। তাই আমি বুঝেই নামায পড়েছি। এই লোক পাবে তার নামাযের পূর্ণ পুরস্কার। একইভাবে যে হাজী আল্লাহর প্রশ্নের জবাবে বলবে যে, "হে আল্লাহ! আমি বুঝেছি যে তোমার ঘর ক্বাবাকে মুসলিম উম্মাহর ঐক্যের প্রতীক করেছ এবং হজ্বকে করেছ মুসলিম উম্মাহর মহাসম্মেলন। তুমি চেয়েছ বছরে একবার আরাফাতের মাঠে পৃথিবীর সমস্ত মুসলিমদের নেতৃস্থানীয়রা একত্র হয়ে জাতির সর্বরকম সমস্যা, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামরিক ইত্যাদি সর্বরকম সমস্যা, বিষয় নিয়ে আলোচনা করবে, পরামর্শ করবে, সিদ্ধান্ত নেবে। অর্থাৎ স্থানীয় পর্যায় থেকে ক্রমশ বৃহত্তর পর্যায়ে বিকাশ করতে করতে জাতি পৃথিবীর কেন্দ্রবিন্দু মক্কায় একত্রিত হবে। এটাই হজ্ব। এই মহাজাতিকে ঐক্যের সুদৃঢ় বন্ধনে বেঁধে রাখার জন্য হজ্ব তোমার দেওয়ার চমৎকার একটি প্রক্রিয়া। তাই আমি বুঝেই হজ্ব করেছি।" এই লোক পাবে তার হজ্বের পূর্ণ পুরস্কার। অন্যান্য সব রকম কাজের (আমলের) ব্যাপারেও তাই। কাজেই সকল আমলের পুরস্কার পেতে হলে এই দীনের যাবতীয় বিষয়ের উদ্দেশ্য, আকিদা জানা আবশ্যক।

bvw¯কতাও একপ্রকার গোঁড়ামি যার প্রতিক হচ্ছে স্রষ্টাকে তথা সব ধর্মকে ডাস্টবিনে নিক্ষেপ করা।

মানবজাতিকে ‘ধর্মহীন মুক্তমনা’ করার চেষ্টা কতটুকু সফল হলো?

wiqv`j nvmvb

মুক্তবুদ্ধির চর্চা আসলে কী? বুদ্ধিকে কে বন্দীকে করে রেখেছে যে তাকে মুক্ত করার প্রয়োজন পড়ল? এর উত্তর সকলের জানা। যুগে যুগে ফতোয়ার চোখরাঙানি মানুষের স্বাধীন বিবেচনা শক্তিকে আবিষ্ট করে ফেলতে চেয়েছে। যারা চিন্াহীন নির্বোধ পশুতে পরিণত হয় নি তারাই সেই ধর্মীয় অন্ধত্বের বিরুদ্ধে মাথা সোজা করে দাঁড়িয়েছেন। মুক্তবুদ্ধির চর্চা তাই মানবজাতির চিন্ার অগ্রগতির জন্য অপরিহার্য। কিন্তু আজকের এই প্রতারণার যুগে সবকিছুর সংজ্ঞা একরকম আর প্রয়োগ সম্পূর্ণ উল্টো রকম। এটা যুগের ধর্ম। দুধের মধ্যে বিষ, মানুষের মধ্যে শয়তান, গণতন্ত্রের মধ্যে ফ্যাসিবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতার মধ্যে সাম্প্রদায়িকতা, মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার নামে মানুষ পুড়িয়ে হত্যা। পৃথিবীতে অবৈধ বলে কিছু নেই, অবৈধ কেবল ধর্ম। তাইতো Avjvn-রসুলের নামে পর্নোগ্রাফিক সাহিত্য রচনাকে মুক্তবুদ্ধির চর্চা, বাক স্বাধীনতা বলে চালু করে দেওয়া হয়েছে। ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে অবাধ বিদ্বেষ আর মিথ্যা প্রপাগাণ্ডার পথ সুগম করার উদ্দেশ্যে কথিত মুক্তমনারা বলে “MUZZLE ME NOT” (আমাকে বলতে দাও)। ধর্মের বিরুদ্ধে তাদের কথা বলার অধিকার দেওয়ার জন্য সুশীল সমাজ ও বুদ্ধিজীবীরা জাতীয় পর্যায়ে হাক ডাক ফেলে দেন। কিন্তু অন্য বহুক্ষেত্রে তারা নীরব থাকেন। যাদের উদারতা দেখে মুক্তমনাদের আঁখি ফেরে না, সেই পশ্চিমা বিশ্বে মুক্তবুদ্ধির চর্চা কতটুকু হচ্ছে? মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা সম্পর্কে কুৎসামূলক ব্লগ বা পর্নোগ্রাফিক সাহিত্য সৃষ্টি করে নয়, মাতাল অবস্থায় কিছু গালাগালি করায় ল্যুক অ্যাঞ্জেল নামের এক ব্রিটিশ তরুণকে চির জীবনের জন্য যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ নিষিদ্ধ করেছিল মার্কিন পররাষ্ট্র

মন্ত্রণালয় ২০১০ এর সেপ্টেম্বরে। ঐ তরুণের পক্ষে মার্কিনি বুদ্ধিজীবীরা জনমত তৈরি করার প্রয়োজন বোধ করেন নি, কিন্তু আল্লাh-রসুলকে নিয়ে কুৎসা রচনার অধিকার সংরক্ষণ করতে সবাই কী তৎপর! আসলে এদেশীয় মুক্তমনারা কী বলতে চায়? তাদের সব কথার পেছনের কথাটি কী? সাদা ভাষায় তাদের মূল চাহিদা আপাতত অবাধ ইন্দ্রিয়সম্ভোগের সুযোগ সুবিধা; যেমন সমাজে বিয়ের প্রয়োজনীয়তা থাকবে না, ব্যভিচার শব্দটি ডিকশনারিতেও থাকবে না। যে কেউ যে কারও সঙ্গে (রক্তীয় সম্পর্কসহ) যৌন সম্পর্ক স্থাপন করতে পারবে, সমকামিতার অধিকার থাকবে, যে কেউ সর্বত্র নগ্ন থাকতে পারবে, মদ্যপানকে সম্মানের দৃষ্টিতে দেখা হবে। ইন্দ্রিয়সুখের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী যে কোনো কথাই তাদের অসহ্য। প্রশ্ন হচ্ছে- তাদের এই স্বপ্নের সমাজ কত দূরে? ইতোমধ্যেই ইউরোপ, আমেরিকার অনেক দেশে মানুষের এ 'অধিকারগুলো' প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আর আমাদের এখানে এখনো প্রতিষ্ঠিত হতে পারে নি, কারণ মানুষের বুদ্ধি এখনও ধর্মের কারাগারে বন্দী। জানা কথা, পশ্চিম জ্ঞানভিত্তিক, প্রাচ্য বিশ্বাসভিত্তিক। এ বন্দিদশা থেকে মানুষের মনকে মুক্তি দেওয়ার জন¨B বর্তমানের তথাকথিত মুক্তমনারা শপথ নিয়েছেন। কিন্তু তাদের এ প্রচেষ্টা কতটুকু সফল হয়েছে এবং হবে সেটা বর্তমানের প্রেক্ষাপটে একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশ্বিক ইস্যু। কারণ কম্পাসের কাটা এখন আবার উল্টোদিকে ঘুরতে শুরু করেছে।

ইউরোপীয় জাগরণের উত্তর যুগের দার্শনিকগণ যুক্তিবাদ (Rationalism), AwfÁZvev` (Empiricism), Av`kev` (Idealism) সহ বিভিন্ন দর্শন আবিষ্কার করলেন। এটা করতে হলো কারণ ভাববাদী দর্শন তথা ধর্মগুলো বহু আগেই মানবকল্যাণের উপযোগিতা হারিয়েছিল। আদ্যিকালের ধ্যানধারণা (ধর্ম) ঝেড়ে ফেলতে হলে বিকল্প ধ্যানধারণা দাঁড় না করালে চলবে কী করে? তাই শূন্যতা পূরণ করতে তথা যুগের চাহিদাই এসকল দার্শনিকদের সৃষ্টি করেছিল। এদের নামের লিস্টি ও কাজের তালিকা অনেক

লম্বা, আমরা সেদিকে যাবো না। আমাদের বিষয় ধর্মকে বাদ দিয়ে মানবজাতির জীবন পরিচালনার যে স্বপ্ন তারা দেখেছিলেন সেটা কতটুকু পূরণ হলো। উপরোক্ত দার্শনিকদের মধ্যে কিছু আছেন রাজনীতিক দার্শনিক যাদের মতবাদ বিশ্বের ইতিহাস এবং মানুষের চিন্তাধারাকে পাল্টে দিয়েছে। তাদের মধ্যে থমাস হবস, জ্যাক রুশো, স্পিনোজা, ইমানুয়েল কান্ট, ডেভিড হিউম, কার্ল মার্কস, হেগেলস, ফেডরিখ এঙ্গেলস, স্টুয়ার্ট মিল প্রমুখের নাম bv করলেই নয়। যুগটা ছিল বাণিজ্যিক উপনিবেশ সৃষ্টি আর সাম্রাR¨ we¯ারের। ইউরোপের দেশগুলো নতুন যুগশক্তিতে উজ্জীবিত হয়ে বণিকের বেশে দিকে দিকে দেশ দখলের অভিযান চালালো। যেখানে তারা রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করল সেখানেই চেষ্টা করল তাদের নিজ দেশের রাষ্ট্রনীতি ও দর্শনকে চাপিয়ে দেওয়ার জন্য, যাতে করে আধুনিক দাসদের মন-মগজ নিজেদের চিন্vi অনুকূলে থাকে। এজন্য তারা শিক্ষা ব্যবস্থা, সামাজিক ক্লাব, পত্রিকা প্রকাশ, সাহিত্য অনুবাদ, বুদ্ধিজীবী ভাড়া করাসহ বহুপ্রকার পথ গ্রহণ করেছিল। আমাদের উপমহাদেশেও এ প্রক্রিয়া চলেছে। শিক্ষা বিস্তারের নামে ইতিহাস বিকৃতি, মানসিক দাস তৈরি ধর্মহীনতার বিস্তার ঘটানোর এ সুবিশাল চক্রান্ত কী বিরাট কলেবরে সাধিত হয়েছিল তা যারা এ ইতিহাস নিয়ে গবেষণা করবেন, বিস্ময়ে বিহ্বল হতে বাধ্য হবেন। আমাদেরকে দুধের বোতলে পুরে `-শো বছর যে বিষ খাওয়ানো হয়েছে তার ফল ভোগ না করে উপায় নেই। আমাদের সমাজের শিক্ষিত শ্রেণি প্রায় পুরোটাই আল্লাহর অস্তিZ, ciKvjxb জীবন, মালায়েকদের অস্তিZ ইত্যাদি সম্পর্কে দ্বিধান্বিত, সন্দেহগ্রস্ত| Avi যারা সে বিষ পুরোটাই খেয়েছে তারা ভাবছে ধর্মকে পুরোপুরি উৎখাত না করা পর্যন্ত মানুষের চিত্ত মুক্ত হবে না, ধর্মের প্রতি তাদের মনোভাব হিংসাত্মক। এরা নিজেদেরকে মানবতার অবতার এবং উচ্চস্তরের চিন্তানায়ক মনে করে যার বহিঃপ্রকাশ ঘটানোর জন¨ Avjvn-imj-মালায়েক, আখেরাত, জান্নাত, জাহান্নাম এক কথায় মানুষের ধর্মবিশ্বাস নিয়ে হাসি-তামাশা করে, ধর্মবিশ্বাসী মানুষকে গরু-ছাগলের অধম মনে করে। বিগত শতাব্দীর পুরোটা জুড়ে ধর্মের

“কল্পনা করুন, কোনো ধর্ম নেই”- পেনসালভানিয়ার রাজধানী হ্যারিসবার্গের রাস্তায় এমন স্বপ্নময় বিলবোর্ড আজও দেখা যায়। বিকৃত ধর্মের আঘাতে জর্জরিত ও ক্লান্ত মানুষ এমন স্বপ্ন দেখতে বাধ্য হচ্ছে। কিন্তু মাথায় ব্যথা হলে মাথা কেটে ফেলা কি mgvavb?

বিরোধিতা করা হয়েছে নগ্নভাবে, আর এ শতাব্দীতে বিশেষ করে ইসলামের বিরুদ্ধেই মুক্তবুদ্ধির কৃপাণ বেশি ব্যবহৃত হচ্ছে। সমাজতন্ত্রকে bv¯KZvi প্রতিশব্দরূপে ব্যবহার করা হয়, কারণ গত শতাব্দীতে সেভাবেই এর প্রয়োগ করা হয়েছিল। আমি যতটুকু মার্কস পড়েছি, দেখতে পেয়েছি তার অবস্থাb ছিল মূলত পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে, অর্থনীতিক অবিচারের বিরুদ্ধে, নাস্তিKZv প্রতিষ্ঠা তার মূল বাণীর অন্তর্ভুক্ত ছিল না। ধর্ম সম্পর্কে তিনি তার মনোভাবe একটি লাইনে এত সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছিলেন যে তার মেধার প্রতি শ্রদ্ধা না এসে পারে না। তিনি বলেছিলেন, Religion is the sigh of the oppressed creature, the heart of a heartless world, and the soul of soulless conditions. It is the opium of the people. (A_vr ag´ হচ্ছে নিপীড়িত প্রাণের দীর্ঘশ্বাস, হৃদয়হীন

পৃথিবীর মাঝে হৃদয়, আত্মাহীন পারিপার্শ্বিকতার মাঝে আত্মাস্বরূপ। মানুষের কাছে ধর্ম যেন আফিমের মত।"

কমিউনিস্ট দেশগুলোয় eûj cPwjZ GKwU পোস্টার। স্টিম ইঞ্জিনে করে এগিয়ে আসছে শিল্পবিপ্লবের কারিগরেরা। পালিয়ে বাঁচার চেষ্টা করছে বৃদ্ধ ধর্ম (Cki?)।

আফিম খেয়ে মানুষ জীবনযন্ত্রণা ভুলে থাকে, ধর্মও মানুষকে তেমনি জীবন যন্ত্রণা ভুলতে সাহায্য করে। মার্কস যে ধর্মটি সামনে দেখেছিলেন সে সম্পর্কে তার এ উক্তি সর্বাংশে সত্য, আজও সেটা সত্যই আছে। কিন্তু দুঃখজনক বিষয় হচ্ছে, মার্কস প্রকৃত ধর্ম দেখতে পান নি, পেয়েছেন সহস্র বছরের বিকৃত ধর্মের লাশ, যার দিকে তিনি করুণার দৃষ্টিতে তাকিয়েছেন। তিনি কি ধর্মবিদ্বেষী ছিলেন, ধর্মকে পদদলিত করতে চেয়েছিলেন? আমার মনে হয় না। হয়তো তিনি নাস্তিক ছিলেন কিন্তু ধর্মের প্রতি প্রতিহিংসাপরায়ণ ছিলেন না, এর ইতিবাচক দিকগুলোও তিনি দেখতে পেয়েছেন। কিন্তু তার সৃষ্ট মতবাদকে যখন যে সব প্রতিষ্ঠা করা হলো সেখানে স্রষ্টাকে নিয়ে কী নির্মম তামাশা করা হয়েছে সেটা ইতিহাসের পাতায় রক্তের অক্ষরে লেখা আছে। রসুলাল্লাহকে নিয়ে নয়, সরকারি উদ্যোগে স্বয়ং আল্লাহকে নিয়ে কার্টুন আঁকা

হয়েছে যা বিলবোর্ডে টানিয়ে দেওয়া হয়েছে। কার্টুনগুলো আল্লাহকে প্রায়শই mv`v `wolqvলা একজন বৃদ্ধরূপে চিত্রিত করা হয়েছে যাঁকে সবুট লাথি দিয়ে বিতাড়িত করার দৃশ্য ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। সেগুলো পত্রিকায় প্রকাশ করাও ঝুঁকিপূর্ণ। এতসব করেও মানুষকে সমাজতান্ত্রিকরা বা মুক্তবুদ্ধিজীবীরা নাস্তিK বানাতে পারে নি কেন? উল্টো আজ সমাজতন্ত্র ইতিহাসের পাতায় আশ্রয় নেওয়া মতবাদ। নতুন প্রজন্ম এ সম্পর্কে বাস্ব কিছুই জানে না। উল্টোদিকে ধর্ম উঠে এসেছে বিশ্বের প্রধান আলোচিত বিষয়ের তালিকায়। বর্তমানে গণমানুষের ধর্মীয় আবেগ রীতিমত মুক্তচিন্াশীলদের ভীতির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। গত দুই যুগ পৃথিবীর তাবত যুদ্ধে ধর্ম ছিল প্রধান ইস্যু, ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের অধিক হারে ইসলাম গ্রহণ দেখে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে যাচ্ছে 'সভ্যতার ধ্বজাধারীদের' যারা কিনা ধর্মীয় স্বাধীনতার শ্লোগান দেয়। মুক্তচিন্াবিদরা যে আদতে কত বড় গোঁড়াপন্থী তা কি তারা জানেন? মানুষ যখন ধর্মের বিরুদ্ধে কথা বলে তারা বলেন যে, এটা মানুষের বাক-স্বাধীনতা, কিন্তু যখন তারা স্রষ্টার কথা বলে তখন বলে মানুষ কূপমণ্ডূক। একাধারে নন্দিত ও নিন্দিত প্রথাবিরোধী বুদ্ধিজীবী হুমায়ূন আজাদ বলেছিলেন, "এদেশের মুসলমান একসময় ছিলেন মুসলমান বাঙালি, তারপর বাঙালি মুসলমান, তারপর বাঙালি হয়েছিল; এখন আবার তারা বাঙালি থেকে বাঙালি মুসলমান, বাঙালি মুসলমান থেকে মুসলমান বাঙালি, এবং মুসলমান বাঙালি থেকে মুসলমান হচ্ছেন। পৌত্রের ঔরসে জন্ম নিচ্ছে পিতামহ।"

যে ধর্মের উত্থান দেখে হুমায়ূন আজাদ আতঙ্কিত, সেটা আতঙ্কিত হওয়ারই মত। কারণ সেটা ধর্ম নয়, ধর্মের উল্টোটা। তালেবানি শাসন, আই.এস. শাসন কি ইসলামের শাসন? মোটেও নয়। তারপরও কথা হচ্ছে, এত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও মানুষ আবার ধর্মের দিকে যাচ্ছে, ধর্ম থেকে কেন তাদের ফিরিয়ে রাখা যাচ্ছে না? কারণ:

পারস্পরিক এই অবিরাম কাঁদা ছোঁড়াছুঁড়ির যে সংস্কৃতি আমাদের দেশে বিগত ৪৪ বছর ধরে চলছে, এর পেছনে প্রধান দু'টি ফ্যাক্টর হচ্ছে ধর্ম নিয়ে ব্যবসা ও অপরাজনীতি। মানবজাতির কল্যাণের জন্য যে ধর্ম আল্লাহ পাঠিয়েছেন তা অধিকাংশ ক্ষেত্রে মানুষের অকল্যাণার্থেই ব্যবহৃত হচ্ছে। আল্লাহ পবিত্র কোর'আনে বলছেন, 'প্রত্যেক পশ্চাতে ও সম্মুখে পরনিন্দাকারীর দুর্ভোগ'। (সুরা হুমাযাহ ১) [সৌজন্যে- XvKv wUweDb]

ক) প্রতিটি মানুষের মধ্যে যিনি সৃষ্টি করেছেন সেই স্রষ্টার আত্মা, রূহ আছে (miv wnRi 29)| Gi শক্তিশালী প্রভাব মানুষের চিন্ত-চেতনায় ক্রিয়াশীল থাকে। এজন্য যখনই তারা বিপদাপন্ন হয় তখন প্রতি নিঃশ্বাসে স্রষ্টার কাছেই আশ্রয় চায়। স্রষ্টাকে বিশ্বাস করার মতো যথেষ্ট রকম উপাদান প্রকৃতিতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে, যেগুলো পবিত্র কোর'আনে আল্লাহ আয়াত বা নিদর্শন বলেছেন, যার সামনে মানুষের g¯ক অবনত হয়। এগুলো দেখার পরও কেবল একটি শ্রেণির প্রচারণায় মানুষ নাস্তিকে পরিণত হবে না। আল্লাহর নাজেলকৃত ধর্মগ্রন্থগুলোর বেশ কয়েকটি এখনও মানুষের কাছে আছে যেগুলো

móvi Aw¯ত্বের স্বাক্ষর বহন করছে। মানুষ সেগুলো সম্মানের সঙ্গে পড়ছে, জানছে, বিচার বিশ্লেষণ করছে। এগুলোর স্বর্গীয় বাণীসমূহ মানুষের আত্মার গভীরে প্রভাব ফেলছে। অধিকাংশ মানুষ সেগুলোকে মাথায় করে রাখছে, সন্তানকে যেমন যত্ন করা হয় সেভাবে যত্ন করছে। সুতরাং মানবজাতিকে ধর্মহীন করে ফেলার চেষ্টা অপ্রাকৃতিক, বাস্তবতাবর্জিত, নিতান্B AevPxb I gpZvmjf cwiKíbv|

খ) অতীতে হাজার হাজার হয়তো লক্ষ লক্ষ বছর মানুষকে শান্তি দিয়েছে ধর্ম। এই ইতিহাস মানুষের জানা আছে। সময়ের সেই বিশাল ব্যাপ্তির তুলনায় গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ইত্যাদির শাসনামল এক ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ভগ্নাংশ মাত্র এবং এগুলোর অভিজ্ঞতাও শান্তিময় নয়। এ মতবাদগুলো সম্পর্কে বলা যায়- Perfect in theory --- has never worked in practice. (তাত্ত্বিকভাবে নিখুঁত কিন্তু কখনো কাজে বাস্তবায়িত হয় নি।) পক্ষান্তরে ধর্মের শাসনে প্রাপ্ত সেই অনুপম শান্তির স্মৃতি মানবজাতির মন থেকে মুছে যায় নি। অধিকাংশ মানুষ এখনও দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে একমাত্র স্রষ্টার বিধানেই শান্তি আসা সম্ভব। কাজেই যুগের হাওয়া তাদেরকে যতই অন্য দিকে ঠেলে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করুক, তারা শান্তির আশায় বারবার ধর্মের পানেই মুখ ফেরায়। উপরন্তু প্রতিটি ধর্মগ্রন্থেই ভবিষ্যদ্বাণী আছে যে, শেষ যুগে (কলিযুগ, আখেরি hvgvbv, The Last hour), আবার ধর্মের শাসন বা সত্যযুগ প্রতিষ্ঠিত হবে, মানুষে মানুষে কোনো ভেদাভেদ বৈরিতা থাকবে না, কোনো AwePvi, অন্যায় শোষণ থাকবে না, পৃথিবীটা জান্নাতের মত শান্তিgq (Kingdom of Heaven) হবে। এই বিশ্বাস থেকে অধিকাংশ মানুষ ধর্মের উত্থানই কামনা করে। এটা তাদের ঈমানের অঙ্গ, এ বিশ্বাস মানুষের অন্তর থেকে মুছে ফেলা সম্ভব নয়।

গ) শান্তির আশায় ধর্মের পানে ছুটে চলা মানুষকে ফেরাতে চাইলে স্বাভাবিকভাবেই প্রয়োজন হবে ধর্মের বিকল্প এমন একটি জীবনব্যবস্থা প্রণয়ন যা তাদেরকে সেই কাঙ্ক্ষিত শান্তি দিতে পারবে, একই সঙ্গে দেহ ও আত্মার

প্রশান্তি বিধান করতে পারে। কিন্তু সত্যি বলতে কি সেটা মানুষ আজ পর্যন্ত করতে পারে নি এবং কোনো কালে পারবেও না। বহু চেষ্টা করেছে কিন্তু সবই মাকাল ফল। শান্তির শ্বেতকপোত গণতান্ত্রিক বা সমাজতান্ত্রিক কারো হাতেই ধরা দেয় নি। ধরুন, যদি কোনো ব্যক্তিকে বলা হয় যে, তুমি কীভাবে মরতে চাও? গুলি খেয়ে না বিষ খেয়ে? বাঁচার কোনো পথ নেই, কেবল মরার জন্য দু'টো পথ। ঐ মানুষটিকে একটা না একটা পথ বেছে নিতেই হবে। মানুষের Awe"কৃত জীবনব্যবস্থাগুলোকে যত সুন্দর সুন্দর নামেই ডাকা হোক না কেন তা হচ্ছে মানবজাতির সামনে মৃত্যুর বিকল্প পথ। জীবনের পথ একটাই; আর সেটা হলো ধর্ম অর্থাৎ স্রষ্টাপ্রদত্ত দেহ ও আত্মার সমন্বয়ে ভারসাম্যপূর্ণ জীবনব্যবস্থা। বর্তমান স্রষ্টাবর্জিত জীবনদর্শন মানুষকে কেবল মনুষ্যত্বের AatcZb Avi wbকৃষ্ট থেকে নিকৃষ্টতর জীবন উপহার দিয়েছে। কাজেই মানুষ এখন জীবন রক্ষার আশায় ধর্মের দিকেই যেতে চাইবে, কেননা তাদের বস্তুত শান্তি দরকার। কিন্তু মরিচিকা যেমন তৃষিতকে তৃপ্ত করতে পারে না, কেবল আরো ক্লিষ্ট করে তেমনি প্রচলিত ইসলাম ও অন্যান্য ধর্মগুলোও মানুষকে কেবল সুখস্বপ্নে বিভোর করে প্রতারিতই করে এবং করবে। সেগুলো আর মানুষের ধর্ম নয়, কল্যাণের ধর্ম নয়, সেগুলো পুরোহিত-আলেম, সুফি সম্রাট, রাজনীতিক স্বার্থান্বেষী, ডানপন্থী, রক্ষণশীল আর উগ্রপন্থী জঙ্গিদের ধর্ম। নজরুল লিখেছেন,

তব মসজিদ মন্দিরে প্রভু নাই মানুষের দাবি,
মোল্লা পুরুত লাগায়েছে তার সকল দুয়ারে cwe|

এই ধর্মব্যবসায়ীরা মানুষকে শান্তি দিতে চায় না, চাইলেও পারবে না। কারণ প্রথমত এদের পথ ভুল, দ্বিতীয়ত এরা তো কেবল ক্ষমতা ও স্বার্থের উপাসক। সমাজকে শান্তিময় করতে এখন একটাই করণীয়, ধর্মের ক্ষতিকর চর্চা এড়াতে ধর্মকেই বাদ দেওয়া চলবে না, সেটা সম্ভব হবে না, বরং মানুষের ঈমানকে, ধর্মবিশাসকে সঠিক পথে চালিত করতে হবে, ধর্মকে মানুষের কল্যাণে ব্যবহার করতে হবে। এটা করতে হলে সর্বপ্রথম সমাজকে এই

mecKvi age¨emvqx (Religion monger) থেকে মুক্ত করতে হবে, তাদের জন্ম নিষিদ্ধ ও প্রাদুর্ভাব বন্ধ করতে হবে। এখনো সময় আছে, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী, সমাজচি¯K, e¨×Rxex, mvavi Y gvনুষ, রাজনীতিক সকলকেই এখন বুঝতে হবে যে, ধর্মবিশ্বাসকে অস্বীকার করে কল্যাণ রাষ্ট্র গঠন করার চেষ্টা চাঁদের আলোয় কাপড় শুকানোর মত। বিগত পাঁচশত বছর এই স্বপ্ন দেখা হয়েছে, কিন্তু এখন জেগে ওঠার সময় হয়েছে। অভিজ্ঞতালব্ধ বাস্ বতাকে স্বীকার করে নিয়ে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা করতে হবে।

পশ্চিমা দর্শনে বুদ্ধিভ্রষ্ট উন্নাসিক তথাকথিত মুক্তমনারা স্রষ্টাকে জুজু ও ধর্মকে মানুষের রচনা মনে করেন, তারা ধর্মের নাম-নিশানাও মুছে ফেলতে চান, রাষ্ট্রের কর্ণধার ও নীতি-নির্ধারকদের মধ্যেও অনেকে এদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পড়েন। এদেরকে আশ্রয় প্রশ্রয় দেন যা সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। রাষ্ট্রনায়কদের কোনো মতবাদে প্রভাবিত হয়ে পড়া সাজে না, তাদের দৃষ্টি আচ্ছন্ন হলে চলে না, তাদেরকে বুঝতে হবে, এই তথাকথিত মুক্তমনারা যতই ধর্মবিদ্বেষী প্রপাগান্ডা চালান না কেন, প্রথমত সেটা সত্য নয়, দ্বিতীয়ত দিনের শেষে মানুষ ধর্মের দিকেই ফিরে আসবে। সুতরাং শান্পির্ণ রাষ্ট্রব্যবস্থার জন্য সর্বপ্রথম প্রয়োজনীয় বিষয় যে জনমত, মুক্তমনাদের ভাবধারা মিথ্যা এবং সেই জনমতের, সেন্টিমেন্টের বিপরীত। এ কথা বিগত শতাব্দীতে বার বার প্রমাণিত হয়েছে। কমিউনিস্টবিরোধী যুক্তরাষ্ট্রও জাতীয় ঐক্যের প্রয়োজনে ধর্মকে ব্যবহার করে। তাদের জাতীয় কলেমা হচ্ছে, IN GOD WE TRUST. তাছাড়া যাদেরকে অনুসরণ করে এই প্রচেষ্টা তারাও নিজেদের ধর্মবিশ্বাস দ্বারাই প্রভাবিত, তাদের রাজনীতি, পররাষ্ট্রনীতি সবকিছুর পেছনে ধর্মবিশ্বাস হচ্ছে মূল চালিকাশক্তি। আগের তুলনায় হ্রাস পেলেও যুক্তরাষ্ট্রের ৭৪% প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ আজও স্রষ্টায় বিশ্বাস করে। প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ আল কায়েদার বিরুদ্ধে যুদ্ধকে ‘ক্রুসেড’ বলে বিতর্কিত হয়েছিলেন সত্য, তবে এটা সুস্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল যে, ধর্মই ছিল যুদ্ধের মূল অনুপ্রেরণা। ধর্মকে বাদ দিয়ে জীবন চালানোর স্বপ্ন দেখা বন্ধ করে এখন সকলের উচিত হবে, ধর্মকে

কীভাবে মানবতা ও রাষ্ট্রের কল্যাণে ব্যবহার করা যায় সে পথের অনুসন্ধান করা। মানুষের ধর্মবিশ্বাসকে ধর্মব্যবসায়ীদের নিয়ন্ত্রণে যতদিন ফেলে রাখা হবে, ততদিনই নতুন নতুন জঙ্গি দল, সুফি সাধক, ধর্মভিত্তিক রাজনীতিক দলের আবির্ভাব হবে আর সন্ত্রাস চলবে, প্রতারণা চলবে, যুদ্ধ চলবে।

রাষ্ট্রকে ধর্মের প্রভাবমুক্ত রাখার জন্য বিগত ৫০০ বছর ধরেই চেষ্টা করা হচ্ছে। মানুষকে যতই বলা হচ্ছে ডানদিকে যেয়ো না, লাভ হচ্ছে না। ধর্মহীন জীবনব্যবস্থাগুলোর থেকে মানবজাতি যে তিক্ত অভিজ্ঞতা লাভ করেছে সেই অভিজ্ঞতাই আবার মানুষকে ডানদিকে মুক্তি খোঁজার জন্য উদ্বুদ্ধ করছে, আর দলে দলে মানুষ গিয়ে পড়ছে ধর্মব্যবসায়ীদের খপ্পরে। ঠিক যেভাবে পতঙ্গ অগ্নিশিখায় ঝাঁপ দেয়।

শান্ তি অথবা গণতন্ত্র-আমরা কোনটা চাই?

Gm Gg mvgmj û`v

¯vaনতা পরবর্তী গত ৪৩ বছরে বাংলাদেশের রাজনীতিবিদদের মুখনিঃসৃত সর্বাধিক শব্দ সম্ভবত গণতন্ত্র। রাজনৈতিক জনসভার বক্তৃতায়, মিটিং-মিছিলে, সেমিনার বা টকশোতে গণতন্ত্রের জয়গানের শেষ নেই। গণতন্ত্র আমাদেরকে মিথ্যাচার, অন্যায়, অবিচার, অশান্ তি ছাড়া কিছু দিতে না পারলেও বিজ্ঞাপনের জোরে এর পতি আমাদের ভালোবাসা এতটাই যে, আমাদের মনমগজ-চিন্ তাধারা সবই আজ গণতান্ত্রিক। সাধারণ মানুষ রাজনীতি আর গণতন্ত্র বলতে বোঝেন ক্ষমতায় গিয়ে স্বার্থ হাসিলের বিশেষ কৌশল। এর বেশি তারা বোঝেন না। গত ৪৩ বছর ধরে রাজনীতির নামে সাধারণ মানুষের উপর যে কশাঘাত করা হচ্ছে তার দ্বারা আমার পিঠও রক্তাক্ত তবু গণতন্ত্রের প্রতি আমাদের কোনো অভিযোগ নেই। এর কারণ আমরা মনে করছি এই চাবুক গণতন্ত্রের নয়। গণতন্ত্র আসলে ভালো, আমাদেরকে পেটাচ্ছে অগণতান্ত্রিক শক্তি। আসলে এ ধারণা ভুল। এই আঘাত গণতন্ত্রেরই কশাঘাত, এর বেশি আর কিছু আমাদের প্রাপ্য নয়। যতদিন আমরা পশ্চিমাদের ছেলেভোলানো মন্ত্রে ভুলে থাকবো, ততদিন এই চাবুকপেটা খেয়ে যেতে হবে। যে তন্ত্র `bxwZM¯, সন্ত্রাসী, চোর-ডাকাতদের হাতে শাসনদণ্ড তুলে দেয়, যে তন্ত্র গরীবের রক্ত শুষে নিয়ে ধনীর ব্যাংকে অর্থের পাহাড় গড়ে তোলে, যে তন্ত্র, রাজনীতিক প্রতিহিংসার জন্ম দেয় যার বলি হয় নিরীহ, নিরপরাধ জনগণ, খেটে খাওয়া মানুষ, নিষ্পাপ শিশু, সেই গণতন্ত্রকেই আমরাই আদরে লালন করি, ভোট দিয়ে তার গোড়ায় পানি সিঞ্চন করি। আমরা বুঝি না যে, এ বৃক্ষ বিষবৃক্ষ, এর বিষফল আমাকেই খেতে হবে। সাধারণ জনগণ অর্থাৎ ভোটারা যদি বুঝতেন দেশে দুই দিন পর পর যে এই যুদ্ধাবস্থা সৃষ্টি হয়, জীবন্ ভোটারকে রোস্ট করা হয়, মানুষের সহায়-mn¤ú`-জীবনের সকল অবলম্বনকে ধূলিসাৎ করে দেওয়া হয় এটাই গণতন্ত্রের মূতিমান রূপ। এই সত্য তাদেরকে

বুঝতে দেওয়া হয় না, কারণ তারা বুঝে গেলে ভোটবাক্স যে খালি পড়ে থাকবে। আমাদের সংবিধানে গণতন্ত্রের নামে যে ভালো ভালো কথাগুলো লেখা আছে, সেগুলোর আশায় মানুষ প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম দিন গুনে গুনে পরলোকে যাত্রা করছে, কিন্তু সেই কল্পরাজ্য, গণতন্ত্রের ইউটোপিয়া সংবিধানের পাতা থেকে আর বস্তুজগতে মূর্তিমান হচ্ছে না।

একাত্তরের পর থেকে আজ অবধি গণতন্ত্রকে যদি আমরা পরীক্ষামূলক রাজনীতিক মতবাদ হিসেবে ধরি দেখব এর সামগ্রিক ফলাফল অনেকগুলো kbv, সুস্থ চিন্তাসম্পন্ন জাতির কাছে এর কোনো গ্রহণযোগ্যতা থাকতে পারে না। এই তন্ত্র টিকে আছে কেবলই ষোল কোটি মানুষের অনৈক্যের উপর ভিত্তি করে এবং তাদের সামনে আর কোনো বিকল্প না থাকার দরুন। তাই আমরা গণতন্ত্রের উপরই আস্থা রাখতে চাই, মার খাওয়ার অসম্ভব ক্ষমতা নিয়ে আমরা বাঙালিরা জন্মেছি। আমরাদের পূর্বপুরুষ মার খেয়ে অভ্যস্ত ছিলেন, তারা মার খেতেন বিদেশি শাসকদের, আমরা মার খাই আমাদের ভোটে নির্বাচিত শাসকদের। কোনটা উত্তম তা মহাকালই বিবেচনা করবেন। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার নামে আমরা সেই একাত্তর থেকে আজ অবধি প্রতিনিয়ত ঢেলে যাচ্ছি নিজের বুকের রক্ত। দেশ গড়ার দিকে আমাদের নেতাদের নজর নেই, ডাস্টবিনে কুকুর যেমন আবর্জনার দখল নিয়ে কামড়া কামড়ি করে, আমাদের ভদ্র, সুশীল, সুবেশি রাজনীতিকরা তেমনটাই করেন জাতির সম্পদ লুটে খাওয়ার জন্য। তাদের স্বার্থের লড়াইয়ে ককটেল-পেট্রল বোমায় ঝলসিয়ে যাচ্ছি নিজেদেরকে, তবু আমরা এই অন্যায় তন্ত্রের বিরুদ্ধে এক হতে পারি না, কেবল কেঁদে যাই। আমাদের কান্না দেখার কেউ নেই। আমাদের একমাত্র পরিচয় আমরা ভোটার।

গণতন্ত্র আমরা পেয়েছি মূলত ব্রিটিশদের হাত ধরে। তারা দুইশ' বছরের kvmb-শোষণ চালিয়ে যখন উপমহাদেশ ছেড়ে আমাদেরকে আপাত স্বাধীনতা দিয়ে চলে গেল, তখন চাপিয়ে দিয়ে গেল গণতন্ত্র নামের এই সোনার পাথরবাটি। আজ ব্রিটিশপরবর্তী অর্ধশত বছরের বেশি সময় পেরিয়ে এসেও

আমরা সেই সোনার পাথরবাটির স্বরূপ অনুধাবন করতে পারি নি। গণতন্ত্রের একটাই সুবিধা, এর চর্চায় মানুষ বাক্যবাগিশ হতে পারে, যে বাক্যগুলোকে ফাঁকাবুলি বলাই অধিক যুক্তিযুক্ত। বলা হয়ে থাকে- MYZন্ত্র এমন একটি পদ্ধতি যেখানে জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত প্রতিনিধি থাকেন যারা জনগণের বাকস্বাধীনতা, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক অভিমত প্রকাশের অধিকারকে রক্ষণাবেক্ষণ করেন (Of the people)। গণতন্ত্র হলো একটি সর্বসাধারণের দ্বারা পরিচালিত সরকার পদ্ধতি (By the people)| GB ব্যবস্থার অধীনে শাসকগণ নির্বাচিত হয়ে জনগণের ইচ্ছা অনুসারে দেশ শাসন করেন। গ্রিক দার্শনিক অ্যারিস্টটলের মতে, 'যে ব্যবস্থায় প্রত্যেকের অংশগ্রহণ নিশ্চিত হয়নি তা কুলীনতন্ত্র এবং যেখানে প্রত্যেকের অংশগ্রহণ নিশ্চিত হয়েছে তা গণতন্ত্র।' কল্পবিলাসী সাম্যবাদের পতনের পর গণতন্ত্রের এইসব তাত্ত্বিক বুলিই পৃথিবীব্যাপী এর বিস্তারে অবদান রেখেছে। এসব মনোলোভা Ges AvKIYxq K_v-বার্তায় আমাদেরকে মোহিত করে রাখা হচ্ছে। কেউ যদিওবা গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে মুখ খোলে তার মুখ বন্ধ করে দেওয়ার জন্য বলা হয়, গণতন্ত্র প্রাতিষ্ঠানিকরূপ পায় নি, গণতন্ত্র এদেশে এখনো শিশুকাল পেরোয় নি ইত্যাদি। আসলে আমরা ভাবছি, পশ্চিমারা যে আজ এত চাকচিক্যের মধ্যে বাস করছে, এটা বুঝি গণতন্ত্রের ফল। আসলে তা নয়। তারা দীর্ঘ দিন প্রায় সারা বিশ্বটাকে উপনিবেশ বানিয়ে তাদের সম্পদ লুটপাট করে নিজেদের দেশকে উন্নত করেছে। আসলে তারাও সুখে নেই। তাদের দেশের অভ্যন্তরীণ অপরাধ অর্থাৎ খুনো-Lwb, Pwi-WvKwZ, aIY, AvZ¥nZ¨v BZ¨w` সামাজিক অপরাধের পরিসংখ্যান দেখলে আমরা দেখতে পাব যে পাশ্চাত্যের সমাজকে যতটা সুখী মনে করা হয় মোটেও তারা ততটা সুখী bq| cPi weË-বৈভবের মাঝেও রয়েছে বিরাট আর্থিক বৈষম্য। টিভিতে যেটা দেখা যায় সেটাই সব নয়, আরো আছে অনেক কিছুই। পশ্চিমা গণতন্ত্রকে প্রাচ্যের আবহাওয়ায় বড় করতে গিয়ে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে যে সমস্যাগুলো দেখা যাচ্ছে তার মধ্যে অন্যতম হলো:

ক) জাতির মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি:

গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে যে সমস্যাগুলো দেখা দেয় তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে বহুদল ও বহুমতের নামে জাতি বিনাশী অনৈক্যর জন্ম দেয়া। গণতান্ত্রিক ভাষায় বলা হয়ে থাকে- যে দেশে যত বেশি রাজনৈতিক দল থাকে সেই দেশের গণতন্ত্র তত বেশি পরিপক্ক। বাস্eZvq eû`j I বহুমতের পরিণাম হচ্ছে অনৈক্য, বিভেদ ও অশান্ি। একটি জাতির উন্নতির প্রথম সূত্রই হলো ঐক্য। সুতরাং দেখা যাচ্ছে বুনিয়াদিভাবেই গণতন্ত্র অনৈক্যের সকল উপাদান বিলিয়ে যায়। গণতান্ত্রিক ধারায় প্রতিটি রাজনৈতিক দলের পাশাপাশি তার বিভিন্ন অঙ্গ-সংগঠনসমূহকেও বৈধতা প্রদান করে। এর সূত্র ধরে দলের ভেতর সৃষ্টি হয় আরো উপদলের। স্বাভাবিক ফলাফল দলের মধ্যে অন্র্কোন্দল, হানাহানি, ক্ষমতা ও পদ দখলের লড়াই। অর্থাৎ গণতন্ত্র একই মত ও পথে বিশ্বাসীদেরকেও এক সূত্রে আবদ্ধ হতে দিতে চায় না। Zviv weপক্ষ শক্তির চেয়ে নিজের দলের দ্বারাই বেশি আক্রান্, nZvnZ nq|

খ) বিরোধী মতের বৈধতাদানকারী গণতন্ত্র:

গণতান্ত্রিক সিস্টেম রাষ্ট পরিচালনায় বিরোধী দলের অস্িত্বকে অত্যাবশ্যক বলে জ্ঞান করে থাকেন প্রায় সকল রাষ্ট্রবিজ্ঞানী এবং এতদসংক্রান্ গবেষকগণ। তাদের মতে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় সরকার ও বিরোধx `j দুটি স্বতন্ত্র উপাদান। তারা একটি অপরটির পরিপূরক। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় যে দল নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন পায়, তারা সরকার গঠন করে। যারা কম আসন পায়, তারা থাকে বিরোধী দলে। এই দু'য়ের স্বতন্ত্র ভূমিকা শাসনব্যবস্থায় ভারসাম্য রক্ষা করে। এ কারণে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সরকার স্বেচ্ছাচারী হতে পারে না। সরকারের অযৌক্তিক কাজে বিরোধী দল বাধা প্রদান করে সরকারের স্বৈরাচারী আচরণকে বাধাগ্রস্ করে। কিন্তু বাস্বে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে দেখা যায় সম্পূর্ণ উল্টো চিত্র।

আমাদের গণতান্ত্রিক অভিজ্ঞতা হচ্ছে, শুধুমাত্র বিরোধিতা করার খাতিরেই বিরোধী দল যতদিন বিরোধী দলে থাকে ততদিন সরকারের ভালো-মন্দ সকল

কর্মকাণ্ডের একচেটিয়া বিরোধিতা করে যায়। এমনও দেখা যায় বাজেট ঘোষণার আগেই বিরোধীদল বাজেটের বিরুদ্ধে কর্মসূচি গ্রহণ করে ফেলে, এমনকি বিকল্প বাজেটও তৈরি করে। সরকারের এমন একটি সিদ্ধান্ও থাকে bv hvi ev¯বায়নের পথে বিরোধী দল বিরোধিতা করে না। ফলে সরকারি দল আর বিরোধী দলের মাঝে সব সময়ই থাকে দা-কুমড়া সম্পর্ক। সরকারের উপর চাপ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে হরতাল-অবরোধ, জ্বালাও- পোড়াও, ভাঙচুর ইত্যাদি করে জনজীবন বিপর্যস্ করে তোলে বিরোধী দল। অপরদিকে সরকারি দলের পক্ষ থেকেও বিরোধীদলের উপর চলে দমন-পীড়নের স্টিম রোলার। অবস্থা এমন দাঁড়ায় যে-সরকারি দল আর বিরোধী দলের লড়াইয়ে জনগণের প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে পড়ে।

গ) নেতা নির্বাচনে ভুল পদ্ধতিঃ

একটি পুকুরে যদি বড় বড় ফাঁকা বিশিষ্ট একটি জাল দিয়ে মাছ ধরা হয়, তাহলে সেই জালে কোনো ছোটমাছ ধরা পড়বে না, ধরা পড়বে কেবল বড় মাছগুলি। ছোট মাছ ধরার বেলায় জালের ফাঁকাগুলি হতে হয় খুব ছোট, যেমন কারেন্ট জাল। সুতরাং কোন ধরনের মাছ আমি ধরব তার উপরে নির্ভর করবে আমার জাল কেমন হবে, অর্থাৎ এই জাল হচ্ছে মাছ ধরার একটি System. বর্তমানে গণতন্ত্রে যে পদ্ধতিতে নেতা নির্বাচন করা হয় সেটি হচ্ছে বড় ফাঁকাবিশিষ্ট একটি জালের মতো, অর্থাৎ বড় বড় রুই KvZjviB এতে উঠে আসবে। সমাজে যারা প্রভাবশালী, বিত্তবান, পেশীশক্তিতে বলীয়ান তারাই এখন সমাজের রুই কাতলা। পক্ষান্তরে যারা চরিত্রবান, ভালো মানুষ, ওয়াদা রক্ষাকারী, ভদ্র, কারও ক্ষতি করে না তারা বর্তমানের সমাজে বোকা হিসাবে চিহ্নিত, তারা গুরুত্বহীন, সর্বত্র অবদমিত। এই দুই ধরনের মানুষের সমন্বয়েই সমাজ। এই সমাজে প্রচলিত পদ্ধতির নির্বাচনে কেমন লোক নির্বাচিত হবে সেটা দেখা যাক।

প্রচলিত পদ্ধতির নির্বাচনে প্রথমে একজন টাকা দিয়ে মনোনয়ন পত্র কিনে প্রার্থী হয়, নিজের ছবি দিয়ে পোস্টার ছাপায়, নিজের গুণগান নিজেই প্রচার

করে, মিছিল করে, ব্যানার টানায়, পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেয়, মানুষকে তার পক্ষে নেয়ার জন্য বিভিন্ন প্রলোভন দেখায়, প্রয়োজনে বহু হিংসাত্মক কাজে জড়িত হয় যেমন প্রতিপক্ষকে খুন করা, বোমা মেরে উড়িয়ে দেয়া ইত্যাদি। গ্রাম্য মেম্বার থেকে শুরু করে যে কোনো পর্যায়ের নির্বাচনেই এসব ঘটনা ঘটে থাকে। এটাই নেতা নির্বাচনের বর্তমান সিস্টেম, সারা দুনিয়াতে এই সিস্টেম প্রায় একই রকম, কোথাও সহিংসতা কম, কোথাও বেশি। এখন ধরুন একজন সৎ মানুষ আছেন যিনি বিত্তবান নন, নিজস্ব কোনো লাঠিয়াল বাহিনী নেই, পেছনে প্রভাবশালী গোষ্ঠির মদদ নেই তিনি নির্বাচনে দাঁড়ালেন। তার প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বড়ই দুঃশ্চরিত্রের অধিকারী, নীতিহীন এবং অনেক টাকার মালিক। এখন এই নির্বাচনে বিজয়ী হওয়ার সম্ভাবনা কার? সহজ উত্তরঃ এই দ্বিতীয় লোকটাই বিজয়ী হবে। এভাবে প্রতিটি পর্যায় থেকে খারাপ লোকগুলি বিজয়ী হতে হতে সর্বোচ্চ পর্যায়ে আসে। সুতরাং বড় ফাঁক বিশিষ্ট জাল দিয়ে যেমন সব ছোট মাছ বেরিয়ে যায় এবং বড় মাছগুলি রয়ে যায়, তেমনি নির্বাচনের বর্তমান পদ্ধতিতে সবচেয়ে বড় দুর্নীতিবাজ, অসৎ চরিত্রের মানুষটিই বিজয়ী হয়ে নেতার আসনে উপবিষ্ট হন। এখন নেতারা সমাজ সেবার কাজ যা কিছু করে সব প্রশংসার জন্য। আজকে নেতারা জনগণের দেয়া করের টাকায় কোথাও একটা ব্রিজ তৈরি করে দেয়, একটা ছেলেকে যদি বৃত্তি, একজন বৃদ্ধকে কিছু টাকা দেয় সেটা নিয়েও তাদের প্রচারণার কোনো শেষ থাকে না, সব অবদানের সঙ্গে নিজের নামটি অবধারিতভাবে জুড়ে দেয়। টিভি ক্যামেরা না আসলে ত্রাণ দেওয়া বন্ধ থাকে। এটাও না যে, যারা এই পদ্ধতিতে নেতা নির্বাচিত হন তাদের ১০০% ই খারাপ লোক, কিছু কিছু সচ্চরিত্র লোকও এ পদ্ধতির জালে উঠে আসেন তবে তাদের সংখ্যা অতি নগণ্য। আর আসলেও তারা বেশিদিন তাদের চরিত্র বজায় রাখতে পারেন না; System টাই এমনভাবে তৈরি যে, কেউ ভালো থাকতে চাইলেও ভালো থাকতে পারেন না, বিরুদ্ধ স্রোতে বেশিদিন নৌকা বাইতে পারেন না।

ঘ) গণতান্ত্রিক অধিকার আদায়ের আন্দোলনঃ

গণতন্ত্র ক্ষমতাসীন সরকারের অনৈতিক ও অযৌক্তিক আচরণের প্রতিবাদে বিরোধী দলকে বিভিন্ন কর্মসূচীর অধিকার প্রদান করে। এসব কর্মকাণ্ড প্রায় সময়ই দেখা যায় সহিংসতার রূপ নেয়। বিরোধীদল কতটা শক্তিশালী তা wePvi Kiv nq mwnsmZvq Zviv KZUv wm×n¯ Zvi Dci| GB AwaKvi বলে তারা বছরের বিশেষ একটা সময় ধরে হরতাল, অবciva, Rvjvl-পোড়াও, বিভে, ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ ইত্যাদি করে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রাকে হুমকির মুখোমুখি দাঁড় করায়।

0) Nb Nb miKvi cwieZb:

সরকারি দল ও বিরোধী দলের এই সংঘাত ও মানি না মানবো না এসব দাবি এবং বিরোধী দল রাজনৈতিক কর্মসূচী দিয়ে, সহিংসতা ঘটিয়ে cvqB সরকারকে ক্ষমতা থেকে টেনে-হিঁচড়ে নামায়। বিরোধী দল সরকারে গেলে সরকারি দল আবার বিরোধী দলে গিয়ে ঐ একই কাজ করে। উভয়ের এই লড়াইয়ে কোনো সরকারই নিশ্চিন্নে দীর্ঘ মেয়াদী উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বাস্evqb করতে পারে না। আবার উভয় পরে হানাহানিতে অচলাবস্থার সৃষ্টি হলে mvgwiK ewnbi বাধ্য হয়ে ক্ষমতা দখল করে নেয়। এভাবে ক্ষমতার কামড়া-কামড়ির সুযোগে বিশ্ব মোড়লগণ তাদের আধিপত্য বিস্তার করে নানা ধরনেi সুযোগ-সুবিধা আদায় করে নেয়।

চ) গণতন্ত্রের সার্বিক ফলাফলঃ

আধুনিক পৃথিবীতে একদিকে চলছে গণতন্ত্রের জয়-জয়কার, আর অপরদিকে চলছে অন্যায়-AwePvi, Rjg-wbhvZb, ¸g-খুনের মহোৎসব। পরিসংখ্যান খুললেই দেখা যাবে- গণতন্ত্র পালনকারীরা অতীতের যে কোনো সময়ের চেয়ে Ab¨vq-অবিচার, অশান্তিতে নিমজ্জিত হচ্ছে। শুধু গণতন্ত্রই নয়, এই একই রকম ফল সবক'টি মানবসৃষ্ট জীবনব্যবস্থাতেই। এক সময় মানুষ রাজতন্ত্র, একনায়কতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র পরিবর্তনের জন্য জীবন দিয়ে গণতন্ত্র এনেছে আর এখন তাতেও সন্তুষ্টি অর্জন করতে না পেরে ভিন্ন পথ খুঁজছে। কিন্তু

একের পর এক জীবনব্যবস্থা সৃষ্টি ও প্রয়োগের ফলে মানুষ আজ কান্-শ্রান্ আস্থা হারানো দিশেহারা পথিক। এটাই ছিল তাদের শেষ ভরসা, সামনেও আর কিছু নেই। ধর্মগুলোতো কবেই পঁচে গেছে। তাই গণতন্ত্রের ব্যর্থতায় Aজান্েই নিজেকে এই বলে সান্না দেয় যে গণতন্ত্রকে আজও প্রতিষ্ঠা করতে পারলাম না। অপরদিকে গণতন্ত্রের ফুটো দিন দিন এত বড় হয়ে উঠছে যে, তা আর ঢেকে রাখা যাচ্ছে না, বোঝা যাচ্ছে মানুষ হাজার ইচ্ছে করেও আর বেশিদিন এরই ব্যবস্থা ধরে রাখতে পারবে না, শিশুকালেই গণতন্ত্রের আয়ু শেষ। এক সময় অন্যান্য জীবনব্যবস্থা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য সে সংগ্রাম করেছে, এবার গণতন্ত্র থেকে বের হওয়ার জন্য সে সংগ্রাম করবে।

তারচেয়ে বড় কথা হলো, সবাই আজ শান্তি চাই, সত্যিকারের শান্তি| Avgiv যদি সত্যিই শান্তি পেতে চাই প্রথমত আমাদেরকে গণতন্ত্রের প্রতি অন্ধবিশ্বাস দূর করতে হবে। কোনো অন্ধবিশ্বাসই ভালো নয়, সকল অন্ধবিশ্বাসই মৌলবাদ। আল্লাহ বলেছেন, "বস্তুত চক্ষুতো অন্ধ হয় না, কিন্তু বক্ষস্থিত অন্ iB AÜ nq (miv Zv-হা ৪৬)। তাই দেখে, শুনে, হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করে বিশ্বাস স্থাপন করা জরুরি, সে বিশ্বাস ধর্মের প্রতিই হোক আর গণতন্ত্রের প্রতিই হোক। যা কিছুই অকল্যাণকর, অশান্তি মূল তার থেকে দ্রুত বিশ্বাস প্রত্যাহার করাও সমধিক জরুরি।

ইসলামে নেতৃত্ব মনোনয়নের পদ্ধতি

এবার ইসলামে নেতৃত্ব মনোনয়নের পদ্ধতিটি দেখা যাক। রসুলাল্লাহ বলেছেন, তোমরা যখন কারো ভিতর নেতৃত্ব পাবার বাসনা, আকাঙ্ক্ষা দেখ-সে যেন কখনও তোমাদের মধ্যে নেতা না হতে পারে [আবু বুরাদা (iv.) থেকে বোখারী]। সুতরাং এটা হচ্ছে প্রথম নীতি। ইসলামের সভ্যতার সাথে বর্তমানের সিস্টেমের আসমান জমিন পার্থক্য, বলা যায় বিপরীত। ইসলামের কথা হলো, কর্তৃপক্ষ যদি কোনো প্রকারে বোঝে যে কোনো এলাকার আমীর (নেতা) হবার জন্য একজন লোকের মনে অভিপ্রায় আছে তাহলে শুরুতেই সে

Aযোগ্য বলে পরিগণিত হবে, তাকে বাহ্যিক দৃষ্টিতে যতোই যোগ্য মনে হোক না কেন। বর্তমানের পদ্ধতিতে অযোগ্যতা হলো কেউ আদালতে শাস্তি পেলে, ব্যাংকের ঋণখেলাপি হলে, বয়স কম হলে ইত্যাদি বিষয়। কিন্তু ইসলামে নেতৃত্ব পাবার অন্যান্য অযোগ্যতার পূর্বে প্রাথমিক অযোগ্যতা হলো নেতৃত্ব পাবার লোভ, বাসনা। আল্লাহর রসুল তাঁর অন্তিম সময়ে মুতার প্রান্তরে একটি সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন যে বাহিনীর প্রধান হিসাবে তিনি মনোনীত করেন ১৭ বছর বয়সী ওসামা বিন যায়েদকে (রা.)। মোহাম্মদ বিন কাসেম ছিলেন সিন্ধু অভিযানের সেনাপতি। তখন তারও বয়স ছিল মাত্র ১৭ বছর। সুতরাং ইসলামে অল্প বয়সী হওয়াটা নেতা হওয়ার ক্ষেত্রে একমাত্র অযোগ্যতা নয়। প্রথম অযোগ্যতা হলো, "নেতা হবার কামনা"। এটা হলো উর্ধ্বতন নেতা কর্তৃক অধস্তন নেতা নিযুক্তির বেলায় নিয়ম।

কিন্তু সাধারণ ক্ষেত্রে নেতা নির্বাচন পদ্ধতি হলো- একটা গ্রামের আমীর নির্বাচনের ক্ষেত্রে খুঁজে বের করতে হবে এমন ব্যক্তিকে যিনি সবচেয়ে আল্লাহ ভীরু, মুত্তাকি, আমানতদার, সৎ, আল্লাহর হুকুম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে নির্ভীক, স্বজনপ্রীতি করেন না। যাঁর সামনে পাহাড় নড়বে কিন্তু তার ওয়াদা নড়বে না, কোটি টাকা তার ঘরে আমানত রাখলে তিনি ধরেও দেখেন না টাকাগুলি নতুন না পুরানো- এমন লোকের খোঁজ নিতে হবে। বিস্তwiZ Lei নেয়ার পরে তার নাম ঘোষণা করতে হবে। যার নাম ঘোষণা করা হবে সে হয়তো নিজেও জানবে না একটু পরে সে এই এলাকার আমীর হবে। এই আমীররা আবার সবাই মিলে তাদের মধ্যে সবচেয়ে মুত্তাকী ও উপরোক্ত সদগুণাবলী বিশিষ্ট লোকটিকে তাদের নেতা নির্বাচিত করবেন। এইভাবে পর্যায়ক্রমে আমীর wbewচত হতে হতে একেবারে রাষ্ট্রপ্রধান অর্থাৎ ইমাম পর্যন্ত নেতা নির্বাচিত হবে। এ হলো ইসলামী সভ্যতা। বর্তমানে যে নিয়মটি প্রচলিত আছে সেটা এর সম্পূর্ণ বিপরীত, কারণ বর্তমানে নেতা হতে শুরুতেই প্রার্থী হতে হয়। জমিতে আগাছার প্রাদুর্ভাবে যেমন ফসল বিনষ্ট হয়, তেমনি আজ পৃথিবীর cvq meÎ `ঃশ্চরিত্র, মিথ্যাবাদি, ষড়যন্ত্রকারী, পরসম্পদলোভী, দুর্নীতিগ্রস্ত

লোকগুলি নেতার আসনে বসে থাকার কারণে ভালো লোক, নিরপেক্ষ, লোভ লালসার উর্দ্ধে এমন লোক প্রায় নিশ্চিহ্ন হওয়ার পথে, থাকলেও তারা অস্তিত্বের সংকটে আছেন। অথচ আজ থেকে মাত্র কয়েক দশক আগেও আমাদের এই দেশে সৎ লোকেরা নিজে থেকেই সমাজের নেতৃত্ব ও সেবামূলক কাজে এগিয়ে আসতেন অথবা মানুষজনই তাদেরকে একরকম জোর করে তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই সমাজ পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ করত। তারা সাধারণত সৎ, নির্ভীক, লোভ-লালসাহীন, অন্যের উপকার, মানবসেবা ইত্যাদিকে তারা ধর্মীয় কাজ ও নৈতিক দায়িত্ব বলে মনে করতেন। ফলে দেখা যেত কোনো অর্থকড়ি খরচ না করেই তারা নির্বাচিত হতেন। অনেকে নির্বাচনে না জিতলেও নিজের পয়সায় সমাজ সেবা করে যেতেন। কিন্তু আজ দিন বদলেছে। এখন সমাজে এমন অর্থশালী মানুষ পাওয়া কঠিন যারা দেশের মানুষের উপকারের জন্য স্কুল কলেজ হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেন। যারা করেন তাদের অধিকাংশের উদ্দেশ্য থাকে কেবলই ব্যবসা। আর নেতারা এইকাজগুলি করেন সরকারের টাকায়, যদিও বরাদ্দ টাকার বেশির ভাগই ভাগ বাটোয়ারা করে খায় রাঘব বোয়াল থেকে চুনোপুঁটির লম্বা লাইন।

রাজনীতি ও ধর্মের বিনিময়ে অর্থোপার্জন অশান্তি gj KviY

পৃথিবীতে মানুষের সঙ্গে মানুষের যত সংঘাত সবকিছুর পেছনে স্বার্থের দ্বন্দ্বই একমাত্র কারণ। রাজনীতিকরা বলে থাকেন যে তারা দেশ ও মানুষের জন্য রাজনীতি করেন, কিন্তু বাস্তবে আমরা তার উল্টো চিত্রই দেখি। আমরা দেখি রাজনীতিকরাই দেশ ও জাতিকে ধ্বংস করে দিয়ে ক্ষমতা ও অর্থের লোভে রাজনীতি করেন। মানুষ এ রাজনীতিকে ঘৃণা করে, রাজনীতিকদেi cwZ Zviv আল্লাহর গজব কামনা করে, তারা দিনরাত এ রাজনীতিকদেরকে অভিশাপ দেয়। আমরা আর এ রাজনীতি চাই না। আমরা চাই এমন রাজনীতি যার উদ্দেশ্য হবে শুধুই মানবকল্যাণ, দেশের কল্যাণ এবং সেটা কথা নয় - কাজে।

আমরা মনে করি, চলমান এ সংকট নিরসনের জন্য এবং ভবিষ্যতেও এমন সংকটের পুনরাবৃত্তি এড়ানোর জন্য রাজনীতির অঙ্গনে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনা যেতে পারে।

১. রাজনীতিকরা রাজনীতি করে একটি টাকাও গ্রহণ করবেন না, তিনি সরকারী বা বিরোধী দল যেখানেই থাকুন না কেন। মন্ত্রী, সাংসদ থেকে শুরু করে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি পর্যন্ কেউ কোনো বেতন, ভাতা, গাড়ি, ewo, মোবাইল বিল পর্যন্ রাষ্ট্রের একটি টাকাও গ্রহণ করবেন না। আল্লাহ তাদেরকে কম দেন নি। এক কথায় তারা নিজের খরচে রাজনীতি করবেন, গাড়িতে চড়লে নিজের গাড়িতে চড়বেন, সামর্থ্য না থাকলে পাবলিক পরিবহনে যাতায়াত করবেন, নিজের ঘরে ঘুমাবেন, নিজের বৈধ উপায়ে অর্জিত খাদ্য খাবেন।

2. রাজনীতির মত ধর্মের কাজ করেও কেউ কোনো অর্থ গ্রহণ করবেন না। কারণ আল্লাহ তা হারাম করেছেন। ধর্মের বিনিময় নিলে সেটা বিকৃত হয়, ফলে ধর্মের নামে অর্ধম প্রচলিত হয়। ধর্ম মানুষের কল্যাণের চেয়ে অকল্যাণে বেশি ব্যবহৃত হয়। ধর্ম দ্বারা স্বার্থ সিদ্ধি করার জন্যই ধর্মব্যবসায়ীরা মানুষের agwekাসকে ভুল পথে পরিচালিত করার সুযোগ পায় যার পরিণামে সৃষ্টি হয় সহিংসতা ও বিদ্বেষ।

ষোল কোটি বাঙালি এই দুটি অন্যায়ের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হলে সমাজের চলমান সংকটসহ অধিকাংশ অন্যায় ও অশান্তি দূরীভূত হবে, এ কথা আমরা নির্দ্বিধায় বলতে পারি। এবং আমরা এও বিশ্বাস করি, এ জাতির মধ্যে নিt¯v_ অনেক মানুষ আছেন যাদেরকে আল্লাহ যথেষ্ট অর্থ-সম্পদ, শারীরিক যোগ্যতা, মেধা ও মননশীলতা দিয়েছেন কিন্তু রাজনীতির অঙ্গন মিথ্যা দিয়ে অপবিত্র হয়ে যাওয়ায় তারা এখানে আসতে চান না। রাজনীতি স্বার্থমুক্ত হলে অবশ্যই ভালো মানুষেরা দেশ ও দশের কল্যাণে কাজ করার সুযোগ পাবেন, স্বার্থবা`x রাজনীতিকরাও সংশোধিত হবেন।

ag I bw¯K¨: `vb I cwRev`

wiqv`j nvmvb

খ্রিস্ট ধর্ম মানুষের জাতীয় জীবনে শান্তি আনতে ব্যর্থ হওয়ার ফলশ্রুতিতে সংঘটিত রেনেসাঁর পর থেকে স্রষ্টার অস্তিত্বে অবিশ্বাস বা সন্দেহ করা ইউরোপ-প্রভাবিত শিক্ষিত সমাজের একটি ফ্যাশনে রূপ নিয়েছে। আধুনিকZv আর ধর্মকে বিদ্রূপ করা যেন সমার্থক হয়ে দাঁড়িয়েছে। অনেকেই নিজেকে bw¯ক হিসাবে প্রচার করতে গর্বিত বোধ করেন, তবে তার মানে এই নয় যে Zviv mwZ¨B bw¯ক হতে পেরেছেন। নাস্তিকতার রকমফের আছে যেমন ডগমাটিক বা গোঁড়া নাস্তিক, স্কেপটিক্যাল বা সংশয়বাদী নাস্তিK, wµwUK¨vj ev mমালোচনামূলক নাস্তিK, c¨vKwUK¨vj ev ev¯egLx bw¯K, অ্যাগনোস্টিক বা অজ্ঞেয়বাদী, ডায়ালেক্টিকেল বা দ্বান্দ্বিক নাস্তিK, সেমান্টিকেল, মার্কসিসটিক, মনস্তাত্ত্বিক ইত্যাদি ইত্যাদি। সন্দেহবাদীদের ভিড়ে প্রকৃত নাস্তিক খুঁজে পাওয়া খুবই দুরূহ। তাদের লক্ষণ সম্পর্কে সংক্ষেপে শুধু এটুকু বোলতে পারি, যারা প্রকৃতই নাস্তিK Zviv wbR Rb¥`vÎx জননীর সঙ্গে শারীরীক সম্পর্ক স্থাপন করতেও কোনো আত্মগ্লানী অনুভব করবেন না। কারণ ওই কাজ করতে ধর্মের নিষেধাজ্ঞা আছে, গণতন্ত্রে বা সমাজতন্ত্রে কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই, আর প্রকৃত নাস্তিকরা ধর্মকে তথা ঈশ্বরকে বিশ্বাসই করেন না।

hviv c¨vKwUK¨vj bw¯ক তাদের অভিমত হলো আল্লাহ থাকা বা না থাকায় মানুষের কিছু নেই। আল্লাহ ছাড়াও মানুষ চলতে সক্ষম, সবচেয়ে বড় ধর্ম gvbeag- যার সঙ্গে ঈশ্বরের কোনো সম্পর্ক না থাকলেও চলবে। এরাই ধর্মের সব বিধিব্যবস্থাকে তুলে দিয়ে নিজেদের মনগড়া বিধান দিয়ে মানবসমাজ পরিচালনা করতে চান। আজকের যে বিশ্বব্যবস্থার মধ্যে আমরা বসবাস করছি সেটা মূলত এই প্রকার নাস্তিকতা থেকেই উৎসারিত ধর্মনিরপেক্ষতা।

ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীরা জীবনের সকল অঙ্গনকে ধর্মের প্রভাবমুক্ত করতে চায়। তারা কি কখনো ভেবে দেখেছে যে সমাজের হতদরিদ্র মানুষগুলির জীবনযাপনের কথা যারা নিজেরা অধিক অর্থ উপার্জনে সক্ষg bq Ges hviv অচল? সমাজের একটি বিরাট অংশের মানুষ অন্যের দানের উপর নির্ভরশীল। দরিদ্রকে অর্থ দান সকল ধর্মের শিক্ষা, মহামানব তথা নবী-imj-অবতারদের শিক্ষা। হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান নির্বিশেষে সকল ধর্মমনা ব্যক্তিই দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে কম বেশি অর্থ দান করে থাকে। তারা এই দান করে cavbZ মানবসেবা এবং পরকালীন মুক্তির আশায়। নাস্কিদের প্রতি আমাদের কথা হলো, এই যে তারা ধর্মকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে, স্রষ্টা ও পরকালের অস্তিত্বকে অস্বীকার করে, তাহলে এই অভাবগ্রস্, আশ্রয়হীন, অন্নহীন বস্ত্রহীনদেরকে তারা কী করবে? তারা কি পারবে রাষ্ট্রব্যবস্থার মাধ্যমে এই কোটি কোটি মানুষকে বহন করতে? এই যে আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থা আজ কায়েম করা হয়েছে তা দিন দিন মানুষকে আত্মাহীন পশুতে পরিণত করে ফেলছে, উপার্জনে অক্ষম বৃদ্ধ পিতাকে, বৃদ্ধা মাতাকে বৃদ্ধাশ্রমে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে, অনাত্মীয় দরিদ্র মানুষকে দয়া করার তো প্রশ্নই আসে না। বেশি দিন হয় নি সমাজের মধ্যে কিছু দানশীল লোক থাকতেন যারা নিজের অর্থে সমাজের মানুষের জন্য eû wk¶vjq, nvmcvZvj, iv¯ঘাট, সরাইখানা, দাতব্য প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করে দিতেন। হাজী মোহাম্মদ মোহসিন, রণদা প্রসাদ সাহার নাম আজও মানুষের মুখে মুখে ফেরে। ধনীরা দান করবে এটাই ছিল স্বাভাবিক, অথচ পশ্চিমা বস্তুবাদী সভ্যতা মানুষকে এমন পুঁজিবাদী কৃপণে পরিণত করছে যে, যে যত ধনী সেই ততো অর্থ-কাঙাল। দান তো দূরের কথা, তারা যদি কোনো হাসপাতাল বা স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন তার পেছনেও থাকে অর্থলিপ্সা। দাতব্য প্রতিষ্ঠান গড়ার চিন্া এখন আর তাদের চিন্v-চেতনায় উদয় হয় না। অথচ একেই বলা হচ্ছে কল্যাণ রাষ্ট্র, কী বিদ্রূপ। এই কল্যাণ রাষ্ট্র কি পারবে সব দরিদ্র মানুষকে একদিনের আহার যোগাতে? পারবে না। অথচ মানুষ ধর্ম দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে পরকালের মুক্তির আশায় দান করে এই কোটি কোটি

মানুষকে দান-খয়রাতের মাধ্যমে প্রতিপালন করে যাচ্ছে। এই অভাবী মানুষকে একদিন খাওয়ানোর তো সাধ্য নেই তার উপর পুঁজিবাদী অর্থনীতির প্রভাবে মানুষের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্য ও ভারসাম্যহীনতা দিন দিন চূড়ান্ত আকার নিচ্ছে। এক জায়গায় কিছু মানুষ পাহাড়সমান সম্পদের মালিকে পরিণত হচ্ছে, আরেক জায়গায় মানুষ না খেয়ে মরছে। এটা সৃষ্টি করেছে বস্তুবাদ, ধর্মনিরপেক্ষ ব্যবস্থা। এটা পাশ্চাত্য সভ্যতার সৃষ্টি। ধর্মের কারণেই প্রতিদিন কোনো রকমে এই দরিদ্র মানুষের অন্নসংস্থান হচ্ছে, সমাজটা এখনো মরতে মরতে টিকে আছে। তা না হলে তো মানুষের গোশত আজ মানুষ খেতো।

agnxb wk¶v-ব্যবস্থার উত্তরাধিকার

wiqv`j nvmvb

মানবজাতির ইতিহাসে ধর্মের অধ্যায়টি বিরাট। এ বিরাট অধ্যায়ের দিকে তাকানোর জন্য আমাদের সামনে এখন দুটো চশমা রয়েছে। একটি ধর্মহীন চশমা, আরেকটি ধর্মের চশমা। এ দুটো চশমায় আমাদের অতীত দুটি ভিন্ন প্রকৃতি নিয়ে ধরা পড়ে।

ধর্মহীন চশমা বলছে, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড এমতেই সৃষ্টি হয়েছে, এর কোনো স্রষ্টা নেই। সকল জীব ও জড়ও এমনি এমনিই সৃষ্টি হয়েছে। প্রাণীকূলের মধ্যে কেউ উন্নত, কেউ অনুন্নত যা নির্ণিত হয়েছে তাদের অভিযোজনের ক্ষমতার ZviZg¨ Øviv| gvbl (Le m¤eZ) GKwU evbiRvZxq weewZZ cvYx, hvi Aw`wcZv-পিতৃব্যরা গাছে থাকত, তাদের লেজ ছিল। খুলির আকৃতির পার্থক্য অনুযায়ী তারা নিগ্রয়েড, ককেশয়েড, মঙ্গলয়েড, অস্ট্রালয়েড ইত্যাদি শ্রেণিবিন্যাসে বিভক্ত।

আর ধর্মের চশমা বলছে, এই বিশ্বজগৎ নিজে থেকে সৃষ্টি হয় নি, এর একজন স্রষ্টা আছেন, যিনি নিরন্তর এটি নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিপালন করছেন। তিনি বিশ্বজগতে এমন কিছু প্রাকৃতিক নিয়ম, ব্যবস্থা বা চক্র আরোপ করেছেন যার দ্বারা সকল বস্তু ও প্রাণির সৃষ্টি, পালন, বাস্তুসংস্থান, ধ্বংস ইত্যাদি সাধিত হয়। মানুষ স্রষ্টার শ্রেষ্ঠ ও ব্যতিক্রমী এক সৃষ্টি যার উদ্ভব জান্নাতে, যার আদিপিতা আদম (আ.), আদিমাতা হাওয়া (আ.)। তাদের থেকেই আজকের সকল হিন্দু, সকল বৌদ্ধ, সকল মুসলিম, সকল খ্রিষ্টান, আর সকলেই।

একটি চশমা দিয়ে তাকালে দেখি নুহ (আ.), এব্রাহxg (Av.), gmv (Av.), ঈসা (আ.) ইত্যাদি বহু উজ্জ্বল নাম। অন্য চশমায় তাদেরকে দেখা যায় না, সেখানে আছে বস্তুবাদী দার্শনিক আর বিভিন্ন রাজবংশের নাম। একটি চশমা বলছে, মানব ইতিহাস নবী-রসুলদের মাধ্যমে মিথ্যার বিরুদ্ধে সত্যের সংগ্রামের ইতিহাস, ধর্মের দ্বারা মানবজাতির শান্তি cvIqvi BwZnvm| Ab¨

চশমাটি বলছে মানুষের অতীত অন্ধকারাচ্ছন্ন ছিল ধর্ম নামক কুসংস্কার ও বর্বরতা দ্বারা। বর্তমানে ধর্ম বিদায় নিয়েছে, মানুষ অন্ধত্ব থেকে মুক্তি পাচ্ছে। বর্তমানে আমরা জাতি হিসাবে দ্বিধাগ্রস্ত, ধর্ম ও আধুনিকতা একে অপরের বিরুদ্ধে অস্ত্র হাতে দণ্ডায়মান, দু নৌকায় পা দিয়ে আছি আমরা। পাশ্চাত্যের সংস্কৃতি উজ্জ্বল আকর্ষণ নিয়ে হাতছানি দিচ্ছে, ধর্ম ক্রমেই বিবর্ণ ও আকর্ষণহীন বিষয়ে পরিণত হচ্ছে। কিন্তু ধর্মীয় মূল্যবোধ রক্তের কণিকায় মিশে আছে যা বাদ দেওয়া সহজ নয়। তবে শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে ধর্মের প্রতি সন্দেহ সৃষ্টির যে প্রচেষ্টা বিগত শতাব্দীগুলোতে চালানো হয়েছে তা খুবই mdj nয়েছে। উত্তর-ঔপনিবেশিক তথাকথিত আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থায় এই দ্বিধা ও সন্দেহ সৃষ্টির সচেতন প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। উপরে যে দুটো চশমার কথা বললাম, বর্তমান বিশ্বের জনসংখ্যা, বিশেষ করে মুসলিম নামধারীরা এ দুটো চশমা দিয়েই নিজেদের ইতিহাসকে দেখতে গিয়ে তালগোল পাকিয়ে ফেলছে। এর প্রভাব পড়ছে তাদের ব্যক্তি থেকে জাতীয় জীবনের সর্বত্র।

এ শিক্ষাব্যবস্থায় ধর্মকে রাখা হয়েছে নামে মাত্র। এস.এস.সি পর্যন্ত ধর্মের যেটুকু রাখা হয়েছে সেটুকুর উদ্দেশ্য নৈতিকতার শিক্ষা প্রদান। কারণ এটা অস্বীকার করার মত অবস্থা এখনও সৃষ্টি হয় নি যে, সকল ভদ্রতা, শিষ্টাচার, সত্যনিষ্ঠা ধর্মেরই অবদান। ধর্ম বইতে বলা হচ্ছে সমস্ত wKQi gwjK móv, অথচ অন্য সকল বইয়ে 'আল্লাহ' শব্দটিও খুঁজে পাওয়া মুশকিল, এমনভাবে móvi Aw¯ত্বতে অস্বীকার করা হয়েছে। আর ধর্মকে সবচেয়ে গুরুত্বহীন বিষয়ে পরিণত করা হয়েছে। যে ধর্ম সেখানে সেখান হচ্ছে সেটাও মানুষের ব্যক্তিগত জীবন নিয়েই আলোচনা করে, সামষ্টিক জীবন কীভাবে চলবে তা শেখানোর জন্য আছে অন্যান্য বিষয়সমূহ। এটা হচ্ছে মানবজাতিকে ধর্মবিমুখ করে তোলার একটি সুদূরপ্রসারী প্রক্রিয়া। কিন্তু পাশ্চাত্যে নানা কারণে এ প্রক্রিয়া কিছুটা সফল হলেও প্রাচ্যে এটি কয়েক শতাব্দী পরও খাপ খাচ্ছে না। বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করতে গেলে একটু গভীরে যেতে হবে।

ইউরোপের এনলাইটমেন্ট পিরিওডের একটি সেলনের দৃশ্য। ধর্মবিরোধী ও তথাকথিত যুক্তিভিত্তিক সমাজব্যবস্থার সূতিকাগার ছিল ফ্রান্স ও ব্রিটেনের এ জাতীয় সমাবেশগুলো যেখানে নিয়ম করে তর্ক-বিতর্ক করা হতো। ইউরোপীয় প্রভুদের নকল করে সেসময় এমনই পাশ্চাত্য দর্শনের উপর তর্ক বিতর্কের আসর জমাbv হতো এই উপমহাদেশেও। মধ্যবিত্ত বাঙালি পরিবারগুলোও এর দ্বারা সংক্রমিত হয়েছিল ব্যাপকভাবে। বর্তমানের তর্কসুলভ সংসদীয় গণতন্ত্র এ বিজাতীয় সংস্কৃতিরই উত্তরাধিকার।

'ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ' দর্শনটি উনিশ শতকে যুক্তরাজ্য থেকে প্রথমত উদ্ভূত হয়েছে। ১৮৪৬ সালে জর্জ জ্যাকব হোলিওক (George Jacob Holyoake) নামক এক ব্যক্তি সেকুলারিজম শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন। Oxford Dictionary-তে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ (Secularism)-Gi সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, Belief that religion should not be involved in the organization of society, education, etc. অর্থাৎ সমাজ কাঠামোতে ধর্মকে সম্পৃক্ত করা যাবে bv Ggb wekvm পোষণ করাই ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ। এ মতবাদের অনুসারী (Secular)

সম্পর্কে বলা হয়েছে, Not connected with spiritual or religious matter. যিনি আধ্যাত্মিক বিষয় বা ধর্মীয় বিষয়ের সঙ্গে m¤úwKZ bb|

মূলত অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষদিকে শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে যুক্তি ও মুক্তবুদ্ধির PPvi bv‡g Enlightenment Movement-এর ফসল হিসেবে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ এর উদ্ভব হয়েছে। মুক্তবুদ্ধির আন্দোলনের মাধ্যমে এর অনুসারীরা মহান সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব নিয়ে সংশয় প্রকাশ করে মানবসভ্যতার ইতিহাসে সম্পূর্ণ নতুন দর্শন আমদানি করলেন যে, রাষ্ট্র ও সমাজের সাথে ধর্মের কোনো সম্পর্ক নেই; ধর্ম শুধু ব্যক্তিগত বিশ্বাস বা অন্তরের ব্যাপার; অর্থনীতি, রাজনীতি, সংস্কৃতি ও শিক্ষা প্রভৃতি থেকে ধর্মকে দূরে রাখতে হবে। তাদের মূল বক্তব্য ছিল, যুক্তি (logic)-ই জীবন পরিচালনার ভিত্তি হবে। এ ক্ষেত্রে আল্লাহপ্রদত্ত নির্দেশনার (divine guidance) কোনো প্রয়োজন নেই। ইউরোপে এই আন্দোলনের সফলতার ফলে ধর্মহীন যে শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে উঠল, তাতে মানুষ নিতান্তই স্বার্থপর হয়ে গেল, ভোগবাদী হয়ে পড়ল, পূর্বপুরুষ ও ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ কমে গেল। সর্বোপরি নীতিবোধের লোপ ও নৈতিকতার অবক্ষয়ই এর চূড়ান্ত পরিণতি হিসেবে প্রকাশ পেল।

মূলত নৈতিক মূল্যবোধের জাগরণ ব্যতীত একটি কল্যাণকর মা‡bemgvR কল্পনা করা যায় না। আর নৈতিক শিক্ষার মূল বিষয়টি ধর্মীয় শিক্ষা থেকে উৎসারিত। মানবসমাজে বিরাজিত সকল নৈতিকতার মূল ভিত্তি হলো, অতিপ্রাকৃতিক শক্তি তথা সৃষ্টিকর্তার ওপর বিশ্বাস। এ বিশ্বাসই ব্যক্তিমানুষকে তাঁর আদেশ ও নিয়ম অনুসরণ করতে অনুপ্রাণিত করে, পৃথিবীতে ও পরলোকে কু-কমে©i kw¯— সম্পর্কে অবহিত করে এবং ভালো কাজের জন্য পুরস্কৃত হতে উৎসাহ দেয়। স্রষ্টায় বিশ্বাসের কারণেই ব্যক্তি সবচেয়ে গোপন ও নিরাপদ জায়গাতেও শত প্রলোভন সত্ত্বেও অনৈতিক কোনো কাজে জড়িত হতে পারে না। কিন্তু এ বিশ্বাসের বীজ যার হৃদয়ে বপিত হয় নি তার কাছে

নৈতিকতা অর্থহীন মনে হয়। ধর্মীয় শিক্ষা ব্যতীত নৈতিক শিক্ষা ভঙ্গুর ও বিক্ষিপ্ত। এমন কি এগুলোর আদি উৎসও বিভিন্ন ধর্ম। ধর্মীয় শিক্ষার বাইরে যে নৈতিক শিক্ষার কথা বলা হয় তাতে ব্যক্তি নিজের বিবেকের কাছে তার দায়বদ্ধতার কারণে নীতি মেনে চলে। ফলে ব্যক্তি যেকোনো দুর্বল মুহূর্তে প্রলোভনে পড়ে কিংবা মানবিক দুর্বলতার কারণে তার নৈতিক গণ্ডির বাইরে চলে যেতে পারে। সে তো পরকালীন শাস্তির ভয়ে নীতি মানছে না, তাই একবার ভাঙলে আবার তা গড়ে তোলার শক্তিশালী অনুপ্রেরণা পায় না। সে ভাবে যে, নশ্বর এই পৃথিবীতে ভোগ-wejvm I Avivg-আয়েশের মধ্য দিয়ে জীবন কেটে গেলেই হলো।

সুতরাং ধর্মকে কাজে লাগিয়েই সামষ্টিক মানুষের চারিত্রিক কাঠামোকে সুদৃঢ় করা সম্ভব, অন্যভাবে নয়। তাই শিশুকাল থেকেই এ চরিত্রগঠনের প্রক্রিয়া গ্রহণ করতে হবে। আমরা জানি যে, ব্যক্তির মানসিক গঠনের উপযুক্ত সময় তার শৈশব ও কৈশোর। এ সময় শিশুকে যেভাবে শিক্ষা দেয়া হবে তার গন্তব্যও সেদিকেই হবে। আমরা সবাই চাই, আমাদের শিশুরা জ্ঞানে-গুণে, যোগ্যতা-দক্ষতায় অনন্য হোক এবং তাদের সেই জ্ঞান ও দক্ষতা কল্যাণকর কাজে ব্যবহৃত হোক। অথচ তাদেরকে আমরা শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে সকল নৈতিকতার উৎস ধর্ম থেকে দূরে সরিয়ে রাখার শিক্ষাই দিয়ে থাকি। আমরা কি দেখছি না যে, ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা থেকে দূরে সরে যাওয়ার কারণেই আজ জাতির রন্ধ্রে রন্ধ্রে দুর্নীতি, চরিত্র বিকিয়ে টাকার মালিক হওয়ার প্রতিযোগিতা, মিথ্যা আর জালিয়াতির ছড়াছড়ি। সুতরাং বেঁচে থাকার জন্য যেমন মানুষের খাদ্যের প্রয়োজন, তেমনি সেই মানুষগুলোকে মনুষ্যত্বসম্পন্ন করে গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজন প্রকৃত ধর্মের শিক্ষা। বিকৃত ধর্ম সমাজকে আরো দূষিত করবে। প্রকৃত ধর্মের শিক্ষা যেমন পরিবার ও সমাজের পক্ষ থেকে দিতে হবে তেমনি দিতে হবে রাষ্ট্রের উদ্যোগের মাধ্যমে। রাষ্ট্রই শিক্ষাব্যবস্থার সিলেবাস ও কারিকুলাম প্রণয়ন করে। আর সকল পরিবারের পক্ষে সমভাবে জাতির ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে একটি নির্দিষ্ট চারিত্রিক কাঠামোq

তৈরি করা সম্ভব নয়। পরিবারের অজ্ঞতা বা অসচেতনতার কারণে যেন শিশু সচ্চরিত্রের অধিকারী হওয়ার অধিকার থেকে বঞ্চিত না হয়, সে জন্য সমগ্র জাতিকে এ ভার নিতে হবে। নীতিহীন, চরিত্রহীন মানুষ একটি দানব ছাড়া আর কিছু নয়, বিশেষ করে যখন সে কোনো ধ্বংসাত্মক শক্তির অধিকারী হয়ে hwq| GUv Dcjবি করে পারমাণবিক বোমা আবিষ্কারের পর The Philosophy of the Modern Education গ্রন্থে অধ্যাপক বার্বাস বিশ্বব্যাপী ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষার ওপর জোর দিয়ে বলেছেন, "বাধ্যতামূলকভাবে ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষার অনুশীলন না করলে মানবসভ্যতাকে রক্ষা করা সম্ভব হবে না। কারণ, মানুষ ধ্বংসের উপকরY অনেক বেশি জোগাড় করে ফেলেছে।"

জঙ্গিবাদ নির্মূলে সরকারকে সহযোগিতার প্রস্াব জানিয়ে লিখিত চিঠিতে স্বাক্ষর করছেন মাননীয় এমামুয্যামান|

এক নজরে মাননীয় এমামুয্যামান ও হেযবুত তওহীদ

সমগ্র মানবজাতি আজ বহুমুখী সংকটে পতিত। প্রতিটি মানুষ যেমন দুঃখ-কষ্টে জর্জরিত, ভীত-সন্ত্রস্ত, তেমনি বিশ্বজুড়ে চলছে যুদ্ধ, হানাহানি, রক্তপাত। প্রতিটি মানবাত্মা ত্রাহিসুরে চিৎকার করছে- শান্তি চাই শান্তি চাই। কিন্তু শান্তি কোথায়?

শান্তির জন্য বহু ধরণের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী তৈরি করা হয়েছে, তৈরি করা হয়েছে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংঘ। কিন্তু সবই ব্যর্থ। এমনই দুর্যোগঘন মুহূর্তে, এই ভয়াবহ সংকটজাল থেকে মানবজাতিকে পরিত্রাণ করার জন্য অসীম করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহ তাঁর এক বান্দাকে সত্যের পথনির্দেশ দান করলেন। তিনিই হচ্ছেন হেযবুত তওহীদ আন্দোলনের cwZôvZv, এমামুয্যামান জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী। তিনি এমন এক পরিবারের সন্তান যাঁদের কীর্তির সঙ্গে আবহমান বাংলার ইতিহাস, ঐতিহ্য, শিক্ষা, সংস্কৃতি এক সূত্রে গাঁথা। ১৪০০ বছর আগে যে উম্মতে মোহাম্মদী আরবভূমি থেকে সমগ্র পৃথিবীতে আল্লাহর সত্যদীন প্রতিষ্ঠার জন্য বেরিয়ে পড়েছিলেন, তাঁদের রক্তধারা বইছে এমামুয্যামানের ধমনীতে। সুলতানী যুগে এমামুয্যামানের পূর্বপুরুষগণ ছিলেন বৃহত্তর বঙ্গের সুলতান। ১৫৭৬ সনে সুলতান দাউদ খান পন্নীর পরাজয়ের মাধ্যমে বাংলার মাটি দিল্লির অধীন হয়। পরবর্তী সময়ে সমগ্র ভারতবর্ষই ব্রিটিশ শাসনের অধীন nq| ZLbI Uv½vBj-gqgbwmsn-e¸ov AÂলে এ ক্ষয়িষ্ণু রাজপরিবারের জমিদারি বজায় থাকে। প্রজাহিতৈষীতা ও ধর্মপরায়ণতার জন্য তারা ছিলেন অত্যন্ত জনপ্রিয়। ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে বাঙালি জাতিকে পরাধীনতার শৃঙ্খলমুক্ত করতে তারা ছিলেন নিবেদিতপ্রাণ।

এ পরিবারের সন্তান মাননীয় এমামুয্যামানও ছিলেন আধ্যাত্মিক ও মানবিক Pরিত্রে বলীয়ান এমন এক মহান পুরুষ যাঁর ঘটনাবহুল ৮৬ বছরের জীবনে

ব্রিটিশবিরোধী বিপ্লবীর বেশে

GKwU wg_¨v ejvi ev অপরাধ সংঘটনের দৃষ্টান্ত নেই। তাঁর চরিত্রের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো তাঁর wbinsKvi e¨w³Z¡| wZwb অভিজাত পরিবারের সন্তান হয়েও সারা জীবন কাটিয়েছেন সাধারণ মানুষের সঙ্গে। তাঁর পিতৃনিবাস টাঙ্গvBj KiwUqv Rwg`vievwoi `vD`gnj| wcZv মোহাম্মদ মেহেদী আলী খান পন্নী, পিতামহ সুফি সাধক আধ্যাত্মিক পুরুষ মোহাম্মদ হায়দার আলী খান পন্নী। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা, ধনবাড়ির জমিদার ও বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ নবাব bIqve Avjx চৌধুরী ছিলেন এমামুয্যামানের মায়ের নানা। মাননীয় এমামুয্যামান ১৯২৫ সালের ১১ মার্চ, পবিত্র শবে বরাতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর শিক্ষাজীবন শুরু হয় রোকেয়া উচ্চ মাদ্রাসায়, দু'বছর তিনি সেখানে পড়াশুনা করেন। তারপর এইচ. এম. ইনস্টিটিউশন থেকে ১৯৪২ সনে মেট্রিকুলেশন পাশ করেন। এরপর সা'দাত কলেজে কিছুদিন পড়াশুনা করেন। এ সবগুলো প্রতিষ্ঠানেরই প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন তাঁরই পূর্বপুরুষ মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী খান পন্নী ওরফে চান মিয়া যিনি ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে নিজের প্রায় সকল সম্পদ ব্যয় করে ফেলেছিলেন এমন কি জেলও খেটেছিলেন। এরপর মাননীয় এমামুয্যামান ভর্তি হন বগুড়ার অwRRj nK

কলেজে। তাঁর খালার বাড়ি বগুড়ার নওয়াব প্যালেসে থেকে প্রথম বর্ষের পাঠ সমাপ্ত করেন, দ্বিতীয় বর্ষে কলকাতার ইসলামিয়া কলেজে ভর্তি হন। সেখান থেকে তিনি উচ্চ মাধ্যমিক সমাপ্ত করেন।

কলকাতায় শিক্ষালাভের সময় ভারত উপমহাদেশ ছিল ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রামে উত্তাল। তরুণ এমামুয্যামানও এ সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েন। এই সুবাদে তিনি ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রামের বহু কিংবদন্তী নেতার সাহচর্য লাভ করেন। যাঁদের মধ্যে মহাত্মা গান্ধী, কায়েদে আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্, অরবিন্দু ঘোষ, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, মাওলানা সাইয়্যেদ আবুল আলা gI``x Ab¨Zg| Ggvghhvgvb যোগ দিয়েছিলেন আল্লামা এনায়েত উল্লাহ খান আল মাশরেকী প্রতিষ্ঠিত 'খাকসার' আন্দোলনে। আন্দোলনের প্রয়োজনে তিনি ফুটপাতে কমলার ব্যবসাও করেছেন। ছাত্র বয়সে একজন সাধারণ সদস্য হিসেবে যোগদান করেও তিনি দ্রুত জ্যেষ্ঠ নেতাদের ছাড়িয়ে পূর্ববাংলার কমান্ডারের পদ লাভ করেন। মাত্র ২২ বছর বয়সে দুঃসাহসী কর্মকাণ্ড ও সহজাত নেতৃত্বের গুণে Special Assignment-Gi Rb¨ ÔmvjvI-G-খাস হিন্দ' মনোনীত হন। দেশবিভাগের অল্পদিন পর তিনি গ্রামে প্রত্যাবর্তন করেন এবং হোমিও মেডিসিন নিয়ে পড়শুনা করে মানুষকে চিকিৎসাসেবা প্রদান শুরু করেন।

তিনি ছিলেন একজন জন্মগত শিকারি। সুযোগ পেলেই রায়ফেল হাতে চলে যেতেন দেশের বিভিন্ন বনাঞ্চলে। শিকারের লোমহর্ষক অভিজ্ঞতা নিয়ে পরে wZwb ÔevN-eb-বন্দুক' নামক একটি বই লেখেন। বইটি পাকিস্তান লেখক সংঘের সম্পাদক শহীদ মুনির চৌধুরী মন্তব্য করেছিলেনঃ বাঘ-eb-বন্দুক এক উপেক্ষিত এবং অনাস্বাদিত জগতের যাবতীয় রোমাঞ্চ ও উৎকণ্ঠাকে এমন mরসরূপে উপস্থিত করেছে যে পঞ্চমুখে আমি তার তারিফ করতে কুণ্ঠিত নই।...আমি বিশেষ করে মনে করি এই বই আমাদের দশম কি দ্বাদশ শ্রেণির দ্রুতপাঠের গ্রন্থরূপে গৃহিত হওয়া উচিত।

মাননীয় এমামুয্‌যামান ছিলেন একজন দক্ষ ফুটবলার, মোটর সাইকেল স্ট্যান্ট ও রায়ফেল শুটার। ১৯৫৬ সনে অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্নে অনুষ্ঠিত বিশ্ব অলিম্পিক চ্যাম্পিয়নশিপে অংশগ্রহণের জন্য পাকিস্তান দলের অন্যতম রায়ফেল শুটার হিসাবে নির্বাচিত হন।

Zvi Lvj bIqveRv`v মোহাম্মদ আলী চৌধুরী (বগুড়া) ছিলেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী, চাচাতো ভাই মোহাম্মদ খুররম খান পন্নীও ছিলেন আইন পরিষদের সদস্য। পরিবারের অনেকেই ছিলেন সক্রিয় রাজনীতির সঙ্গে RwoZ| mgmvgwqK রাজনীতিকদের পিড়াপিড়িতে এক যুগ পরে এমামুয্‌যামান Avevi ivRbxwZi অঙ্গনে ফিরে আসেন এবং ১৯৬৩ সনে টাঙ্গাইল-বাসাইল নির্বাচনী আসনে স্বতন্ত্র পদপ্রার্থী হন। তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীরা অনেকেই চেয়েছিলেন প্রবীণ রাজনীতিবিদ মওলানা ভাসানীকে দিয়ে ক্যাম্পেইন করাতে, কিন্তু মওলানা ভাসানী বলেছিলেন, ‘সেলিমের (এমামুয্‌যামানের ডাক নাম) বিপক্ষে আমি ভোট চাইতে পারব না, চাইলেও লাভ হবে না। কারণ তাঁর বিপক্ষে তোমরা কেউ জিততে পারবে bv|Ô ev¯বেও তা-ই হয়েছিল। বিপক্ষীয় মোট ছয়জন প্রার্থীর জামানত

বাজেয়াপ্ত করে তিনি প্রাদেশিক আইন পরিষদের সদস্য (এম.পি.) নির্বাচিত nb|

নিজ নির্বাচনী এলাকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর উন্নয়ন সাধনের জন্য মাননীয় এমামুয্যামান (বাঁ থেকে দ্বিতীয়) কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী এটিএম মোস্ফাকে (মাঝে) টাঙ্গাইল সফরে আনেন।

Amvgvb¨ e¨w³Z, mZZv, wbôv, Iqv`vi¶v, wনঃস্বার্থ জনসেবা, অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী কণ্ঠস্বরের কারণে আইন পরিষদের সর্বকনিষ্ঠ সদস্য হয়েও তিনি প্রবীণ রাজনীতিকদের শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। ১৯৬৩ সনে তিনি করটিয়ায় হায়দার আলী রেড ক্রস ম্যাটার্নিটি অ্যান্ড চাইল্ড ওয়েলফেয়ার হসপিটাল প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৬৪ সালে ঢাকা, নারায়ণগঞ্জের বিভিন্ন এলাকায় মুসলিম-হিন্দু, বাঙালি ও বিহারিদের মধ্যে দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ে। এতে অসংখ্য মানুষের মৃত্যু ঘটছিল এবং অবাধে চলছিল লুটপাট ও অগ্নিসংযোগ। রাজনীতিক স্বার্থহাসিলের জন্য আইয়ুব সরকার এ দাঙ্গাকে উৎসাহিত করে। এমামুয্যামান এম.পি. হয়েও সরকারের নীতির বিরুদ্ধে গিয়ে দাঙ্গা কবলিত এলাকাগুলোয় হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতি ফিরিয়ে আনতে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে

দিনরাত কাজ করেন। সাংস্কৃতিক অঙ্গনেও তাঁর ছিল দৃপ্ত পদচারণা। তিনি উপমহাদেশের প্রখ্যাত সংগীত ব্যক্তিত্ব মোহাম্মদ হুসেন খসরুর কাছে রাগসঙ্গীতের তালিম নিয়েছিলেন। জাতীয় কবি নজরুলও ছিলেন একই গুরুর শিষ্য। নজরুলের কীর্তি সংরক্ষণের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত নজরুল অ্যাকাডেমির অন্যতম উদ্যোক্তা ও ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য ছিলেন মাননীয় এমামুয্যামান।

মাননীয় এমামুয্যামান কীভাবে সত্যের সন্ধান পেলেন?

ছোটবেলায় যখন মাননীয় এমামুয্যামান মুসলিম জাতির পূর্ব ইতিহাসগুলি পাঠ করেন তখন থেকেই তাঁর মনে কিছু প্রশ্ন নাড়া দিতে শুরু করে। তখন প্রায় সমগ্র মুসলিম বিশ্ব ইউরোপীয় জাতিগুলির দাসত্ব স্বীকার করে Rxebhvcb KiwQj|

মাননীয় এমামুয্যামানের তোলা কবি নজরুলের অসুস্থ অবস্থার ছবি। মাননীয় এমামুয্যামান ছিলেন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক বোর্ডের অন্যতম সদস্য।

তিনি ভাবতে লাগলেন এ জাতির অধঃপতনের কারণ কী? ষাটের দশকে এসে তাঁর সামনে এ বিষয়টি দিনের আলোর মত পরিষ্কার হয়ে গেল। তিনি বুঝতে পারলেন কোন পরশপাথরের ছোঁয়ায় অজ্ঞতার অন্ধকারে নিমজ্জিত আরবরা মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে অর্ধবিশ্বজয়ী জাতিতে পরিণত হয়েছিল। সেই পরশপাথর হচ্ছে প্রকৃত ইসলাম যা আজ পৃথিবীতে নেই। বর্তমানে ইসলাম হিসাবে যেটা চালু আছে সেটা রসুলাল্লাহর আনীত ইসলামের সম্পূর্ণ বিপরীত। এমনকি দীনের ভিত্তি তওহীদ পর্যন্ত হারিয়ে গেছে।

তখন তিনি বই লিখে এ মহাসত্য মানুষের সামনে তুলে ধরার প্রয়াস পান এবং ব্যাপক প্রচারের লক্ষ্যে ১৯৯৫ সনে হেযবুত তওহীদ আন্দোলনের সূচনা করেন। যেদিন তিনি আন্দোলনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন সেদিনই আল্লাহ তাঁকে রসুলাল্লাহর একটি প্রসিদ্ধ হাদিস থেকে পৃথিবীতে সত্যভিত্তিক জীবনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠারসঠিক কর্মসূচির জ্ঞান দান করেন। হেযবুত তওহীদ সেই কর্মসূচি মোতাবেক মানুষকে প্রকৃত ইসলামের দিকে আহ্বান করতে আরম্ভ করে।

এমামুয্যামান তাঁর লেখায় প্রকাশ করলেন ব্রিটিশদের ষড়যন্ত্রমjK শিক্ষাব্যবস্থার ইতিহাস। ব্রিটিশরা কীভাবে আলীয়া মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করে ১৪৬ বছর ধরেনিজেদের তৈরি করা বিকৃত ইসলাম এ জাতিকে শিক্ষা দিয়েছে এবং কীভাবে এ জাতিকে মনে মগজে পাশ্চাত্যের দাসে পরিণত করেছে তার ইতিহাস তুলে ধরলেন। তিনি কোর'আন হাদিস থেকে প্রমাণ দিলেন যে, age¨emv Aর্থাৎ ইসলামের কাজ করে স্বার্থ হাসিল করা, অর্থ উপার্জন করা সম্পূর্ণ হারাম। এই বিষয়গুলো প্রকাশ করে দেওয়ায় ধর্মব্যবসায়ী আলেম মোল্লারা এমামুয্যামানকে কাফের, মুরতাদ, খ্রিষ্টান ইত্যাদি বলে ফতোয়া দিতে লাগলো। দেশজুড়ে হেযবুত তওহীদের সদস্যদেরকে নির্মম নির্যাতন ও প্রবল বাধার মুখে পড়তে হলো। ধর্মব্যবসায়ীরা বহু সদস্যের বাড়িঘর আগুনে জ্বালিয়ে দিল, বহুজনকে পূর্বপুরুষের ভিটা থেকে উৎখাত করে দিল, বহুজনকে পিটিয়ে আহত করল এমনকি একজন পুরুষ ও একজন নারী সদস্যকে শহীদ করে ফেলল। তবু হেযবুত তওহীদ এমামুয্যামানের বলিষ্ঠ

নেতৃত্বে সত্য প্রকাশে পিছপা হলো না। এরই মধ্যে অপপ্রচারে নতুন মাত্রা যোগ হলো বিশ্ব অঙ্গনে জঙ্গিবাদের আবির্ভাবের কারণে। ইসলামবিদ্বেষী কিছু গণমাধ্যম সঠিকভাবে না জেনে নিছক অনুমানের বশে, কেউবা জানার পরও হেযবুত তওহীদকে জঙ্গি, নিষিদ্ধ ইত্যাদি বলে অপপ্রচার করতে থাকে। যার ফলে হেযবুত তওহীদ চূড়ান্ত ckvmwbK nqiwbi wkKvi nq|

এমামুয্যামান হেযবুত তওহীদের প্রতিষ্ঠা লগ্নেই এ আন্দোলনের জন্য কয়েকটি নীতি গ্রহণ করেন।

(১) এ আন্দোলনের কোনো সদস্য ইসলামের কোনো কাজ করে কোনো পার্থিব বিনিময় গ্রহণ করতে পারবে না।

(২) কেউ অবৈধ অস্ত্রের সংস্পর্শে যেতে পারবে না।

(৩) হেযবুত তওহীদ কোনো রাজনীতিক কর্মকাণ্ডে অংশ নেবে না।

(৪) হেযবুত তওহীদের কেউ কোনোরূপ আইনভঙ্গ করতে পারবে না।

এ নীতিগুলোর কারণে আজ পর্যন্ত হেযবুত তওহীদের একজন সদস্যও কোনো আইনভঙ্গ করে নি, কোনো অপরাধও করে নি। এটা আমাদের মুখের কথা নয়, এটা প্রশাসনের তদন্তকারী কর্মকর্তাদের তদন্ত রিপোর্টের বক্তব্য। gvbbxq এমামুয্যামান ইসলামের নামে প্রচলিত বিকৃতিগুলোর স্বরূপ উন্মোচন করেছেন। তিনি জঙ্গিবাদ বলেছেন যে জঙ্গিবাদও একটি বিকৃতি। তিনি ২০০৯ সনে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারকে জঙ্গিবাদ নির্মূলে সহযোগিতা Kivi Rb¨ c¯াবনা পেশ করে চিঠি লেখেন। এ চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন যে, শক্তিপ্রয়োগ করে জঙ্গিবাদ দমন সম্ভব নয়, এতে জঙ্গিবাদ আরো বৃদ্ধি পায়। এজন্য প্রয়োজন আদর্শিক মোকাবেলা দ্বারা জঙ্গিবাদ যে ইসলাম প্রতিষ্ঠার ভুল পথ তা কোর'আন-হাদিস, ইতিহাস থেকে যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করা। জঙ্গিবাদের অসারতা প্রমাণ করা গেলেই আর কেউ জঙ্গি হবে না। এ প্রমাণের জন্য যে উপাদান প্রয়োজন তা আল্লাহ মাননীয় এমামুয্যামানকে দান করেছেন। আজ এটা প্রমাণিত সত্য যে সত্যিই শক্তি দিয়ে জঙ্গিবাদ দমন করা যায় নি এবং যাবে না। এখন অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তিই শক্তি প্রয়োগের

পূর্বে আদর্শিক মোকাবেলার প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করছেন। যুক্তরাষ্ট্রের মতো পরাশক্তিও জঙ্গি দমনে ব্যর্থতা স্বীকার করে নিয়েছে। প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা ২৮ মার্চ ২০০৯ তারিখে কথিত সন্ত্রাস বিরোধী অভিযান প্রসঙ্গে বলেন, 'চরমপন্থীদের বিরুদ্ধে শুধু বুলেট ও বোমা দিয়ে সফল হওয়া যাবে না।' কিন্তু এর কোনো বিকল্প তাদের সামনে না থাকায় এখনও তারা সামরিক শক্তি দিয়েই জঙ্গীবাদ ও সন্ত্রাসবাদ মোকাবেলা করে যাচ্ছে। এবং ¯fveZB mdj হচ্ছেন না। সেই বিকল্প ব্যবস্থা অর্থাৎ জঙ্গিবাদকে ভুল প্রমাণ করার আদর্শিক উপাদান আমরা দেশের উচ্চপর্যায়সহ গণমানুষের কাছে তুলে ধরছি এবং me¯রের মানুষের অকুণ্ঠ সমর্থন লাভ করেছি।

যুব সমাজকে অপ-সংস্কৃতির প্রভাব থেকে মুক্ত করে সমাজে সুস্থ বিনোদনের প্রসারকল্পে হেযবুত তওহীদের সদস্যদেরকে ফুটবল, কাবাডি, দৌড় ইত্যাদি শারীরিক সক্ষমতা সৃষ্টিকারী খেলায় উৎসাহ প্রদান করতেন মাননীয় এমামুয্যামান। তিনি কাবাডি খেলাকে জনপ্রিয় করে তোলার লক্ষ্যে গঠন করেন তওহীদ কাবাডি দল। দলটি দেশের বিভিন্ন জেলাসহ জাতীয় কাবাডি স্টেডিয়ামে আয়োজিত বিভিন্ন টুর্নামেন্টে অংশ নেয়।

আমরা মাননীয় এমামুয্যামানের লিখিত এবং তাঁর শিক্ষা-mswjZ eB I সিডিসমূহ তওহীদ প্রকাশনের মাধ্যমে প্রকাশ করেছি। তওহীদ প্রকাশন ২০০৮ সন থেকে দেশের বিভিন্ন জেলায় আয়োজিত বইমেলাগুলিতে সুনামের সঙ্গে অংশগ্রহণ করে আসছে। এমামুয্যামান রচিত "দাজ্জাল? ইহুদি-wLóvb ômf¨Zvô!ó বইটি সারাদেশে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল, ২০০৮ সনে এ বইটি ছিল বাংলাদেশে বেস্ট সেলার।

হেযবুত তওহীদের জীবনের সবচেয়ে বড় ঘটনা ঘটে ২০০৮ সনের ২ ফেব্রুয়ারি। আল্লাহ হেযবুত তওহীদকে সত্যায়ন করার জন্য বিরাট এক মো'জেজা সংঘটন করেন। এ বিষয়ে বিস্wiZ Z_¨ cgvY mswjZ GKwU eB আমরা প্রকাশ করেছি যার নাম "আল্লাহর মোজেজা: হেযবুত তওহীদের weRq-ঘোষণা"। এ দিন আল্লাহ জানিয়ে দেন যে হেযবুত তওহীদ দিয়েই

সমগ্র পৃথিবীতে আল্লাহর চিরন্ন, সত্য জীবনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবে, বিশ্বময় শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে।

এভাবেই ১৬টি বছর পার করে হেযবুত তওহীদ পা দিল ১৭ বছরে| Gj ২০১২ সাল। আমরা পথভ্রষ্ট ছিলাম, গোমরাহ ছিলাম, যে মহামানবের মাধ্যমে আল্লাহ আমাদেরকে হেদায়াহ দান করলেন, সেই মহামানব, এ যামানার এমাম দ্য লিডার অফ দ্য টাইম জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী ২০১২ সনের ১৬ জানুয়ারি প্রত্যক্ষ দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে আল্লাহর সান্নিধ্যে চোলে গেলেন। তাঁর মহাপ্রয়াণের পর থেকে আন্দোলনের এমাম হিসাবে দায়িত্ব পালন করে আসছেন নোয়াখালী জেলার সোনাইমুড়ি থানার পোরকরা গ্রামের জনাব নুরুল হক এর সন্তান, যামানার এমামের আদর্শের উত্তরাধিকার জনাব হোসাইন মোহাম্মদ সেলিম। তাঁর জন্ম ১৯৭২ সনে। তিনি স্থানীয় বিপুলাসার আহম্মদ উল্লাহ উচ্চ বিদ্যালয় থেকে এস.এস.সি পাশ করেন। লাকসাম নওয়াব ফয়জুন্নেছা সরকারি কলেজ থেকে এইচ.এস.সি পাশ করেন এবং একই কলেজ থেকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে স্নাতক ডিগ্রী অর্জন করেন। এবং জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী অর্জন করেন। তিনি ছিলেন মাননীয় এমামুয্যামানের সার্বক্ষণিক সঙ্গী এবং হেযবুত তওহীদের সমন্বয়কারী।

সমগ্র পৃথিবীতে মানবজাতি আজ যে মহা সংকটে পতিত তা থেকে পরিত্রাণের উপায় আল্লাহ মাননীয় এমামুয্যামানকে দান করেছেন। সেটা মানবজাতির সামনে উপস্থাপন করাই হেযবুত তওহীদ আন্দোলনের প্রধান দায়িত্ব, আল্লাহ c`Ë AvgvbZ| এ দায়িত্ববোধ থেকেই আমরা পত্রিকা প্রকাশের উদ্যোগ নিই। ২০১৩ থেকে আমরা যথাক্রমে দৈনিক নিউজ, দৈনিক দেশেরপত্র এবং দৈনিক বজ্রশক্তির মাধ্যমে সত্য প্রচার শুরু করি। এছাড়া দেশের অন্যান্য জাতীয় পত্রিকাগুলোতেও আমাদের লেখা রীতিমত ছাপানো হয়। আমরা বিশ্বাস করি, মানুষ যদি আমাদের বক্তব্য জানতে পারে তবে একদিন না একদিন অবশ্যই তা গৃহীত হবে। কিন্তু ধর্মব্যবসায়ীরা ষড়যন্ত্র করে আমাদের

বক্তব্যকে মানুষের কাছে পৌঁছতে দিচ্ছে না। আমাদের দেশে প্রায়ই ধর্ম ব্যবসায়ীরা ধর্মের নামে উন্মাদনা সৃষ্টি করে মানষের ঈমানকে ভুল পথে পরিচালনা করে আসছে এবং বিপুল সংখ্যক ধর্মপ্রাণ মানুষের ঈমানকে হাইজ্যাক করে তাদেরকে জাতি বিনাশী ধ্বংসাত্মক কাজে জঙ্গিবাদী কর্মকান্ডে লিপ্ত করছে। এ অবস্থা দেখে আমরা উৎকণ্ঠিত হই এবং জাতিকে ধর্মব্যবসায়ীদের দাঙ্গাবাজি ও অপরাজনীতির খপ্পর থেকে রক্ষা করার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করি। আমরা "ধর্মব্যবসা ও ধর্ম নিয়ে অপরাজনীতির ইতিবৃত্ত" kxIK GKwU cwমাণ্যচিত্র নির্মাণ করি এবং আপামর জনগণের সামনে ধর্মব্যবসায়ীদের স্বরূপ উন্মোচন করি। জাতীয় জাদুঘর, পাবলিক লাইব্রেরি, ঢাকা প্রেসক্লাব ইত্যাদি থেকে শুরু করে টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া, রূপসা থেকে পাথুরিয়ার এই ৫৬ হাজার বর্গমাইল দেশটির প্রত্যন্ত গ্রামে, গঞ্জে, স্কুলে-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে, মাঠে ময়দানে, হাটে বাজারে, হাওর-wej চরাঞ্চলে আমরা এই প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন করতে থাকি। আমাদের বক্তব্য শুনে সাধারণ মানুষ উদ্বেলিত হয়, মুক্তির দিশা পায়। তারা দুই হাত তুলে আমাদের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে, ধর্মব্যবসার বিরুদ্ধে, সহিংসতার রাজনীতির বিরুদ্ধে ঐকমত্য প্রকাশ করে। তারা ন্যায়ের পক্ষে, সত্যের পক্ষে ঐক্যবদ্ধ থাকার শপথ গ্রহণ করে।

আমরা এমামুয্যামানের অনুসারীরা বেঁচেই আছি মানবজীবনের সকল অশান্তি দূর করে শান্তি ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম করার জন্য। আমাদের সকল কর্মকাণ্ড আমরা আইন শৃংখলা মেনে এবং কর্তৃপক্ষের অনুমোদন নিয়ে করে থাকি। আমাদের সমস্ত কার্যক্রম দিনের আলোর মতো পরিষ্কার, আমরা সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণ উপায়ে জাতিকে প্রকৃত ইসলামের তথা শান্তির জন্য ঐক্যের ডাক দিয়ে যাচ্ছি। এটাই আমাদের এবাদত, এটাই আমাদের ধর্ম। যতদিন পর্যন্ত পৃথিবী থেকে যাবতীয় অন্যায়, অশান্তি, মানুষে মানুষে ভেদাভেদ দূর না হবে, যতদিন সমগ্র পৃথিবীর আদম সন্তানেরা আবার এক পরিবারের ন্যায় ঐক্যবদ্ধ হবে ততদিন আমাদের এ সংগ্রাম চলবে ইনশা'আল্লাহ।

মাননীয় এমামুয্যামানের ব্যক্তিগত বিশেষ অর্জন (Achievements)

1. **ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনঃ** তিনি তেহরিক এ খাকসারের পূর্ববাংলা কমান্ডার ছিলেন এবং বিশেষ দায়িত্ব পালনের জন্য 'সালার এ খাস হিন্দ' পদবিযুক্ত বিশেষ কমান্ডার নির্বাচিত হন।

2. wPwKrmv: বাংলাদেশের সাবেক রাষ্ট্রপ্রধান, তৎকালীন ক্ষমতাসীন প্রধানমন্ত্রী, সাবেক প্রধানমন্ত্রী, জাতীয় কবি কাজী নজরুল এসলামসহ অনেক বরেণ্য ব্যক্তি তাঁর রোগীদের অন্তর্ভুক্ত।

3. mwnZ¨Kg: বেশ কিছু আলোড়ন সৃষ্টিকারী বইয়ের রচয়িতা যার একটি ২০০৮ এর সর্বাধিক বিক্রয়কৃত বই। তাঁর বাঘ-eb-বন্দুক বইটি পাকিস্wb লেখক সংঘের (পূর্বাঞ্চল শাখা) সম্পাদক শহীদ মুনির চৌধুরীর সুপারিশে শিক্ষা বোর্ড কর্ত্তৃক দ্বাদশ শ্রেণির পাঠ্যসূচিতে দ্রুতপাঠ হিসাবে অন্f³ Kiv nq| GQvovI wZwb cÎ-পত্রিকায় বিভিন্ন সময়ে চিকিৎসা, ধর্ম ও রাজনৈতিক প্রসঙ্গে প্রবন্ধ লিখেছেন।

4. wkKvi: বহু হিংস্র প্রাণী শিকার কোরেছেন যার মধ্যে চিতাবাঘ, বন্য শুকর, অজগর সাপ, কুমির প্রভৃতি রোয়েছে।

৫. রায়ফেল শুটিং: ১৯৫৬ সনে অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্নে অনুষ্ঠিত বিk অলিম্পিক চ্যাম্পিয়নশিপে অংশগ্রহণের জন্য পাকিস্তান দলের অন্যতম রায়ফেল শুটার হিসাবে নির্বাচিত হন।

6. ivRbxwZ: ce-cwK¯ান প্রাদেশিক আইন পরিষদের সদস্য (এম.পি.) wbewPZ nb (1963Ñ65)|

৭. সমাজসেবা: হায়দার আলী রেডক্রস ম্যাটার্নিটি অ্যান্ড চাইল্ড ওয়েলফেয়ার হসপিটাল ও সা'দাত ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা।

৮. শিল্প সংস্কৃতি: নজরুল একাডেমির আজীবন সদস্য।